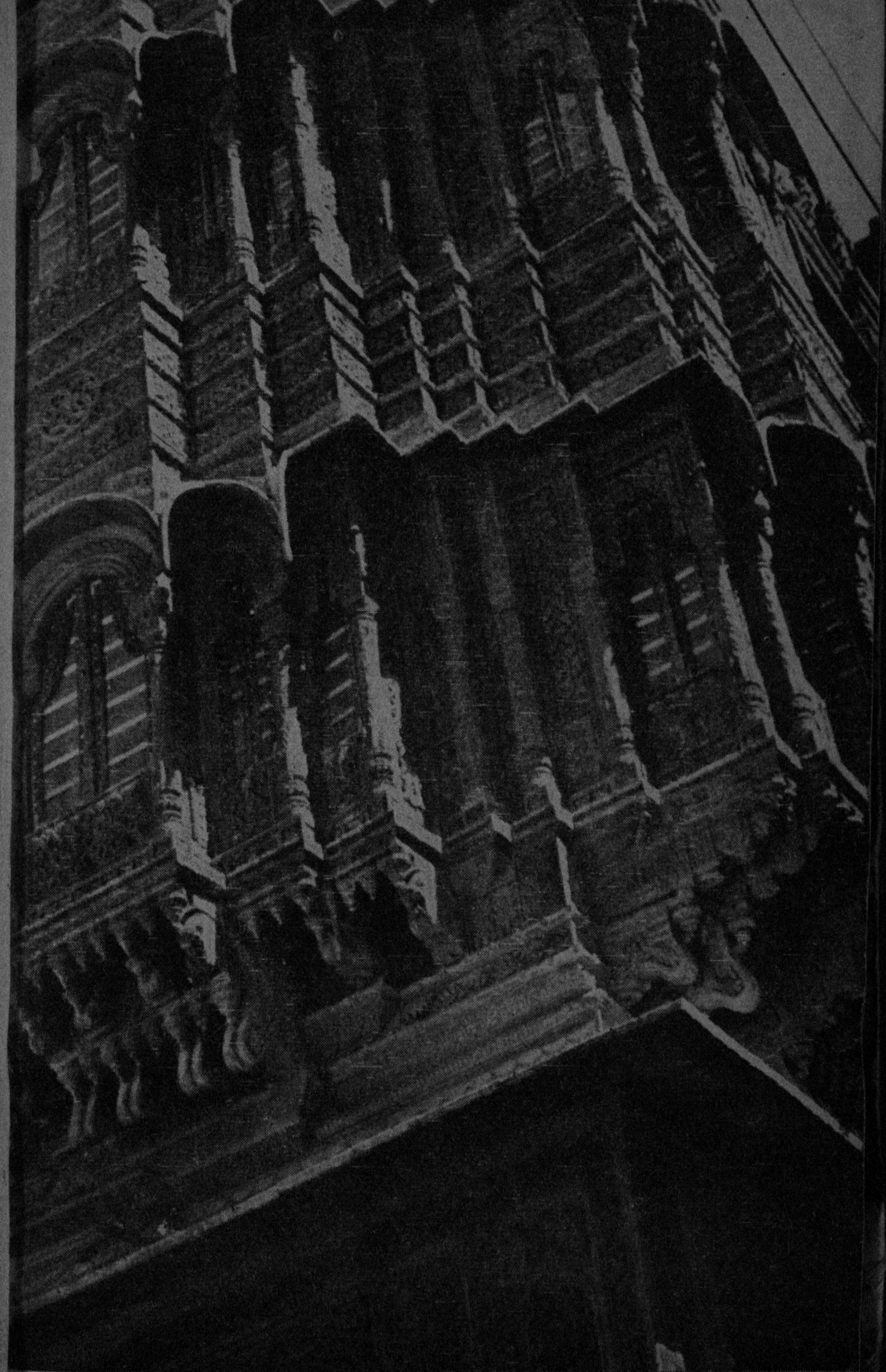


(উপরে) আরাবল্লীর কোলে জৈন মন্দির, রনকপুর ফটো ডঃ শীতাংশু মিত্র

(নিচে) রতনবিহারী মন্দির, বিকানের

মরুভারত পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Maru-Bharat Parva

প্রকাশক ঃ
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক ঃ স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরণজিতকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি,
সেই তাপদগ্ধ মরুবাসীদের উদ্দেশে

গ্রন্থকার

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ২

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর।

—রবীন্দ্রনাথ।



(উপরে) মরুভূমির ট্রেন (নিচে) মরুভূমির স্টেশনে যাত্রী

(উপরে) মরুভূমির যাত্রী (নিচে) দুর্গ থেকে যোধপুর শহর



(উপরে) যোধপুর স্টেশনের বাইরে চুড়ির দোকান

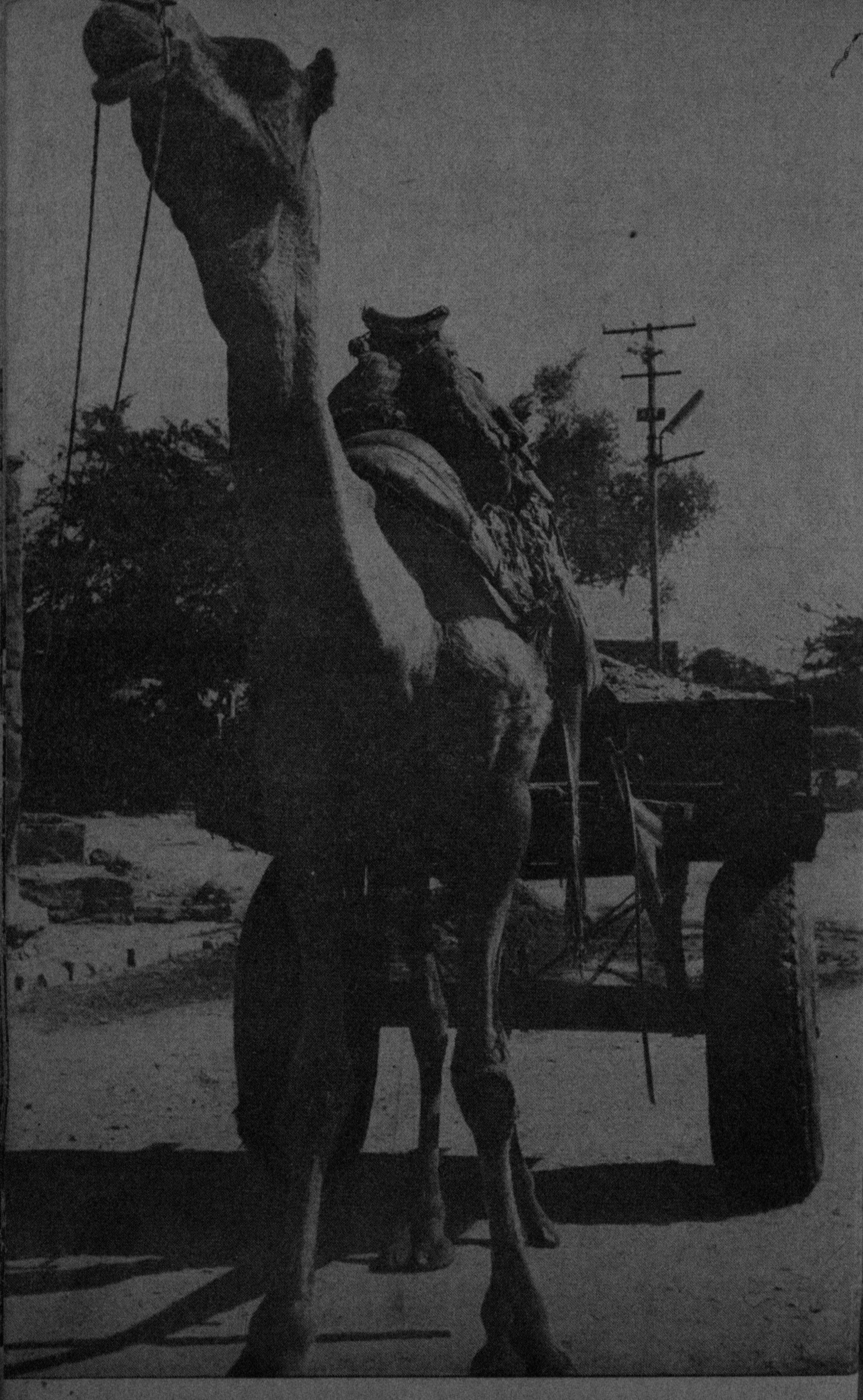
(নিচে) জয়সলমের দুর্গ : ফটো ডঃ শীতাংশু মিত্র



জয়সলমের দুর্গে রাজপ্রাসাদ

(উপরে) শিবের মন্দির, গান্ধীধাম (নিচে) কান্দ্‌লা বন্দর।





১

অনেক দিন পরে আবার দিল্লীতে এসেছি। আমি আর স্বাতি। একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছি। এটা সভা-সমিতির যুগ—সেমিনার, কন্‌ফারেন্স, সিম্‌পোসিয়াম, ওয়ার্কশপ, ডায়ালোগ। এক এক ব্যাপারে এক এক নাম। কাজ কতকটা একই। নানা জায়গার প্রতিনিধিরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। তার পরে ছুটি। আমাদেরও ছুটি হয়ে গেল।

কলকাতা ছেড়ে বেরোবার সময় স্বাতি বলেছিল: অনেক দিন কিছু লেখো নি। আবার লিখতে হবে।

আমি উত্তর দিয়েছিলুম: নতুন জায়গা যে আর খুঁজে পাচ্ছি না!

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলেছিল: সে কি! ভারতবর্ষ কি এত ছোট দেশ যে এমন সহজে ফুরিয়ে যাবে!

আমি হেসে বলেছিলুম: আঠারোটা পর্বে যে মহাভারত শেষ হয়ে গিয়েছিল!

স্বাতিও হেসে বলেছিল: হরিবংশ মহাভারতের খিল পর্ব।

হ্যাঁ, খিল মানে তো পরিশিষ্ট। বাকি যা আছে তা নিয়ে খিল পর্ব হতে পারে।

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলেছিল: পরিশিষ্ট অনেক সময়েই একটায় কুলোয় না।

আমার পাঠকেরা তা হলে আমায় খুন করবে।

খুন করবার আগে প্রতিবাদ করবে তো, তখন থেমো।

দিল্লীতে এসে এই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিল স্বাতি। পরিচিত দু-একজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল। আমার পরিচয় জেনে

আলাপ করতে এসেছিল এক তরুণ অধ্যাপক। নাম বালুরাম। বাপ-পিতামহের পদবী ত্যাগ করেছিল বলে কোন্ রাজ্যের মানুষ তা বোঝা যাচ্ছিল না। সুন্দর সুশ্রী চেহারা, গৌর বর্ণ, পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি। প্রসন্ন মুখে আমার কাছে এসে নমস্কার করে বলল: আপনাকে আমার হিংসে করতে ইচ্ছা করছে।

কেন?

গোটা ভারতবর্ষটাই আপনি দেখে ফেলেছেন শুনলাম।

হেসে বললুম: গোটা ভারতবর্ষ দেখেছি, এ কথা কেউ দাবী করতে পারে না। ভারতবর্ষ দেখার শেষ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

তা সত্যি। বড় বড় কয়েকটা শহর দেখেই আমরা ভাবি, সারা দেশটা আমাদের দেখা হয়ে গেল।

তার পরেই বলল: এই আমার কথাই ধরুন না। আমার নাম তো বালুরাম। আমি ভাবতাম বালির দেশটা আমার জানা আছে।

নতুন এক যুবকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে স্বাতি এগিয়ে এসেছিল। বলল: বালির দেশ কাকে বলছেন?

বালুরাম বলল: রাজস্থানের মরুভূমি। এই মরুভূমির দেশে জন্ম বলেই তো আমার ঠাকুর্দা বালুরাম নাম রেখেছিলেন! তাই মনে একটা গর্ব ছিল, মরুভূমির সব কথা জানি।

স্বাতি বলল: জানেন না বুঝি?

সেবারে একটা কাজে জয়শলমেরে গিয়েছিলাম। একটা দশ-বারো বছরের ছেলে আমার মাল নামিয়েছিল ট্রেন থেকে। দু-একটা কথার পরেই সে আমাকে বলেছিল, জানো, সেদিন আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েছিল।

স্বাতি বলল: বৃষ্টি!

হ্যাঁ, বৃষ্টি। কিন্তু সেই ছেলেটা বৃষ্টি পড়তে কখনও দেখে নি। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, যে গ্রাম থেকে সে এসেছে সেখানে আট

বছর পরে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছে। তার জন্মের পরে যে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা তার মনে নেই।

একটু থেমে বালুরাম বলল : এ দেশের মানুষ বাঁচে কী করে বলতে পারেন! কেউ দেখে তাদের! কেউ ভাবে তাদের কথা! কেউ তাদের কথা কখনও লিখেছে!

বালুরামের দু চোখ ছল ছল করে উঠল। আর স্বাতি নির্বাক হয়ে গেল। আমি বললুম : সত্যিই আমরা সামান্যই দেখেছি। আর এই দেখা নিয়েই গৌরব বোধ করি।

বালুরাম বলল : রাজস্থানের অর্ধেকটাই তো মরুভূমি। উত্তর-পশ্চিমের অর্ধেক। ভূগোলে তার নাম থর। পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত এই মরুভূমি বিস্তৃত।

স্বাতি বলল : পশ্চিম উপকূলে তো কচ্ছ!

সেও এক বিচিত্র দেশ। ভূগোলে যার নাম রন, রন অব কচ্ছ। চোখে না দেখলে সে জায়গাও কল্পনা করা যায় না। এই মরুভূমি যেন ভারতবর্ষ নয়, এ যেন আরব কিংবা মিশর। ফসল হয় না, শাক-সব্জিও হয় না, পানীয় জলের জন্য মাইলের পর মাইল অতিক্রম করতে হয় উট কিংবা গাধা নিয়ে। বালি খুঁড়ে জল বার করে সেই জল এনে সঞ্চয় করতে হয় ঘরে। তবু এখানকার মানুষেরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে মনের জোরে। ভাগ্যকে তারা ধিক্কার দেয় না, সরকারের বিরুদ্ধে করে না বিদ্রোহ, ভগবানের কাছেও কোন নালিশ নেই তাদের। এরা মরুভারতের মানুষ, অজ্ঞাত উপেক্ষিত মানুষ। এদের কথা কি আপনি লিখবেন না?

অনুরোধে আর্দ্র হল বালুরামের কণ্ঠস্বর। আর স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল গভীর প্রত্যাশায়।

বালুরামকে আমি নিরাশ করতে পারলুম না। নিবিড় ভাবে নাড়া দিয়েছে সে আমার মনকে। বললুম : লিখব। কিন্তু—

বালুরাম আমার দু হাত জড়িয়ে ধরে বলল : এর মধ্যে কোন

কিন্তু নেই গোপালবাবু, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমার যতটুকু সামর্থ্য, তার সবটুকু আমি আপনাকে দেব। দিল্লী থেকে আপনি ফিরে যাবেন না।

তবে ?

কাল রাতের গাড়িতে আমরা বিকানের যাত্রা করব। একটি বেলা আমাকে সময় দিন, এরই মধ্যে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

বালুরাম চলে যাবার পরে স্বাতি বলল: কলকাতা থেকে বেরোবার সময় দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই আমি করেছিলাম।

২

আগামীকাল সকালে কোথায় যাওয়া যায়। তাই ভাবতে গিয়েই কিছুদিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গেল। রবিবারের এক সকালে আমরা দিল্লী শহরটা দেখেছিলুম। আমরা মানে রায় সাহেব অঘোর গোস্বামী এম. পি., বাঙলার জমিদার, মিসেস গোস্বামী ও তাঁদের মেয়ে স্বাতি। সঙ্গে ছিল দিল্লীর ছেলে রাণা ও তার বোন মিত্রা, আই. সি. এস. ব্যানার্জি সাহেবের পুত্রকন্যা। কলকাতা থেকে এসেছিলুম এলাহাবাদ, দিল্লীতে বেড়াতে এসেছিলুম। রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবু মামা। তাঁরই নিমন্ত্রণে এসেছিলুম।

এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্করবাবুর কথাও আমার মনে পড়েছে। অপুত্রক মানুষ। অথচ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। আমাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। এক দুর্বল মুহূর্তে আমি রাজী হয়ে গিয়েছিলুম।

দুপুরে আহারের পরে স্বাতির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমার পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: একটু আগে বাবার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল গোপালদা?

চারি ধারটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললুম: তোমার বিয়ের কথা।

স্বাতি একটুও লজ্জিত হল না। বলল: চমৎকার কথা তো! তা আমার আড়ালে কেন?

হেসে যোগ করল: কত দূর কী হল শুনি।

বলে চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসল।

কথার ভিতর বেশ একটু গাম্ভীর্য এনে বললুম: রাণাকে পছন্দ হয়?

স্বাতিও তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল : মেয়েদের আবার পছন্দ কী! তোমাদের পছন্দেই আমার পছন্দ।

বললুম : মামা বলছিলেন যে অমন ভাল ছেলে নাকি তিনি আজও পর্যন্ত দেখেন নি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আর এইটুকু বয়সেই অত বড় অফিসের ভেতর আলাদা ঘর পেয়েছে। এক দিন হয়তো গোটা অফিসটারই মালিক হয়ে বসবে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো!

সেদিন এই কথার একটা বিশেষ অর্থ ছিল। মিত্রা আমার পরিচয় চায় নি, কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেই কৌতূহল দেখেছিলুম। তাই নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। থাকবার মধ্যে উতোরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

আমার কথা শুনে অট্টহাস্য করেছিল রাণা, আর মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরও একটু ধার দেখেছিলুম যেন। কিন্তু পরের দিন স্বাতি আমাকে ভর্ৎসনার সুরে বলেছিল : তোমার কি ইজ্জৎ জ্ঞান কোন দিন হবে না গোপালদা! কাল নিজের পরিচয়টা অমন ফলাও করে দেবার কী দরকার ছিল!

দরকার ছিল না মানি। কিন্তু সেদিন ঐটুকুই তো আমার অহংকার ছিল।

কিন্তু রাণার সম্বন্ধে আমার মন্তব্য সে সহজ ভাবেই নিল। বলল : বিলেত-টিলেত তো ঘুরেই এসেছে। কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু মা কী বলছিলেন জানো? বলছিলেন, ভাগ্য তোর গোপালদার। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পেল রাতারাতি। মিত্রাদিকে পছন্দ হয়েছে তো গোপালদা?

অর্ধেক চোখ বুজে বললুম : আহা!

স্বাতি সশব্দে হেসে উঠল, আর আমিও যোগ দিলুম সেই হাসিতে। তার পরেই তার বিষণ্ণ মুখ দেখে বললুম : কী হল ?

জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হতে তুমি রাজী হয়ে গেছ গোপালদা ?

স্বাতির প্রশ্নে আমি বেদনার আভাস পেলুম। সত্যি কথা লুকোবার ইচ্ছা আমার ছিল না। বললুম : রাজী না হয়ে উপায় কী বল ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় রাজী হতে হয়েছে।

গল্পটা কী ভাবে শুরু করব ভাবছিলুম। স্বাতি বলল : বাজিতে আমি হেরে গেছি। বাবা যখন চিঠি লিখছিলেন তোমাকে, আমি জোর গলায় বলেছিলাম যে এমন প্রস্তাবে গোপালদা কিছুতেই রাজী হবে না। বাবা বিশ্বাস করেন নি আমার কথা। বলেছিলেন যে অর্থের একটা মোহ আছে। সেই মোহ যার নেই, সে অতি-মানুষ। তেমন মানুষ ছুনিয়ায় আজ বিরল। তবু আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, গোপালদা কিছুতেই রাজী হবে না।

স্বাতি চুপ করল, আমিও আর কথা খুঁজে পেলুম না। মনে হল, স্বাতিই শুধু হেরে যায় নি, আমিও হেরে গেছি। বিত্তের যূপকাঠে নিজের আদর্শকে বলি দিয়ে আমি শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছি। আমার নূতন ভাগ্যোদয়ে আর যারাই করতালি দিক, আমি এই মেয়েটির কাছে অপদার্থ প্রতিপন্ন হয়েছি নিশ্চিত রূপে।

এমন যে হবে, আমি তা ভাবতে পারি নি। যখন রাজী হয়েছিলুম, তখন কি নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছি ! মনে পড়ে না। হয়তো ভেবেছি। তাতে আপত্তির কিছু ছিল না। ছুনিয়াটা আজ চাঁদির পিছনে ছুটেছে। ধর্ম মোক্ষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা সবই আজ চাঁদির খেলায়। কিন্তু চাঁদি পেয়ে যে চাঁদ হারাতে হবে, তা কি সেদিন ভেবেছিলুম ! তাই গভীর ভাবে বললুম : তুমিও আমায় ভুল বুঝলে স্বাতি ?

স্বাতি সে কথার উত্তর দিল না। বলল: বাবা তোমাকে সবই দিতে পারতেন। দিতেনও। প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে ধাক্কা দিয়েছিলে, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার মর্যাদাজ্ঞান দেখে। বাবা বিষয়ী লোক, খানিকটা সন্দেহ করেছিলেন তোমার আচরণে। বলেছিলেন, আমার কাছে মাথা নোয়াল না, নোয়াবে পরের কাছে। জগতের রীতিই এই। যত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। সংসারের অভাব অভিযোগ ছুনিয়ার লোকে দেখে সব, তাতে বাধা নেই, আত্মীয় বন্ধুতে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়। তোমাকে যখন এলাহাবাদে আসতে লিখেছিলেন, আমার মনে হয় যে বাবা বিশ্বাস করতেন তুমি তাঁদের পোষ্যপুত্র হতে রাজী হবে।

মনে মনে আমি এ কথা মেনে নিলুম। যত আপন, তত লুকোচুরি তার সঙ্গে। ছুনিয়ার লোক কে কী ভাবছে, তা গ্রাহ্য করি না। আমি মরে যাচ্ছি স্বাতি কী ভেবেছে তাই মনে করে। আজ এই মুহূর্তে স্বাতির কাছে যদি সত্য কথাটা গোপন রাখতে পারতুম, তাহলে চিঠি লিখে জ্ঞানশঙ্করবাবুকে আমার মতের পরিবর্তন জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা হত না। কিন্তু হাতের যে ঢিল বেরিয়ে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করে অনেক সঙ্কোচ নিয়ে বললুম: কেন রাজী হতে হয়েছে সে কথা যদি শোন—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: সেকথা কি আজ অবান্তর নয় গোপালদা?

আর—

কৈফিয়ৎ! তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার আমার কোন্ অধিকার!

স্বাতির শুকনো হাসিতে আমি কান্নার মতো অভিমান দেখলুম। বললুম: অধিকার দানের জিনিস নয় স্বাতি, অধিকার জবরদস্তি দখলের জিনিস। ইচ্ছে করে কেউ অধিকার ছেড়ে দেয় না,

অতর্কিতে আক্রমণ করে অধিকার কেড়ে নিতে হয়। অধিকারের লোভ থাকলে জোর খাটাতেই হবে।

স্বাতি তখনই আমার জবাব দিল: লোভ আর কিসের রইল গোপালদা?

সত্যি কথা। এর পরে আমার আর বলার কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পরে স্বাতি আবার কথা কইল। বলল: তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশনে। গোড়ার দিকে তুমি এম. এ.র ডিগ্রী নিলে। তখন তোমাকে চিনতাম না, কিন্তু ভুলতেও তোমাকে পারি নি। তোমার ভঙ্গিতে একটা দৃঢ়তা ছিল, একটা সৌম্য ব্যক্তিত্বের ছাপ, যা আর কারও ভেতর দেখি নি। দ্বিতীয় দিন তোমাকে দেখলাম আমাদের দোতলার বারান্দা থেকে। বাবার সঙ্গে দেখা করে তুমি ফিরে গেলে। সেদিন বাবার কাছেই তোমার পরিচয় পেলাম। আজ লুকোব না গোপালদা, তোমার ঠিকানা জানলে আমি নিজেই তোমার কাছে যেতাম। আমাকে বেহায়া ভাবলেও আমি বলে আসতাম যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার রূপ নয়, তোমার বিদ্যাও নয়, শ্রদ্ধা করি তোমার মর্যাদাবোধকে।

একটু থেমে বলল: এই মর্যাদাবোধ আজ তুমি টাকার মোহে খোয়ালে গোপালদা?

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তৃতীয়বার তোমার দেখা পেলাম হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের ভেতর। রাম খেলাওন হারিয়ে গেছে। সঙ্গে একজন লোক না নিয়ে কন্যাকুমারীর পথে পাড়ি দেবার সাহস বাবার ছিল না। তাঁর অনুরোধে তুমি রাজী হও নি, মার কথাতেও না। কেন হয়েছিলে, আমি তা অনুমান করতে পারি। সেদিনই তোমার মনের খানিকটা পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। তার পর—

তার পরের ঘটনা আমার জানা। কয়েকটা দিন এক সঙ্গে ঘুরে তাঁরা যেমন আমায় চিনেছিলেন, আমিও চিনেছি তাঁদের। স্বাতিকে চিনতেও আমার ভুল হয় নি। নিজের অসাবধানতায় একটু হিসেবের ভুল হয়ে গেছে। একটু, না মারাত্মক!

তার পরের ঘটনা কি তুমি হঠাৎ ভুলে গেলে গোপালদা?

বড় করুণ শোনাল স্বাতির প্রশ্নটা। কোন রকমে বললুম: ভুলে গেলে কি আজ এইখানে এমন করে তোমার কাছে ছুটে আসতুম!

গল্প শুনতে এসেছ, আর গল্প বলতে। তার বেশি কিছুর সম্ভাবনা তো শেষ হয়ে গেছে। আর কি তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারব?

ধনীকে কি শ্রদ্ধা করা যায় না?

ধার করা ধনীকে যায় না। চাঁদ আমরা ভালবাসি, কিন্তু প্রণাম করি সূর্যকে।

বললুম: আজ তোমাকে বড় রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল: ঠিক উল্টো। আমি আর রোমান্টিক হতে পারছি নে।

দিল্লীতে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বসে আমি পুরনো দিনের কথা ভাবছি। তুজনেরই শরীরের উপর দিয়ে সারা দিন অনেক ধকল গেছে। শ্রান্ত দেহে ফিরে এসেছি হোটেলে। স্বাতি স্নান করতে গেছে, আর আমি ভাবছি—

কী ভাবছ বল তো?

পিছন থেকে স্বাতির প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলুম। আশ্চর্য হয়ে গেলুম তার দিকে চেয়ে। কৌতুকের হাসি তার ঠোঁটে। বলল: মাথায় বাজ পড়েছে বুঝি?

কিসের জন্যে!

মুখ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

গম্ভীর মুখে বললুম : সত্যিই একটা সমস্যায় পড়েছি।

স্বাতি বলল : আশ্চর্য তো! ভ্রমণে এমন ভয় ঢুকেছে মনে!

না না, সে কথা আমি ভাবছিই না।

তবে?

বললুম : অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়েছে। এই দিল্লীতেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আর কোন দিন আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

স্বাতি হেসে বলল : এ সব কথা এখনও তোমার মনে আছে!

সত্যি কথা বলেই মনে আছে। মিথ্যে কথা তৈরি করে লিখলে অনেক দিন আগেই ভুলে যেতুম!

স্বাতি খানিকটা লজ্জা পেয়ে বলল : তখন খুব সেন্টিমেণ্টাল ছিলাম।

কিন্তু আমি যখন এই কথা বলেছিলুম, তখন তুমি কী বলেছিলে মনে আছে?

আছে। বলেছিলাম, সেন্টিমেণ্টস্ আছে বলেই তো আমরা মানুষ।

আর আমি বলেছিলুম, ও তো দুর্বলতা, বুদ্ধি দিয়ে ওকে জয় করতে হয়।

স্বাতি বলল : আমার উত্তরটাও মনে আছে। বলেছিলাম, বল, বিষ দিয়ে হত্যা করতে হয় হৃদয়কে। আর তুমি আমার এই অভিযোগের উত্তর দিতে পার নি।

আমি বললুম : সেদিন বাইরের বাতাসে ছিল উত্তাপ। আর ঘরের ভিতরটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বলে আমার মনে হয়েছিল।

স্বাতি বলল : আজ হঠাৎ এ সব কথা কেন ভাবতে বসেছ?

ভাবতে বসেছিলুম অন্য কথা। কাল সকালবেলায় কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবতে গিয়েই এই সব কথা মনে পড়ে গেল।

এখন কি খুব ক্লান্ত বোধ করছ?

কেন বল তো ?

একবার কালীবাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হেসে প্রশ্ন করলুম : কোন মানৎ আছে নাকি ? থাকলে কাল ভোর বেলায় যাওয়াই তো ভাল।

স্বাতি তখনই আমার কথা মেনে নিয়ে বলল : ঠিক বলেছ। কাল সকালেই বেরোব।

৩

স্বাতি বলল : তুমি এই চেয়ারটায় আরাম করে বোসো, আমি বসছি এইখেনে। বলে আমাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে নিজে আমার চেয়ারটায় বসল। বলল : তোমার নতুন বইএর কী নাম হবে জানো ?

না।

মরুভারত।

তারপরেই প্রশ্ন করল : নামটা ভাল নয় ?

বললুম : ভারতের মরুভূমির কথা লিখতে হলে এই রকম নামই উপযুক্ত হবে। কিন্তু নামটি এর আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল : ঠিকই মনে হচ্ছে। এই তো একটু আগে বালুরামবাবুই বলছিলেন, মরুভারতের মানুষ অজ্ঞাত উপেক্ষিত মানুষ।

কিন্তু মরুভূমি তো রাজস্থানের ! রাজস্থানের কথা যে লেখা হয়ে গেছে !

সে তো টুরিস্টের রাজস্থান ! জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোরগড় উদয়পুর আর আবু পাহাড় নিয়ে এই রাজস্থান। আমরা এই রাজস্থানই দেখি, পড়ি এই রাজস্থানের কথা। এর বাইরেও যে রাজস্থান আছে, তা দেখবার বা জানবার চেষ্টা সত্যিই আমরা করি না।

বললুম : কিন্তু বিকানের যোধপুর বা জয়সলমেরের নাম শুনেছি।

কিছু দেখেছ কি সেখানকার ?

না।

আরব সাগরের তীরে কচ্ছ নামে একটা অঞ্চল আছে। তার সম্বন্ধে কিছু জানো ?

তাও জানি না।

তবে এই দেশের সব দেখেছ বলে দাবী করা তোমার উচিত নয়।

বললুম: এ রকম দাবী তো কখনও করি নি।

স্বাতি বলল: তুমি থেমে গেলে অনেকেই তা ভাববে। মনে করবে, এর পরে এ দেশে আর কোন দ্রষ্টব্য নেই।

হেসে বললুম: তোমার কথা তো আমি মেনে নিয়েছি!

মুখে মেনে নিয়েছ, কিন্তু মনে উৎসাহ দেখছি না কেন ?

কে বলল উৎসাহ নেই ?

এ কথা কি আমায় অন্যের কাছে জানতে হবে ?

বলে স্বাতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের দিকে।

এইবারে আমার উদ্বেগের কথা বললুম: ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম দিল্লী আসব বলে। ভারতের শেষ প্রান্তে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে তো বেরোই নি!

স্বাতি হেসে উঠল উচ্ছল ভাবে। বলল: এ রকম কথা তো আগে কখনও ভাবতে না!

একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললুম: কেন ভাবছি, তা বুঝতেই পারছ।

এ ভাবনা তোমার নয়, কোন দিন তোমাকে ভাবতেও দেব না। তুমি তোমার মনটাকে তৈরি কর, বাকি সব ভার আমার। বালুরামবাবুকে নিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করব।

তার পরেই প্রশ্ন করল: কদিন সময় লাগবে বল তো ?

বললুম: হিসেব কর। কালকের দিনটা আমাদের দিল্লীতেই কাটবে। তার পরের তিনটে দিন বিকানের যোধপুর ও জয়সলমেরে।

তার পর ?

কচ্ছে পৌঁছতে একটা দিন লেগে যাবে, আর গোটা অঞ্চলটা দেখতে দুদিন। তার পর কলকাতায় ফিরতে দিন তিনেক সময় নিশ্চয়ই লাগবে।

স্বাতি বলল : তাহলে দিন দশেক সময়ের দরকার।

বললুম : দু-চারদিন হাতে রেখে দু সপ্তাহ্ ধর।

খরচ ?

দিনে দুজনের পঞ্চাশ টাকা লাগবে বলে মনে হয় না।

তার মানে, সাতশো টাকা।

তার পরে রেল ভাড়া।

স্বাতি বলল : দিল্লী থেকে ফেরার টিকিট তো আছে, কচ্ছে যাতায়াতে কত লাগতে পারে মনে হয় ?

বললুম : একেবারে আন্দাজে বলব ?

বল।

সেকেণ্ড ক্লাসে শ তিনেক টাকার বেশি লাগবে না।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল : একটু বুঝিয়ে বল তো !

বললুম : যাতায়াতে দু হাজার মাইল হতে পারে। তার ভাড়া দুজনের আড়াইশো টাকার মতো।

স্বাতি উজ্জ্বল চোখে বলে উঠল : তবে কোন ভাবনা নেই।

চাকরির কী হবে ?

দুখানা টেলিগ্রাম।

বলে সে উঠতে যাচ্ছিল। দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে দেখে সেই দিকেই এগিয়ে গেল।

দরজা খুলতেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঢুকে পড়ল বালুরাম। হাসিমুখে সে বলল : যাত্রা আমাদের শুভ হবে।

কেন ?

বলে স্বাতি তার মুখের দিকে তাকাল।

বালুরাম বলল : এই নিন বিকানেরের টিক্কিট। কাল রাতের

গাড়িতেই জায়গা পাওয়া গেছে। নটা পনের মিনিটে ছাড়বে, আর পৌঁছবে সকাল আটটা পঞ্চান্নয়। দিনের গাড়িতেও যাওয়া যেত কিন্তু এগার-বারো ঘণ্টা জার্নির পরে কোন এনার্জি অবশিষ্ট থাকত না। এ দিকে দিল্লীতে রাজস্থান সম্বন্ধে কিছু লিটারেচার সংগ্রহেরও সময় পাওয়া গেল।

স্বাতি বলল : বিকানের এখান থেকে কত দূরে ?

পাঁচশো পঁয়ষটি কিলোমিটার।

টিকিটের উপরে ভাড়াটা স্বাতি দেখে নিল। তার পরে নিজের ব্যাগ থেকে ভাড়ার টাকাটা বার করে এগিয়ে দিল বালুরামের হাতে।

বালুরাম বলল : বিকানের থেকেই আমরা জয়সলমের যাব যোধপুরের ওপর দিয়ে। তার পর মারবাড় জংসন আবুরোড পালনপুর হয়ে গান্ধী ধাম। ইচ্ছে করলে কচ্ছের প্রধান শহর ভুজ পর্যন্ত ট্রেনেই ঘুরে আসতে পারবেন।

একটু থেমে বলল : মরুভূমিতে বার্মের নামে আর একটি শহর আছে। যোধপুর থেকে ট্রেনে যেতে হয়। সময় থাকলে সেখানেও যেতে পারবেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে এ জায়গার নাম আমি শুনেছি। এই মরুভূমির উপর দিয়েই পাকিস্তানের সীমান্ত।

স্বাতি তার চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বলল : বসুন।

বালুরাম ধন্যবাদ দিয়ে বলল : না, এখন আর বসব না। অনেক কাজ আছে আমার।

কিন্তু আমাদেরও যে আপনার সঙ্গে কাজ আছে !

আমার সঙ্গে !

বালুরাম ঝুপ করে চেয়ারে বসে বলল : তবে তো বসতেই হবে।

স্বাতি হেসে বলল : চা খাবেন, না কফি ?

না না, চা কফি আমি খাই নে।

তবে কি দুধ খাবেন ?

বালুরাম লজ্জিত ভাবে বলল : দুধ খাবার সময় এখন নয়। আপনি কাজের কথা বলুন।

স্বাতি বলল : আপনি তো যোধপুরে কাজ করেন শুনেছি, আমাদের জন্যে বিকানেরে যাবেন কেন ?

বালুরাম লজ্জিত ভাবে বলল : ঠিক আপনাদের জন্যেই যাচ্ছি না। আমারও কাজ আছে। মানে—

স্বাতি বলল : লজ্জা পাচ্ছেন কেন ?

না, মানে—

আপনি কি বিবাহিত ?

না।

তবে বলুন না, কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, তা—

স্বাতি হেসে বলল : বিয়ের আগে বন্ধু বলাই ভাল। বিদেশে তো বয়ফ্রেণ্ড আর গার্লফ্রেণ্ড কথা খুবই প্রচলিত। বন্ধুর মতো সুন্দর সম্বন্ধ আর কী আছে বলুন !

আমি এতক্ষণ নীরবেই ছিলুম। এইবারে বললুম : আমরা দুই বন্ধু সারা ভারতবর্ষটা দেখেছি। আপনার মতো লজ্জা পাই নি কোন দিন।

বালুরাম এবারে আমার দিকে ফিরে বলল : সত্যি নাকি !

বললুম : আমরা বেপরোয়া ছিলুম। মনে যখন পাপ নেই, তখন কে কী ভাবল তার তোয়াক্কা রাখি নি।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : তুমি এ কথা বোলো না। মার ভয়ে তুমি সারাক্ষণ কেঁচো হয়ে থাকতে !

ভয়ে নয়—

বুঝেছি। ভাল ছেলে সাজবার ভান করতে।

তার পরে বালুরামকে বলল : আপনাদের সম্পর্কটা খুব সহজ করে ফেলুন। প্রথমে আমাদের সামনে, তার পরে সবার সামনে। বন্ধুর সম্পর্কটা যে কত মধুর তখন তা বুঝতে পারবেন।

বালুরাম বলল : ঠিক বলেছেন। অকারণে আমরা আড়ষ্ট হয়ে থাকি।

স্বাতি বলল : তাহলে এই কথাই রইল। আজ থেকে আমাদের সামনে কিছু গোপন করবার দরকার নেই। আমরা সবাই বন্ধু।

বালুরাম একটু দ্বিধা করে বলল : এ ব্যাপারে আমরা খুব পিছিয়ে আছি। বিয়ের আগে বন্ধুতা! আমরা যেন ভাবতেই পারি না। বিয়ের পরেও আমাদের অনেক লুকোচুরি।

স্বাতি বলল : দিল্লীতে তো আমি এ রকম দেখি নি!

বালুরাম বলল : দিল্লী তো রাজস্থানের বাইরে। কিন্তু দিল্লীতেও সব পরিবারে এ রকম দেখবেন না। তাই এটা ব্যতিক্রম।

উঠবার জন্যে বালুরাম ছটফট করছিল। বলল : আজ উঠি। কাল এক সময়ে এসে কিছু টুরিস্ট লিটারেচার দিয়ে যাব।

খুব ভাল কথা।

বলে স্বাতি ভদ্রলোককে দরজার বাহিরে পৌঁছে দিল। ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : এ ভদ্রলোক বোধহয় মারোয়াড়ী, তাই না?

বললুম : মারবাড়ী কিনা জানি না, তবে রাজস্থানী নিশ্চয়ই।

মারোয়াড়ী আর রাজস্থানীতে কোন তফাত আছে নাকি?

আছে বৈকি। রাজপুতানায় মারবাড় নামের একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের অধিবাসীকেই বলা হয় মারোয়াড়ী বা মারবাড়ী, কলকাতায় অবশ্য রাজস্থানের সব ব্যবসায়ীকেই মারোয়াড়ী বলে।

স্বাতি বলল : রাজস্থান তো এ রাজ্যের নতুন নাম, আগে বোধ হয় রাজপুতানা বলত। রাজপুতের দেশ রাজপুতানা। কিন্তু এই

রাজপুত কারা ? বড়বাজারে ব্যবসা করছে যারা, তাদের তো রাজপুত বলে না !

রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়।

গণ্য হয় বলছ কেন ? সেবারে তো বলেছিলে, এ দেশের রাজা মহারাজারা সব সূর্য ও চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়।

বললুম ঃ তাঁরা তাই দাবী করেন।

তাহলে আসলে কী ?

রাজস্থানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড সাহেব কী মনে করেন তাই বলি। গান্ধারের শক জাতিই রাজস্থানে এসে রাজপুত নামে পরিচিত হয়েছে।

স্বাতি বলল : ইতিহাসে আমরা শক হুন পারদ কুষান এই সব নাম পড়েছি। কিন্তু এরা কারা তা জানি নে।

বললুম : এখনকার ইতিহাসের আগেও আমাদের দেশে এক ধরনের ইতিহাস প্রচলিত ছিল, তার নাম পুরাণ। রামায়ণ মহাভারতও আমরা প্রাচীন ইতিহাস বলে মানি। তাতে আমাদের ভারতবর্ষের নাম জম্বুদ্বীপ, আর তার উত্তরে শকদ্বীপ। দ্বীপের সংজ্ঞা তখন এখনকার মতো ছিল না। দুদিকে জল থাকলেই দ্বীপ বলত। জম্বুদ্বীপ ও শকদ্বীপের মাঝখানে পামীর ও তারই সংলগ্ন দুর্গম পর্বতমালা তুর্কীস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত সে যুগে দুঃসাধ্য ছিল। তাই শকদ্বীপের সম্বন্ধে নানা রকমের কাহিনী প্রচলিত ছিল এই দেশে। আর শুনে আশ্চর্য হবে, অনেকের মতে মধ্যএশিয়ার এই পামীর পাহাড়ই আমাদের পুরাণের মেরুপর্বত বা সুমেরুর দক্ষিণাংশ আর এই পর্বত শিখরেই ছিল দেবতাদের বাস।

স্বাতির দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল। তাই দেখে বললুম : পুরাণের কথা না মানলেও গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের মত বোধহয় অনেকেই মেনে নেবে। তিনি লিখেছেন যে হিন্দুস্থান ও

স্কিদিয়ার মধ্যে হিমদেশ নামে এক পাহাড়ের ব্যবধান। গ্রীকরাও বিশ্বাস করে যে এই হিমদেশেই ছিল দেবতাদের বাস।

কতকটা অবিশ্বাসের সুরে স্বাতি বলল : এ সব তোমার নিজের কথা নয় তো ?

বললুম : তৈরি করে বলতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নেই। এক সময়ে বই নিয়েই আমার সময় কাটত। দুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ পর্যন্ত বাদ দিই নি। সব কথা তো মনে নেই, যতটুকু মনে আছে ততটুকুই বলি।

স্বাতি বলল : দেবতাদের বাসস্থান সম্বন্ধে আর কিছু মনে নেই ?

বললুম : আমাদের আলোচনা থেকে তাহলে দূরে সরে যেতে হবে।

সংক্ষেপে বল।

বলে স্বাতি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : অমরকোষ বা শব্দরত্নাবলীর মতো প্রাচীন বইএ ইন্দ্রালয় নামে একটি জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার জনস্টন সাহেবের এশিয়ার মানচিত্রেও আছে এক ইন্দরালয়। এই জায়গাটি হিন্দুকুশ পাহাড়ের উপরে কাশ্মীর পেরিয়ে। বেদ পড়ে জানা যায় যে মূল ইন্দ্রালয় অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ ছিল। তাই দেবতাদের প্রায় দুশো ক্রোশ দক্ষিণে নতুন ইন্দরালয়ে এসে বসতি স্থাপন করতে হয়।

স্বাতি বলল : তুমি কি বলতে চাও পামীর পাহাড়েই ছিল প্রথম ইন্দ্রালয়, আর সেখান থেকেই দেবতারা এসেছিলেন হিন্দুকুশ পাহাড়ের উত্তরে ?

বললুম : আমি না বললেও ঋগ্বেদে এই রকমের কথা আছে। আর্যদের আচার ব্যবহার ছিল শীতপ্রধান দেশের লোকের মতো। গরম কাপড় পরত, মাংস খেত। শীতের দেশ থেকেই তারা

ভারতবর্ষে এসেছিল। এ কথাও জানা যায় যে উত্তর কুরু, উত্তর মদ্র, কাম্বোজ বাহ্লীক—এ সব দেশ ইন্দ্রালয়ের কাছেই ছিল। চেষ্টা করলে সে যুগের একটা মানচিত্র তৈরি করা খুব অসম্ভব কাজ নয়।

স্বাতি বলল: সে চেষ্টা করবে তো?

হেসে বললুম: তোমাব কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।

কেন?

সেই ছড়াটা মনে পড়ছে না। মানে, পণ্ডিতেরা গেলেন বসাতল, আর আমি বলব কত জল!

স্বাতি হাসল না, গম্ভীর ভাবেই বলল: পণ্ডিতরা যদি কিছু না বলেন তো একজনকে তো বলতেই হবে।

সেই একজন কি আমি!

স্বাতি বলল: এইবারে রাজপুতদের কথা বল।

বলছিলুম শকদের কথা, তাই না! টড সাহেবের মতে জিট বা জাট, তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকেরা খ্রীষ্টের জন্মের ছশো বছর আগেই ভারতে এসেছিল। তার মানে বুদ্ধের জন্মের ঠিক আগে। কাজেই হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে তারা হিন্দু ধর্মকেই গ্রহণ করে, নিজেদের হিন্দু ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়।

স্বাতি বলল: বুদ্ধের জন্মের আগে পৃথিবীতে আর অন্য ধর্ম কোথায় ছিল!

বললুম: সেইটেই আসল কথা। কিন্তু আমাদের ইতিহাস বলে বাহ্লীক রাজ্যের গ্রীকদের পরে এসেছিল শকেরা। তার মানে, খ্রীষ্টের জন্মের আগের শতাব্দীতে। এই যাযাবর জাতি অক্ষু নদীর তীরে বাস করত, ইউচি নামের আর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে ভারতে চলে আসে। উত্তরে তক্ষশীলা ও মথুরা এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে তারা ছড়িয়ে পড়ে। শক রাজারা নিজেদের ক্ষত্রপ বলতেন, আর মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। প্রথম খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের

শেষ পর্যন্ত তিনশো বছর তারা সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। শকদের পরে আসে পহ্লব বা পারদরা। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ থেকে কান্দাহার জয় করে কাবুল ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় তারা অনেক-গুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সবার শেষে আসে কুষাণ নামে ইউচি জাতির একটি শাখা। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কুষাণ রাজ কণিষ্ক। তাঁর কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

স্বাতি বলল: বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি।

কিন্তু এঁদের সঙ্গে রাজপুতের কোন সংস্রব নেই। মনুসংহিতার মতে ক্ষত্রিয় শকেরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল।

বৃষলত্ব মানে কী?

শূদ্রত্ব। মানে পতিত হয়েছিল ব্রাহ্মণের অভাবে। হরিবংশ বা কোন পুরাণে বোধহয় আছে যে হৈহয়রা সগরের পিতাকে হত্যা করেছিল। সগর এই হৈহয়দের বিনাশ করলে শকেরা বশিষ্ঠের আশ্রয় নেয়। বশিষ্ঠের কথায় সগর এদের হত্যা না করে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দেয়। এই পৌরাণিক কাহিনীর একটা তাৎপর্য আছে।

বল।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: ভারতে আসার আগে শকেরা সূর্যের উপাসক ছিল। প্রাচীন শক মুদ্রা দেখেই এ কথা মেনে নিতে হয়। কেননা এই সব মুদ্রায় সূর্যের উপাসনা ও অগ্নিবেদীর চিত্র আছে। ভারতে এদের বংশধরেরা তাই সূর্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলে পরিচয় দেয়। আবু পাহাড়ে বশিষ্ঠের হোমের আগুনে তাদের জন্ম।

স্বাতি বলল: সেবারে রাজস্থানে এই গল্প শুনেছিলাম।

বললুম: কিন্তু এতক্ষণ যা বললুম, তা সবই পণ্ডিতদের কচকচি। রাজপুতরা মানে না যে তারা কোনকালে শক ছিল। আবার টড সাহেবও নাছোড়বান্দা। রাজপুতদের উৎসব রীতি

নীতি আচার ব্যবহার থেকে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে সে সবে শক প্রভাব এখনও আছে।

স্বাতি হেসে বলল : আর প্রমাণ দিতে হবে না। তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি।

কিন্তু রাজপুতেরা তো মানে না! রাজস্থানের রাজাদের বড় বড় বংশ পরিচয় আছে। রাজস্থানের চারণেরা গান গেয়ে গেয়ে সেই সব বংশ পরিচয় শুনিয়েছিল টড সাহেবকে। কিন্তু সে ভদ্রলোক বিনা বিচারে কিছু মেনে নেন নি। তাঁর নিজের মতটা লিখে রেখে গেছেন তাঁর বিরাট গ্রন্থ রাজস্থানে। সে এক অদ্ভুত কীর্তি। গান শুনে একটা জাতির ইতিহাস রচনার কথা আর কোথাও শুনি নি।

নিঃশব্দে স্বাতি আমার কথা মেনে নিল।

৪

দরজার উপরে করাঘাতের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠেই দেখতে পেলুম যে স্বাতি আমার আগেই জেগেছে ; কিন্তু দরজা খোলে নি। বিছানার উপরেই বসে আছে পা ঝুলিয়ে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে বলল ঃ না, তুমি দরজা খুলবে না।

জানলার দিকে চেয়ে বুঝতে পারলুম না, ভোর হয়েছে কিনা। স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ঘড়ি দেখেছি—পাঁচটা বেজে গেছে, কিন্তু সূর্য ওঠার সময় হয় নি।

বলে ঘরের বাতি জ্বেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বললুম ঃ তুমি পিছিয়ে এসো, দরজা আমি খুলে দিচ্ছি।

বলে এগিয়ে যাবার আগেই স্বাতি দরজা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে দরজাটা যে বন্ধ করে দিল, তাকে চিনতে আমার একটুও সময় লাগল না। এবং সহসা একটা অপরাধ-বোধে মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি তাকে স্বাগত জানাতে পারলুম না।

স্বাতি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল ঃ একা কেন ?

দেখিয়ে দোস্ত্—

বলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে চাওলা বসে পড়ল।

মিত্রাকে সঙ্গে আনো নি কেন, এ কথা আমি বলতে পারলুম না। তাদের তো আমরা কোন খবর দিই নি, তাদের খবর দেবার কথা আমাদের মনেই হয় নি। অথচ তাদের কাছে আমার অপরিসীম ঋণ। সে ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। তাই আমি বলে উঠলুম ঃ ওকে দোষ দিও না, দোষ আমার। খবর না দেবার জন্য সাজা আমাকে দাও।

চাওলা বলল : ঠিক হ্যায়। আমি বিচারক। আমি তোমাকে সাজা দিচ্ছি। তাব আগে একটি ছোট্ট সওয়ালের জবাব দাও তো!

বল।

সকালের দিল্লী মেলেই ফিরছ না তো?

না।

ব্যস, সব ঠিক হ্যায়।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আর কিছু জানবার নেই?

সে সব জানবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

বলে আমাকে বলল : দোস্ত্, চট্ করে মুখ হাত ধুয়েই বেরিয়ে পড। ঠিকানা মনে আছে তো? হাউজ খাস—এই নাও কার্ড।

বলেই উঠে পড়ল।

আমি তার হাত টেনে ধরে বললুম : উঠছ কেন?

কী মুস্কিল! বসবার আমার সময় কোথায়? দুধ আনতে বেরিয়েছি, ফিরতে দেরি হলে অনেক মিথ্যে বলতে হবে।

তাব পরেই দরজার দিকে চেয়ে বলল : তোমাদেব মর্নিং টী এসে গেলে এক কাপ খেয়ে যেতে পারতাম।

স্বাতি ব্যস্ত হয়ে বলল : আমি দেখছি।

চাওলা তার পথ আগলে বলল : আপনি দেখবেন কী! বেয়ারাকে তো আমি জাগিয়ে এসেছি, পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছি তাকে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : দশ মিনিট হয়ে গেল! এক একটা মিনিটের জন্যে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আমি হেসে বললুম : তুমি দেখছি ঠিক আগের মতোই আছ, একটুও পরিবর্তন হয়নি তোমার।

কী আশ্চর্য! মানুষের চরিত্র কি গায়ের জামা কাপড় যে ইচ্ছে করলেই পাল্টানো যায়!

তার পরেই স্বাতির দিকে চেয়ে বলল : মিত্রাকেও দেখবেন, এতদিন আমার সঙ্গে ঘর করেও সে ঠিক একরকম আছে।

দরজার উপরে একটা টোকা শুনে সে লাফিয়ে ঘরের বাইরে গেল। তার পরে বেয়ারার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে স্বাতির হাতে এনে দিয়ে বলল : আমার জন্যেও একটা কাপ দিয়েছে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমি যে তোমাদের কাছে এসেছি, এ যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।

স্বাতি সহাস্যে বলল : কেন বলুন তো!

চাওলা আঁৎকে ওঠার ভাণ করে বলল : ওরেব্বাবা—

ঠিক বাঙালীর মতো উচ্চারণ করল চাওলা। তাই দেখে স্বাতি আরও কৌতুক বোধ করে বলল : মিত্রাদি আমাদেব ওপরে খুব রাগ করেছে বুঝি!

চাওলা বলল : ছুটো মুখোস পরে যাবেন। কনট প্লেসের ঐ ধারটায় নানা রকম মুখোস পাওয়া যায়। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে টুক করে কিনে নেবেন।

চা ঢালতে ঢালতে স্বাতি বলল : আমাদের মুখ দেখবে না বুঝি!

জীবনেও না। আর ভুল করে আমার কথা বলে ফেললে আমার মুখও আর দেখবে না। আপনারা তাকে যেমন দেখেছিলেন, ঠিক সেই রকম আছে।

স্বাতি তার দিকে প্রথম পেয়ালাটা এগিয়ে দিতেই সে তাতে একটা চুমুক দিয়ে বলল : জিভটা পুড়ে যাবে, কিন্তু উপায় নেই।

আমি হেসে বললুম : কিন্তু আমাদের খবর পেলে কোথায়?

ভয় নেই, আমি স্বপ্নটপ্ন দেখি না, কোন মহাত্মাকেও চিনি না।

বলে ছু-তিন বার চায়ে ফুঁ দিয়ে চাওলা চুমুক দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

গত বারে দিল্লী আসার কথা আমার মনে পড়ে গেল। দিল্লী আসার কোন পরিকল্পনাই আমার ছিল না। পুজোর ছুটিতে বন্ধু

মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমি হরিদ্বারে এসেছিলুম। ঋষিকেশের পথে বাসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন : আপনাকে বড় অশান্ত দেখছি।

আমাকে!

আমার এই প্রশ্ন শুনেই তিনি হেসে বলেছিলেন : এই প্রশ্ন করেই আপনি আমার সন্দেহটা সমর্থন করলেন।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটেও আমাকে একজন এই রকমের কথা বলেছিলেন। আমি সেকথা বলতেই ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন : সাধারণ বেশে সেখানে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান শুনেছি। আপনি হয়তো তাঁদেরই কারও সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবেন।

তার পরেই হেসে বলেছিলেন : আমাকে যেন সে রকম কিছু ভাববেন না।

এর পরেও ভদ্রলোক অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ গল্প আমি চাওলাকে বলি নি। আমি এর পরের ঘটনা তাকে মসুরিতে বলেছিলুম। গঙ্গার পরপারে গীতাভবনে আমি আবার তাঁর দেখা পেয়েছিলুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম : কেন বলুন তো?

আত্মীয় বন্ধু কেউ এখন আছেন না সেখানে?

কেন জানি না, এ কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বলছেন, সেখানে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব। বন্ধু মানেই তো স্বাতি। সে ছাড়া আর আমার আত্মীয় বা বন্ধু কে আছে!

কিন্তু মসুরি গিয়ে আমি স্বাতির দেখা পাই নি, দেখা পেয়েছিলুম চাওলা ও মিত্রার। তারা রেজেস্ট্রি করে বিবাহের পরে হানিমুনে এসেছিল। আর আমার মুখে এই ঘটনা শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাওলা বলেছিল : সত্যিই অবিশ্বাস্য।

আর মিত্রা বলেছিল : তাহলে আর একটু বলি। কাল দুপুরে আমাদের ফিরবার কথা ছিল। সময় মতো বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়েও জায়গা পাই নি।

স্বাতি আমার দিকেও একটা পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না সে দিকে। তাই দেখে চাওলা হা-হা করে হেসে উঠল। বলল : মহাত্মার কথা দোস্তের মনে পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা আমি নিয়ে নিলুম। চাওলা আরও কয়েকটা চুমুক দিয়ে চা শেষ করেই বলল : আমার বেয়াদবি মাপ কোরো। সবই তো বুঝতে পারছ।

বলে বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেল : আটটার মধ্যে তোমাদের এক্স্‌পেক্ট্‌ করব। আর-

একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল : আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : ঘুণাক্ষরেও বলব না।

চাওলা চলে যাবার পরে স্বাতি বলল : আমার স্বপ্নের কথাও তুমি ওকে বলেছ নাকি ?

কোন্ স্বপ্নের কথা ?

মনে নেই ! সেবারে ওদের সঙ্গে মসুরি থেকে দিল্লী এসে তুমি আমাদের এক সাধুর গল্প বলেছিলে। আর আমি তোমাকে আমার স্বপ্নের কথা বলেছিলাম।

সে কথাও আমি ভুলি নি। চাওলারা চলে যাবার পরে স্বাতি আমাকে একান্তে ডেকে বলেছিল : তুমি যে আজ আসবে আমি জানতাম।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কী করে ?

স্বাতি বলেছিল : রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্থির জলে একখানা নৌকোয় আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। পাহাড়ে ঘেরা নীল জল, আর পর্দা ঝোলানো সুন্দর নৌকো।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম : এ তো কাশ্মীরের ছবি !

তা হবে।

তাতে আমি আজ আসছি, তা কী করে জানলে?

স্বাতি বলেছিল: আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না।

তারা যে হিমাচল ও কাশ্মীর ভ্রমণের জন্যে তল্পি বেঁধে আমার অপেক্ষা করছিল, তা তার বাবার কাছে শুনেছিলুম।

স্বাতি আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে দেখে বললুম: তোমার কথা আমি কাউকে বলি নি। সেই সাধুর সব কথাও আমি কাউকে বলি নি।

আমাকে বলেছ তো?

মনে পড়ছে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আগে তো তুমি কোন কথা ভুলে যেতে না!

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম: দায়িত্ব এখন বেড়েছে তো!

তা দেখতেই পাচ্ছি। এইবারে বল।

বললুম: সাধু বলেছিলেন, কিছুদিন পরেই আপনার মন স্থির হবে। আপনার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সরে যাচ্ছে, আপনি সুখী হবেন। তার পরেই বলেছিলেন, এ আমার অনুমানের কথা, আভজ্ঞতার কথা। আমি তো সাধু মহাপুরুষ নই, গণৎকারও নই। মানুষ দেখে কখনও এই রকম মনে হয়।

স্বাতি বলল: না, এ কথা তুমি আমায় বল নি।

চাওলাদের বাড়ি খুঁজে বার করতে আমাদের কষ্ট হয় নি। আটটার মধ্যেই পৌঁছে গেলুম। একতলা বাড়ি। ছোট এক ফালি জমি আছে সামনে। গোটা কয়েক গোলাপ গাছ আর কিছু মরসুমি ফুল। চাওলার পরনে হাফ প্যাণ্ট, আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। রবারের নল দিয়ে গাছে জল দিচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো চেঁচিয়ে উঠল। তার পরে আঁ-আঁ শব্দ করে বসে পড়ল ঘাসের উপরেই।

চাওলার আর্তনাদ শুনে মিত্রা বেরিয়ে এল ছুটে। আমাদের দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল।

আমি চাওলার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: কী হল দোস্ত? অমন করে বসে পড়লে কেন?

তার হাত থেকে রবারের পাইপটা খসে পড়েছিল। এইবারে আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার ভাণ করে বলল: শ রূপেয়া গিয়া।

মানে?

বলে আমি মিত্রার দিকে তাকালুম।

মিত্রা বলল: আসুন, আমি বলছি।

স্বাতিও কৌতূহলী হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

মিত্রা বলল: কাল বাজী ফেলেছিল আমার সঙ্গে। হেরে গিয়েছে।

আমি আশ্চর্য হলুম এই কথা শুনে। বললুম: কিসের বাজী?

মিত্রা চাওলার দিকে চেয়ে বলল: আপসোস করে আর কী হবে! তার চেয়ে ঐ টাকার কিছু খরচ করে—

চাওলা লাফিয়ে উঠে বলল: ব্রেকফাস্ট?

মিত্রা বলল: শুধু ব্রেকফাস্ট নয়, লাঞ্চেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

চাওলা আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। বাগানের এক ধারে একটা স্কুটার দাঁড় করানো ছিল। খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল যে সে ঐ স্কুটারে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিত্রা তাঁর বাড়ির ভিতরে টেনে আনল আমাদের। প্রথমেই আমাদের নজর পড়ল একটি দোলনার দিকে। ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু দুলছে। স্বাতি ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিল সেই শিশুকে, বলল: তোমার ছেলে মিত্রাদি?

মিত্রা সগর্বে বলল: ছেলে নয়, মেয়ে।

কিন্তু দেখতে তোমার মতো হয় নি তো!

তবে ?

ঠিক বাপের মতো হয়েছে।

চাওলা সুপুরুষ। তাই মিত্রা দুঃখিত হল না এই মন্তব্য শুনে।

আর স্বাতি বলল : বাপের মতো দেখতে হলেই মেয়ে সুখী হয়।

মিত্রা বলল : মিসেস ঘোষ বলছিলেন, পিতৃমুখী কন্যা সুখী।

মিসেস ঘোষ কে ?

তোমরা চিনবে না।

আমি বললুম : আপনাদের বাজীব কথাটা আগে বলুন।

মিত্রা বলল : কাল রাতে ক্লাবে আপনাদের কথা শুনলাম। আপনারা নাকি একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন দিন কয়েক আগে। শুনে তো ও ভারি খুশী। কোথায় উঠেছেন কদিন থাকবেন, এই সব খবর নিয়ে বলল, এস, কাল একটা সারপ্রাইজ দিয়ে আসি ওদের। আমি রেগে গিয়ে বললাম, ওরা নিজে থেকে না এলে আমি আর ওদের মুখদর্শন কবব না। ও বলল, তোমরা আসবে না; আর আমি বললাম, নিশ্চয়ই আসবে। এই নিয়েই বাজী।

আশ্চর্য হয়ে আমি তাকালুম স্বাতির দিকে, স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। চাওলার হৃদয় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। আমাদের কাছে আসবার জন্যে চাওলা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সময় থাকলে কাল রাতেই আসত। কিংবা মিত্রাকে দুঃখ দিতে চায় নি বলেই কাল আসে নি। আর সে নিজেও জানত যে আমরা তাদের কাছে নিজে থেকে আসব না, এলে আগেই আসতুম, কিংবা খবর দিতুম তাদের। চাওলা তাই এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। নিজের ব্যাকুলতায় ডেকে এনেছে আমাদের, আবার বাজীতে হেরে গিয়ে খুশী করতে চেয়েছে নিজের স্ত্রীকে। আশ্চর্য মানুষ !

স্বাতিও বোধহয় এই রকমের কিছু ভাবছিল। বলল : কলকাতা থেকেই চিঠি লিখে খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তাড়া-

তাড়িতে ভুলে গিয়েছিলাম। তার পরে দিল্লীতে এসে সকালে বিকেলে কাজ—ভারি ব্যস্ত ছিলাম এ কয়েকটা দিন।

মিত্রার মেয়েকে স্বাতির কোলে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ফর্সা রঙ, ফুলোফুলো গাল, গ্ল্যাক্সো বেবির মতো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। এইবারে আমার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল : কোলে নেবে ?

বড্ড ভয় করে আমার।

বলে আমি পিছিয়ে এলুম।

মিত্রা সকৌতুকে হাসল। ইঙ্গিতটা যেন খুবই স্পষ্ট। মানে, বেশিদিন ভয় পেলে চলবে না। স্বাতি এই হাসি দেখে দোলনাতে নামিয়ে রাখল মেয়েকে। আমি তার কানের পাশে একটু লালের আভা লক্ষ্য করলুম।

মিত্রা বলল : দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ! বসুন।

মাঝখানের বড় ঘরে একখানা সোফায় আমি বসলুম। এই ঘরেরই অন্য ধারে খাবার টেবল চেয়ার। নতুন বাড়ি, ঝকঝক করছে চারি দিক। এ বাড়ি ওদের নিজের, না ভাড়া বাড়ি, মিত্রাকে তা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। চাওলার কাছে আমার কোন সঙ্কোচ নেই।

মিত্রা স্বাতিকে বলল : তুমিও বোসো। চায়ের জলটা আমি চড়িয়ে দিয়ে আসি।

বলে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

স্বাতি আমার কাছে এসে বলল : এদের সংসার দেখতে বেশ লাগছে।

বললুম : পাঞ্জাবী সংসার এই রকমই হয় শুনেছি। এরা নিজেরাই সব কাজকর্ম করে।

স্বাতি বলল : আমরা তা পারি নে কেন ?

রান্না ঘরের জন্যে।

না, আমি এ কথা বলি নি, বলেছে চাওলা। গোটা দুই-তিন

বড় বড় ঠোঙা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেই সে এই কথা বলল। তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে দেখে বলল: কোন ভাবনা কোরো না দোস্ত্, তোমাদের আমি প্র্যাকৃটিকাল ট্রেনিং দিয়ে দেব।

বলে রান্নাঘরে গিয়ে বড় বড় প্লেটে খাবার সাজিয়ে এনে ডিনার টেবলে রেখেই চেঁচিয়ে ডাকল: আর দেরি নয় দোস্ত্, গরম খাবার জুড়িয়ে যাবে।

স্বাতি এগিয়ে গিয়ে বলল: ভারি চমৎকার জিনিস এনেছেন তো!

চাওলা পরিষ্কার বাঙলায় বলল: আলুর ছেঁচকি দিয়ে হিঙের কচুরি আর গরম জিলিপি খেতে বাঙালী মেয়েরা খুব ভালবাসে।

স্বাতি বলল: আপনি জানলেন কী করে?

এই দেখুন বিপদ! আমি কি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে ঘর করি! বিকেল বেলার চা হলে ঘুগ্‌নি আলুকাব্‌লি বা গোলগাপ্পা আনতাম। জিরের জল দিয়ে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: ও তো পাঞ্জাবীদের প্রিয়।

বাঙালীদেরও।

বলে চাওলা খাবার জন্যে আমাকে তাড়া দিল।

খেতে খেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তোমার গাড়িটা কী হল?

হা-হা করে হেসে উঠল চাওলা, বলল: ওটা তো সোস্যাল স্ট্যাটাস দেখাবার জন্যে কিনেছিলাম। এই বাড়ি করবার সময় বেচে দিয়েছি।

রান্নাঘর থেকে মিত্রা আসছিল চায়ের ট্রলি ঠেলে। স্বাতি বলল: তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো মিত্রাদি?

মিত্রার চোখে সোনার চশমা এখনও আছে, কিন্তু দৃষ্টি আর আগের মতো তীক্ষ্ণ নয়। তার প্রসন্ন দৃষ্টির দিকে চেয়েই স্বাতি এই কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল।

মিত্রা বলল : আমিই ওকে এই বুদ্ধি দিয়েছি। খরচও কমেছে, আর সুবিধেও বেড়েছে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়া যায়, পেছনে উঠে বসলেই হল।

চাওলা বলল : আসল কথা কী জানো ?

বললুম : না।

বাড়িতে কেউ এলেই তাকে পৌঁছতে যেতাম, গেস্ট্ এলে দিল্লী শহর দেখাতাম। স্টেশন থেকে বন্ধুদের আনা পৌঁছনো, এ সব তো আছেই—

বুঝেছি।

চাওলা বলল : তেলের দাম আগুন হবার পরে মিত্রাই পরামর্শ দিল, গাড়ি বেচে দাও। বাঙালী বুদ্ধি আর কি! বিজ্‌নেস ম্যাটার ইনভেস্ট্‌মেণ্ট ও বুঝবে কী!

তার পরেই বলল : হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন! মনে পড়েছে। রান্নাঘরই বাঙালী জাতটার সর্বনাশ করেছে।

স্বাতি হেসে বলল : কেমন করে ?

চাওলা বলল : সারাক্ষণ আপনারা রান্নাঘরে আছেন। ভাতের সঙ্গে আপনাদের শাক সুক্তো ঝাল ঝোল অম্বল চাই, পাঁচ রকম তরকারি না হলে চলবে না। তার ওপর মাছ মাংস ডিম। তাই গোটা কয়েক ঝোলা হাতে বাঙালী বাবু সারা সকাল বাজার করবেন, আর তাঁর গিন্নী সারাদিন কুটনো কুটবেন আর রাঁধবেন। বাকি সময়টা পেটের গোলমালের জন্য ডাক্তারের চেম্বার আর ওষুধের দোকানে ছুটোছুটি করে কাটিয়ে দেবেন।

তার হিন্দীর মধ্যে বাঙলা কথার ছড়াছড়ি দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু স্বাতি বলল : খুব খাঁটি কথা বলেছেন।

চাওলা অমনি বলে উঠল : এই দেখুন, কথাটা আপনি কেমন চট্ করে বুঝে গেলেন। অথচ মিত্রাকে এ কথা বোঝাতে আমি হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম। আরে বাবা, পেটটা বড়, না বড়

জীবনটা! সারাদিন পেটের চিন্তা করলে জীবনে আনন্দ করবে কে? এও কি একটা রোগ নয়! সারাদিন রোগের চিন্তা!

মিত্রা আমার দিকে চেয়ে বলল: আগে তো বাইরেই খেতে হচ্ছিল, এখন বাড়িতে রান্না হয়। দুপুরে কোন দিন মাছের ঝোল ভাত, কোনদিন রুটি মাংস। তন্দুরে ও বেশ রুটি স্যাঁকে।

চাওলা বলল: আর দুম্বার মাংস কেমন বাঁধি?

স্বাতি বলল: নিশ্চয়ই অপূর্ব।

মিত্রা বলে উঠল: দোহাই তোমার, আজ তুমি দুম্বার মাংস এনো না।

চাওলা বলল: বাঙালীরা মুর্গি ভালবাসে জানি। কিন্তু বিদেশে ওটা গরিবের খাদ্য। ইয়াঙ্কিরা তো বলে, পয়সার অভাবে শুধু মুর্গি খেয়ে আছি। কিন্তু আমাদের দোষ দেখেছ মিত্রা, নিজেদের নিয়েই আমরা মেতে আছি। ওঁদের কথা কিছুই জানতে চাইছি না।

তার পরে আমার দিকে চেয়ে বলল: তোমাদের প্রোগ্রাম কী তাই তো এখনও বল নি!

বললুম: রাতের ট্রেনে আমরা মরুভারত দেখতে যাচ্ছি।

কথাটা বাঙলায় বলেছিলুম। তাই চাওলা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল: মরুভারত আবার কী?

সংক্ষেপে বললুম: ইণ্ডিয়ান ডেজার্ট।

হো-হো করে হেসে উঠল চাওলা, বলল: পাগল নাকি! মরুভূমিতে বালি ছাড়া আর দেখবার কী আছে!

বললুম: বালির দেশে মানুষও আছে তো! কী করে তারা বেঁচে আছে, তাও দেখব।

স্বাতি বলল: সেখান থেকে এগিয়ে যাব কচ্ছের দিকে। সিন্ধীদের গান্ধীধাম!

এ কথা বলতে গিয়েই চাওলার দু চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমাকে সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বলল:

পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আমরা প্রথমে ঐ দিকেই গিয়েছিলাম। কেন? ঐ দিকটাই আমাদের কাছে ছিল। ভেবেছিলাম সিন্ধীদের সঙ্গে আমরাও সেখানে বসবাস করতে পারব। কিন্তু পারলাম না। কিন্তু কেন পারলাম না জানো?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না।

চাওলা বলল: একদিন আমার দিদি সেখানে হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল!

হ্যাঁ, হারিয়েই গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে আমরা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলাম যে একটা সিন্ধী ছোকরা তাকে নিয়ে পালিয়েছে। পালিয়েছে মানে বুঝতেই পারছ, একা তো পালানো যায় না, অপরের সম্মতিরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার মা সে কথা বুঝলেন না। মনের দুঃখে সেই যে ভেঙে পড়লেন, আর তিনি উঠলেন না।

চাওলার দু চোখে জল টলটল করে উঠেছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: তার পরে আমরা দিল্লীতে চলে এসেছি।

বললুম: তোমাদের গ্রামের বাড়ি তো আমরা দেখে এসেছি!

চাওলা বলল: আমার বাবা তো রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেছেন।

স্বাতি বলল: চমৎকার মানুষ!

আমার মা—

কথাটা চাওলা শেষ করতে পারল না। গলার স্বর তার আটকে গেল।

৫

চাওলার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেলুম না। স্বাতিও অনেক চেষ্টা করেছিল, বলেছিল : এই তো আমবা অনেক খেলাম, দুপুরে আর কোন কষ্ট করবেন না।

কিন্তু চাওলা নাছোড়বান্দা, বলল : কষ্ট! কষ্ট কার! আর কিসের কষ্ট! কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলে তোমরা কি কষ্ট মনে করতে! ছি ছি, পাঞ্জাবীদের তোমরা এই চোখে দেখ! তাও তো আমি আধা বাঙালী হয়ে গেছি।

আমি বলেছিলুম : চল, আজ আমরা কোন হোটেলে গিয়ে খাই।

আজ কেন, কাল থেকে তোমরা রোজ হোটেলে খেও।

তার পবে পরম কৌতুকে বলেছিল : ঠিক আছে, এমন একজনকে ধরে আনব যে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে বুঝতেও পারবে না।

কাকে বল তো ?

বলে মিত্রা তাকিয়েছিল চাওলার দিকে। আর চাওলা বলেছিল : গোপালবাবুর সঙ্গে খুব জমবে। এরা মরুভূমি দেখতে যাচ্ছে তো, সেই মরুভূমির জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু ঘটনা ঘটেছে, দুনিয়ার বই থেকে সব কথা এদের শুনিয়ে দেবে।

তুমি কি পণ্ডিত মিশ্রর কথা বলছ ?

ঠিক ধরেছ।

মিত্রা তখনই বলেছিল : হ্যাঁ, ওঁকে ধরে আনতে পারলে গোপালবাবুর আধখানা বইএর মেটিরিয়াল উনিই দিতে পারবেন। কিন্তু—

কিন্তু আবার কী!

উনি তো গোঁড়া ব্রাহ্মণ!

সে আমি ম্যানেজ করব।

বলে চাওলা বাজারের থলে সংগ্রহ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মিত্রা বলেছিল: কী করে ম্যানেজ করবে বলে যাও!

যাবার সময়েই মাছের থলেটা তাঁকে দেখিয়ে যাব। ভদ্রলোক তাহলে খেয়েই আসবেন।

স্বাতি বলল: আমরাও তাহলে একটুখানি ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

এখান থেকে তো কুতবমিনার কাছে, ভাবছি কুতবেই খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি।

চাওলা বলেছিল: তবে এসো আমার সঙ্গে। ঠিক জায়গায় তোমাদের বাসে তুলে দেব।

কুতবের পথে স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: হঠাৎ কুতব দেখবার শখ হল কেন?

স্বাতি বলল: পুরনো দিনগুলোকে ফিরে পাওয়া যায় কিনা, তাই দেখবার শখ হচ্ছে।

বললুম: এখন তো আমরা এগিয়ে যেতেই চাইছি।

তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরনো দিন দেখতে কি ভাল লাগবে না?

হয়তো ভাল লাগবে।

হয়তো বলছ কেন?

বললুম: এই জন্যেই বলছি যে রোমন্থনের বয়েস আমাদের হয় নি। এই সেদিন তো জীবনের শুরু হল! এখনও তো সজীব আছে সমস্ত ঘটনা।

কুতবমিনারের কাছে এসে স্বাতি একবার উপরের দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলল। বলল: সেদিন কত ছেলেমানুষ ছিলাম বল তো?

বললুম ঃ এ কথা হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন ?

তোমাকে আড়ালে একটা কথা বলব বলে এই কুতবমিনারের মাথায় উঠেছিলাম না ! কিন্তু তোমার বদলে রাণাবাবু এল এগিয়ে। আচ্ছা, রাণাবাবুরা কি আজকাল দিল্লীতে নেই ?

ফিরে গিয়ে চাওলাকে জিজ্ঞেস করব।

স্বাতি বলল ঃ শেষে তোমাকে ডাকতে হল, কিন্তু তুমি আমার মতলবটা বুঝতে পারলে না। রাণাবাবুকে ফেলে যে একটু তাড়াতাড়ি উঠবে—

বললুম ঃ সামান্য একটা কথা বলবার জন্যে যে এমন উঁচুতে উঠতে হয়, এ আমাব জানা ছিল না। তাই ওপরটা দুলে উঠল বলে তুমি যখন আর্তনাদ কবে উঠলে, তখনও কিছু বুঝতে পারি নি।

বলেছিলে, কই, দুলছে না তো ! আর আমি তোমার ডান হাতটা টেনে ধবে সিঁড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে বলেছিলাম, শিগগির নেমে এসো, আর এক মুহূর্তও ওপরে নয়।

আব আমি বোকার মতো পেছন ফিরে রাণাকে ডাকলুম।

কিন্তু আমি তোমাকে শ দেড়েক সিঁড়ি টেনে নামিয়েছিলাম।

বললুম ঃ তার পরেও বলার কথাটা বলতে পার নি। খানিকটা দম নিয়ে বলেছিলে, কী ভয়ই পেয়েছিলাম ! আর আমি হাসছি দেখে চটে উঠে বলেছিলে, তোমার নিজের মাথাটাই তখন দুলছিল কিনা, বাইরের দুলুনি তাই টের পাবে কী করে !

স্বাতি বলল ঃ তার পরে বোধহয় সন্দেহ করেছিলে আমাকে। গম্ভীর হয়ে বলেছিলে—সত্যিই তো !

আর তুমি উঁকি মেরে ভেতরটা দেখে এসে স্বীকার করেছিলে, একটা কথা বলবার জন্যে তোমাকে টেনে নামালাম।

তুমি বলেছিলে, বুঝেছি তা।

বোধহয় বলেছিলুম, মিত্রার সম্বন্ধে কিছু বলবে।

স্বাতি বলল ঃ কী বলেছিলাম মনে আছে ?

বলেছিলে, বড্ড অহংকারী ঐ মেয়েটা। কাল নাক সিঁটকেছিল তোমার পরিচয় জেনে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি গোপালদা, ওর অহংকার তুমি ভেঙে দাও।

তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলে, তাই হবে।

সকাল থেকেই লোকজন এসেছে এই এলাকায়, ঘুরে ঘুরে দেখছে চারিদিক। আমাদের আশেপাশেও অনেকে ছড়িয়ে আছে। খুব কাছাকাছি কয়েকজনকে দেখে স্বাতি বলল: এসো ঐ ধারটায়, নিরিবিলিতে একটুখানি বসি।

একটুখানি তফাতে গিয়ে আমরা বসে পড়লুম।

স্বাতি বলল: এই সব ছেলেমানুষির কথা ভাবলে এখন লজ্জা করে।

বললুম: সেদিন তো এই ছেলেমানুষির জন্যেই তোমাকে চিনতে পেরেছিলুম। সেদিন তো আমি কেরানীর চাকরিই করতুম। কেরানী বলে আই. সি. এস. মিস্টার ব্যানার্জির মেয়ে নাক সেঁটকাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। তোমার বাবাও তো বংশপরিচয়ে খাটো ছিলেন না। তুমিও নাক সেঁটকাতে পারতে, তার বদলে সত্যিকার আঘাত পেয়েছিলে মনে। তোমার ছেলেমানুষিতে সেই দরদী মনটাই আমি দেখতে পেয়েছিলুম। একবার নয়, বারে বারে তোমার এই পরিচয় পেয়েছি। আর এই জন্যেই তো বাঁধা পড়েছি তোমার কাছে।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। বলল: এক দিনে তো তুমি এ সব কথা লিখতে পারবে না। লিখবে ধীরে ধীরে, হয়তো অনেক বছর ধরে। আজকের কথা যখন লিখবে, তখন হয়তো আমরা বুড়ো হয়ে যাব। তখন কি এই সব ছেলেমানুষির জন্যে আরও বেশি লজ্জা করবে না!

বললুম: তখনকার ছেলেমেয়েরা আরও অনেক এগিয়ে যাবে। এর মধ্যে লজ্জার কথা আছে ভাবছি জানলে তারাই লজ্জা পাবে।

কেন ?

ভাববে, সমাজটা এত পিছিয়ে ছিল ! বাঙলার পাঠক বঙ্কিমকে বাতিল করে দিয়েছে, শরৎচন্দ্রকেও বাদ দিতে চাইছে বুদ্ধিমানেরা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

খুব সত্যি।

বললুম : তবু আমাদের এগোতে হবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগোতে হবে। আমরা তো আজকের ভারতবর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, আমরা বিস্মৃত ভারতবর্ষকেই তুলে ধরতে চাইছি একালের মানুষের সামনে। ইচ্ছে হলে দেখবে, না হলে ফেলে দেবে।

কিন্তু ফেলে দিলে তো তোমার শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে !

হেসে বললুম : কবির কথা তো তুমি জানো ?—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পুণ্যের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

স্বাতি বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিল। বলল : এবারে আমরা যেদিকে চলেছি, তারও কি কোন ইতিহাস আছে ?

বললুম : আছে বৈকি।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : আছে !

কেন, তুমি কি ভেবেছিলে মরুভূমির কোন ইতিহাস থাকতে নেই !

মরুভূমির আবার ইতিহাস কিসের !

হেসে বললুম : আমাদের মহাভারতেই আছে এই মরুভূমির ইতিহাস।

এ কথা শুনেই স্বাতি আমার দিকে ফিরে বসল, বলল : মহাভারতে এই মরুভূমির কথা আছে, এ কথা আমি ভাবতেও পারি নি।

এর পরে আমি মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্ব থেকে কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রার গল্প বললুম।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পবে কৃষ্ণ রথে দ্বারকায় ফিরছেন। কিছু দূরে যাবার পর মরুপ্রদেশে তিনি উতঙ্ক মুনির দর্শন পেলেন। ভারতবর্ষে এই একটিই মরুভূমি—দিল্লী থেকে দ্বারকা যাবার পথে। কিন্তু এ পথে জনসাধারণ বোধহয় যাতায়াত করত না, তাই উতঙ্ক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের খবর পান নি। কৃষ্ণকে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার চেষ্টায় কুরুপাণ্ডবেব মধ্যে সদ্ভাব হয়েছে তো! কৃষ্ণ বললেন, সন্ধির জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবেরা নিহত হয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে উতঙ্ক বললেন, তুমি চেষ্টা কবে থাকলে এ রকম কিছুতেই হতে পারত না। তোমাকে আমি শাপ দেব। কিন্তু শাপ দেওয়া তাঁর সম্ভব হল না। কৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে বললেন, আপনি আমার কাছে বর নিন। উতঙ্ক বললেন, এই বর দাও যেন এই মরুভূমিতে আমি জল চাইলেই জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন হলেই আমাকে স্মরণ করবেন। তার পরে দ্বারকার পথে এগিয়ে গেলেন।

নিঃশব্দে স্বাতি গল্প শুনছিল, বলল: এ গল্প মহাভারতের?

বললুম: হ্যাঁ। গল্পের আরও খানিকটা বাকি আছে।

বল।

কিছু দিন পরে মরুভূমিতে চলতে চলতে উতঙ্ক তৃষ্ণার্ত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তার পরেই এক দিগম্বর চণ্ডালকে দেখতে পেলেন কাছে, হাতে তার খড়্গ ও ধনুর্বাণ, সঙ্গে একপাল কুকুর। এই চণ্ডালের অধোদেশ থেকে জল পড়ছিল। উতঙ্ককে বলল, তুমি এই জল পান কর। উতঙ্ক রেগে বললেন, আমি তোমার প্রস্রাব পান করব! বলে তিরস্কার করলেন তাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাল অন্তর্হিত হল।

স্বাতি বলল: কৃষ্ণই কি চণ্ডালের বেশে এসেছিলেন?

বললুম ঃ না। ইন্দ্র এসেছিলেন চণ্ডালের বেশে। কৃষ্ণ তাঁকে অমৃত দিতে বলেছিলেন। ইন্দ্র বলেছিলেন, মানুষকে তো অমৃত দেওয়া উচিত নয়। আমি তাই চণ্ডালের বেশে অমৃত নিয়ে যাব। তাঁব ভাগ্য থাকলে অমৃত তিনি পাবেন। ইন্দ্র চলে যাবার পরে কৃষ্ণ এলেন উতঙ্কের কাছে। বললেন, ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে তো আপনি ভুল করেছেন। যাই হোক, আমি এইবারে বর দিচ্ছি যে আপনার তৃষ্ণা হলেই মেঘ এই মরুভূমিতে জল বর্ষণ করবে। সেই মেঘের নাম হবে উতঙ্ক মেঘ।

একটু থেমে বললুম ঃ মহাভারতের লেখক বেদব্যাস বলেছেন যে এখনও উতঙ্ক মেঘ এই মরুভূমিতে জল বর্ষণ করে। কিন্তু উতঙ্ক তো নেই, তাই মেঘ আসে মরুবাসীদের কাতর প্রার্থনায়। প্রতি বছর আসে না, আসে অনেক বছর পরে পরে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে স্বাতি বলল ঃ চল, এইবারে ওঠা যাক।

বললুম ঃ আর কিছু দেখবে না ?

না।

আমি আশ্চর্য হয়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল ঃ মরুভূমি দেখবার জন্যে মন তৈরি হয়ে গেছে। পণ্ডিত মিশ্রর দেখা পেলে মরুভূমির কথা শুনব।

বললুম ঃ হিমালয়ের মতো মরুভূমির আকর্ষণ তো নেই, সমুদ্রের মতো আকর্ষণও নেই। মরুভূমি দেখতে কেউ যায় না।

স্বাতি বলল ঃ কোন আকর্ষণ আছে কিনা, তাই দেখতেই তো আমরা যাচ্ছি।

হয়তো হতাশ হব।

হয়তো হব না।

বললুম ঃ সেই আশা নিয়েই যাওয়া যাক।

আমরা উঠে পড়লুম।

৬

পণ্ডিত মিশ্রর সঙ্গে পরিচয় হল চাওলাদের বাড়িতেই। দিল্লীর কোন কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়াতেন। সম্প্রতি অবসব নিয়েছেন। এখনও লেখা পড়া নিয়ে তাঁর সময় কাটে। থাকেন এই পাড়াতেই। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, স্বগৃহেই আহার করে এসেছেন শুনে চাওলা মিত্রার দিকে চেয়ে কটাক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। তাব পরে আমার পরিচয় দেবার সময়ে বলল: পণ্ডিতজী. আমার এই দোস্ত্ প্রচুব পড়াশুনো কবেছে, আব এখনও করে। পুরনো দিনের কথায় এব গভীব শ্রদ্ধা। এব জন্যেই আপনাকে তক্‌লিফ দিলাম।

পণ্ডিতজী বললেন: তক্‌লিফ আর কী, আমি তো সারা দিন বসেই থাকি।

চাওলা বলল: এরা এবারে মরুভূমি দেখতে যাচ্ছে—বিকানের যোধপুর জয়সলমের বার্মের, তার পরে কচ্ছ। এর ধারণা যে এসব জায়গার কোন প্রাচীন ইতিহাস নেই, কোন প্রাচীন গ্রন্থে এসব জায়গার কথা পাওয়া যায় না। কথাটা নিশ্চয়ই সত্য নয়!

আমি চাওলাব চাতুর্য দেখে আশ্চর্য হলুম। পণ্ডিতজীকে সে এক কথায় আলোচনার মাঝখানে টেনে আনল। তাই আমি নিজে আর কোন কথা বললুম না।

পণ্ডিতজী বললেন: ব্যাপারটা বুঝতে হলে এ সব জায়গার প্রাচীন নাম আমাদের জানতে হবে। মানে, থর বা ইণ্ডিয়ান ডেজার্ট নাম সে যুগে নিশ্চয়ই ছিল না। ডেজার্ট তো ইংরেজী শব্দ। পুরাকালে এ দেশে কোন্ ভাষা প্রচলিত ছিল, তাও আমাদের জানতে হবে।

পণ্ডিতজীও যে নিজের জ্ঞানের বলয়ের মধ্যে আলোচনাকে টেনে আনলেন, তা বুঝতে পারলুম। খানিকটা কৌতূহল প্রকাশের জন্য বললুম: সংস্কৃতের আগে কি অন্য কোন ভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল?

খুশী হলেন পণ্ডিত মিশ্র, বললেন: আমার নিজের কিছু মতামত আছে। পুরাকালের কথা পড়তে পড়তেই আমার কতকগুলো ধারণা মতামতে পরিণত হয়েছে। যেমন, এক সময়ে পৃথিবীতে একটি ভাষা প্রচলিত ছিল। পৃথিবী তখন এত বড় ছিল না। তখন এই পৃথিবী বলতে শুধু দুটি মহাদেশ বোঝাত—ইয়োরোপ আর এশিয়া। তার মানে, মানুষ পায়ে হেঁটে যত দূর যাতায়াত করতে পারত বা যত জায়গাব কথা জানা সম্ভব ছিল, ততটাই ছিল সেকালের পৃথিবী। এই পৃথিবীর ভাষা ছিল ব্রহ্মভাষা, মানুষের শিক্ষার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। আর্যরা যদি মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে থাকে তো এই ভাষা ও এই বিদ্যা নিয়েই এসেছিল। সিন্ধুর তীরে এসে তাদের হিন্দু নাম হয়। যে ধর্ম তারা অনুসরণ করত, তারই নাম হিন্দু ধর্ম। আর তাদের পুরাতন ভাষাকে মার্জিত করে তার নাম দেয় সংস্কৃত। বেদ আমাদের আদি ভাষায় রচিত। এ ভাষা ব্রহ্মভাষারই রূপান্তর। ব্রহ্মভাষাই কালক্রমে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

আমি বললুম: ব্রহ্মভাষাই কি দেশান্তরে অন্য রূপ পেয়েছে?

পণ্ডিতজী বললেন: ভাষার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করলে এই কথাই মনে হবে। সংস্কৃত উত্তর ভারতের আদি ভাষা, কিন্তু পৃথিবীর আদি ভাষা বলে দাবী করা সঙ্গত হবে না। অথচ এই ভাষার সঙ্গে নানা দেশের ভাষার সাদৃশ্য আছে।

স্বাতি আমাদের আলোচনা মন দিয়ে শুনছিল। এইবারে বলল: একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: খুব বেশি শব্দ তো আমার জানা নেই, গোটাকয়েক শব্দ জানি।

স্বাতি বলল : একটা শব্দের তারতম্য শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারব।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : সংস্কৃত পিতৃ শব্দটাই ধরা যার্ক। প্রথমায় এর রূপ পিতর্। জেন্দে পদর, গ্রীকে পাটর বা পাতর, ল্যাটিন বা লাতিনে পেটর বা পেতর, জর্মনে ফাতর, ইংরেজীতে ফাদার।

তার পরেই বললেন : গ্রীক ল্যাটিন জর্মনের সঠিক উচ্চারণ জানি নে বলে বেশ অসুবিধা হয়। তবে মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে এই সব শব্দের কোথায় একটা মিল আছে। এর থেকেই আমার ধারণা হয়েছে যে ব্রহ্মভাষাই দেশে দেশে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। আর এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে মানতে হবে যে হিন্দু ধর্মই বিশ্বের সনাতন ধর্ম, ভারতে তা বিধিবদ্ধ হয়েছে, অন্যত্র তা হবার সুযোগ হয় নি।

কেন ?

তার আগেই জন্ম হয়েছিল জরথস্ত্র, বা জোরোয়াস্টারেব। তিনি সূর্য ও অগ্নির উপাসনার প্রচলন করলেন। বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উপহার দিলেন ভাবতের হিন্দুকে। এমনি করেই যীশু খৃষ্ট হজরত মহম্মদ গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেছেন, আর মানুষ তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশ্বের সনাতন ধর্মই যে হিন্দু ধর্ম, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমরা আমাদের আলোচনার বাইরে চলে যাচ্ছি দেখে বললুম : ভারতের বিভিন্ন জায়গার প্রাচীন নাম আপনি বলতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রলোক লজ্জিত ভাবে বললেন : বয়েস হয়েছে বলে অনেক সময়েই খেই হারিয়ে ফেলি।

আমিও লজ্জিত হয়ে বললুম : না না, তা নয়।

পণ্ডিতজী বললেন : ভারতের কয়েকখানি প্রাচীন মানচিত্র আমি দেখেছি। তাতে কিছু পার্থক্যও চোখে পড়েছে। কাজেই

কোন্‌টা ঠিক তা বলা শক্ত। এই নিয়ে কিছু পড়াশুনোও করেছি। লেগে থাকতে পারলে হয়তো এ সব অসঙ্গতির কারণ ধরা পড়তে পারে।

স্বাতি বলল : একটা অসঙ্গতির কথা বললে ব্যাপারটা বুঝতে পারব।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : এই ধরুন, বহ্লীক দেশের উল্লেখ আমরা অনেক জায়গাতেই পাই। এই দেশটা ভারতের অভ্যন্তরে, না বাইরে, এ নিয়েই মতের পার্থক্য আছে। একখানা প্রাচীন মানচিত্রে দেখেছি যে সিন্ধুনদের পশ্চিমে গান্ধার, আর বহ্লীক তার উত্তরে। মোটামুটি ভাবে গান্ধার অবিভক্ত ভারতের সীমান্তে এবং বহ্লীক আফগানিস্তান পারস্য ও রাশিয়ার কতটা অংশ জুড়ে ছিল তা অনুমান করা যায় না। অথচ হাল আমলে ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে দেখি যে বহ্লীকের অবস্থান ভারতের অভ্যন্তরে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মাঝে। কে কোন্‌ মানচিত্র কোন্‌ সূত্র ধরে এঁকেছেন, তা লেখা না থাকায় আমাদের মতো সাধারণ লোকের বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

স্বাতি বলল : সত্যিই বিপদ।

আমি বললুম : বিপদ হলেও সত্য নির্দেশে নিশ্চয়ই সহায়তা করছে। আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

তা পারব।

এ আলোচনায় চাওলার কোন কৌতূহল ছিল কিনা জানি না। সে কয়েকবার উঠে গিয়ে রান্নাঘরে মিত্রাকে দেখে এসেছে। বোধহয় তাকে সাহায্য করবারও চেষ্টা করেছে। এইবারে বলে উঠল : বহুৎ ইণ্টারেস্টিং সাব্‌জেক্ট পণ্ডিতজী। আরও কিছু পুরনো জায়গার নাম বলুন।

চাওলার দিকে চেয়ে পণ্ডিত মিশ্র বললেন : এঁরা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার দুটো নাম পাওয়া যায়—মরুদেশ ও মরুস্থলী।

কিন্তু এ দুটি একই জায়গার নাম নয়। আরাবল্লী পাহাড়ের নাম ছিল অর্বুদ পর্বত। ঠিক তারই গায়ে সমান্তরাল হল মরুদেশ। মরুস্থলী তার উত্তর-পশ্চিমে।

তার পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: এই অর্বুদ পর্বত বা আরাবল্লী পাহাড় রাজস্থানকে দ্বিখণ্ডিত করেছে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এক দিকে সুজলা সুফলা ভূমি, অন্য দিকে মরুভূমি। আলোয়ারের দক্ষিণে বিরাট রাজ্য, তার সীমান্তে মৎস্য। রাজস্থানের বর্তমান রাজধানী জয়পুব এই মৎস্যের অন্তর্গত। অর্বুদ পাহাড়ের উত্তব প্রান্তে চ্যবন আশ্রম, আর বশিষ্ঠের আশ্রম দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান আবু পাহাড়ের উপরে। কচ্ছ উপসাগরের পূর্ব তীরে সৌভীর রাজ্য। আর কচ্ছেব প্রাচীন নাম মানচিত্রে দেখা যায় ঔতুম্বব, কিন্তু মহাভারতে কচ্ছ নামই পাওয়া যায়। মুষিক নামে একটি রাজ্য নাকি দক্ষিণে ছিল, কিন্তু মানচিত্রে মুষিক মরুস্থলীর উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরে।

পণ্ডিত মিশ্রকে থামতে দেখে স্বাতি বলল: আরও কিছু মহাভারতের নাম বলুন।

পণ্ডিতজী হেসে বললেন: মদ্র বর্তমান মাদ্রাজের নাম ছিল না। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী দেশের নাম ছিল মদ্র। অনেকে বলেন, এই মদ্র রাজ্য ভারতের বাহিরে ছিল। তার প্রমাণ এখনও আমি পাই নি। বালুচিস্থানের কিরথর পর্বতের নামছিল সোম পর্বত, আর হিন্দুকুশ পর্বতের নাম নিষধ পর্বত। কম্বোজ ছিল এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সিন্ধু নদের পশ্চিমে। আর নিষধ পর্বতের দক্ষিণে দরদ, উদয়ন, মিচি ও গান্ধার রাজ্য। পুরুষপুর ও তক্ষশীলা এই রাজ্যেই অবস্থিত ছিল। কাশ্মীরে ছিল বরাহ ক্ষেত্র, হরিদ্বারের দক্ষিণে ছিল কুরুদেশ, আর উত্তর কুরু বহ্লীক দেশের পশ্চিমে বর্তমান তিব্বতে। গোমুখের উত্তরে ছিল সুমেরু ও পূর্বে কৈলাস পর্বত। বুর্মবন হরিদ্বারের পূর্বে।

পণ্ডিত মিশ্র একটু থেমে বললেন : এমনি করে আরও অনেক নাম বলা যায়, কিন্তু বলে তো কোন লাভ নেই।

কেন ?

এ নিয়ে উপযুক্ত গবেষণা হওয়া দরকার। এখনও আমরা মহাভারতকে মহাকাব্য বলছি, ইতিহাস বলে স্বীকার করে নিতে পারছি না। তাই দেশের ঐতিহাসিকেরাও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। অথচ এই মহাভারত নিয়ে গবেষণা হলেই আমরা সেকালের প্রত্যেকটি রাজ্যকে আবিষ্কার করতে পারব।

আমারও এ কথা অনেকদিন মনে হয়েছে, কিন্তু আমি ঠিক এমন করে কখনও ভাবি নি। তাই গভীর মনোযোগ দিয়ে পণ্ডিত মিশ্রর কথা শুনতে লাগলুম। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন : বর্তমান উত্তর প্রদেশেই ছিল অনেকগুলি রাজ্য—কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, বৎস, কোশল ও কাশী। হস্তিনাপুর মীরাটের নিকট, আর দিল্লীতে ইন্দ্রপ্রস্থ। পাঞ্জাবে ত্রিগর্ত, কেকয় ও মদ্র। কুরু পাঞ্চালের সীমান্তে বিরাট ও মৎস্য। মরুদেশে লুনি নদীর উত্তরে শাকম্ভরী, শক ও হুন রাজ্য। দক্ষিণে শাম্ব পুলিন্দ। ভোজ মালব ও দশার্ন মধ্যপ্রদেশে। বিহারে বিদেহ কীকট ও মগধ। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ। আসামে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ত্রিপুরায় কিরাত রাজ্য। তার পরে মণিপুর পেরিয়ে নাগলোক ব্রহ্মদেশে। অর্জুন মণিপুরে পেয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদাকে, আর বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধের পরে নাগলোক থেকে এসেছিলেন উলুপী। একটি প্রাচীন মানচিত্রে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মদেশেই ছিল কম্বোজ রাজ্য।

চাওলা অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। এইবারে বলল : পণ্ডিতজী, মরুভূমির কিছু পুরনো কেচ্ছা শোনাবেন না ?

কিন্তু এ কথায় পণ্ডিতজীর কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তবু আমার দিকে চেয়ে বললেন : মহাভারতের কালে মরুভূমির ওপর দিয়ে যে দ্বারকার পথ ছিল, তা বোধহয় তোমাদের জানা!

বললুম: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ এই পথেই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। মরুভূমিতে তাঁর উতঙ্ক মুনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: কিন্তু খট্‌কা লাগছে আর একটি ঘটনায়।

সে কোন্ ঘটনা?

যদুবংশ ধ্বংস হবার পরে অর্জুন দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরছেন কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী, পৌত্র বজ্র এবং অসংখ্য নারী বৃদ্ধ ও বালক নিয়ে। কিছুদিন পরে তাঁরা ধান্য সম্পন্ন পঞ্চনদ প্রদেশের একস্থানে এলে আভীর দস্যুরা তাঁকে আক্রমণ করে এবং সুন্দরী নারীদের হরণ করে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হল, এই স্থানটি কোথায়? মরুভূমির উত্তর দিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই আসছিলেন না, মরুভূমি অতিক্রম করবার সময়ে বা তার ঠিক পরেই এই দস্যুরা এসেছিল। কিন্তু তাকে পঞ্চনদ প্রদেশ কেন বলা হল, কেন মরুদেশ বা মরুস্থলী বলা হল না!

বললুম: উত্তর একটাই আছে।

স্বাতি বলে উঠল: কী উত্তর?

বললুম: অর্জুন বোধহয় মরুভূমিকে এড়িয়ে আসছিলেন।

কেন?

তাঁর সঙ্গে এত স্ত্রীপুরুষ ও শিশু ছিল যে তাদের খাদ্যাভাব ও জলকষ্টের কথা ভেবেই তাঁকে এমন পথ ধরে ফিরতে হচ্ছিল যে সে সব কষ্ট এড়ানো সম্ভব।

পণ্ডিত মিশ্র চিন্তিত ভাবে বললেন: তা হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে মরুদেশেরই কোন শস্যশ্যামল অঞ্চলে পৌঁছেই তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই অঞ্চলটি ছিল পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত।

স্বাতি বলল: এও হতে পারে।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: মহাভারতে আছে যে কোন কোন নারী স্বেচ্ছায় দস্যুদের কাছে গিয়েছিল। কৃষ্ণ ছিলেন চন্দ্রবংশীয়। সেই

অপহৃতা চন্দ্রবংশীয় নারীরা পাঞ্জাব ও রাজস্থানের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৃদ্ধ ও শিশুদের কী হল ?

বলে আমি পণ্ডিত মিশ্রর মুখের দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন: রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর যাদবেরা পঞ্চনদের দোয়াব নামে কোন জায়গায় বসবাস করতেন। সে জায়গার নাম হয়েছিল যদুকা ডাঙ্গন। এঁরাই পরে সিন্ধুর পরপারে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তার পরে গজনি নগর প্রতিষ্ঠা করে সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করেন। কত দিন পরে তাঁরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে ফিরে আসেন, তা জানা যায় না। এঁদের মধ্যেই একজন পঞ্চনদে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসেন মরুদেশে। মোহিলা জহ্লারা তখন মরুভূমির অধিবাসী। তাদের তাড়িয়ে তিনি যে তিনটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের নাম টিনোট, দারোয়াল ও জয়সলমের। এই ঘটনা ১২১২ সংবতের বা ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দের।

বললুম: এ কালের ইতিহাসে তো দেখতে পাই রাওলজয়সাল নামে একজন ভট্টি রাজপুত ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়সলমের শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: আমি যে কথা বললাম, তা চারণ কবিদের কাছ থেকে পাওয়া। ভট্টিদের কথাও চারণদের কাছে পাওয়া যায়। তারা বলে যে সিন্ধুর পশ্চিম থেকে তাড়া খেয়ে যে যাদবরা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ভট্টি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। রাঠোরদের আগে ভট্টির বংশধরেরাই রাজত্ব করেছেন।

স্বাতি বলল: রাঠোর কারা ?

তারা সূর্যবংশের। তাদের কথায় আমি পরে আসছি।

বলে পণ্ডিত মিশ্র বললেন: যদুবংশের আরও অনেকগুলি শাখা আছে। অনেকে বলেন, এদের আটটি শাখা। মহারাষ্ট্রে ও

দাক্ষিণাত্যেও যদুবংশের শাখা দেখতে পাওয়া যায়। রাজস্থানে ভট্টির মতো জারিজা এবং তুয়ার বা তোমর বংশ। জারিজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু তোমর বংশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বললুম: দিল্লীর অনঙ্গপাল তো তোমর বংশের রাজা ছিলেন।

পণ্ডিত মিশ্র খুশী হয়ে বললেন: ঠিক বলেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে প্রায় আটশো বছব ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন শূন্য ছিল। দীর্ঘ কালের অরাজকতার পরে ৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গপাল তোমর এই সিংহাসনে বসেছিলেন। এই বংশেব শেষ রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর দৌহিত্র পৃথ্বিরাজ চৌহানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন।

এই সময়েই মিত্রা স্নান করে বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই চাওলা বুঝতে পারল যে আমাদের দুপুরের আহাব তৈরি হয়ে গেছে। বলল: তুমি এইখানে বোসো, আমি তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে আসছি।

বলে ভিতরে ঢুকে গেল।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: তোমাদের খাওয়া এখনও হয় নি?

মিত্রা বলল: এইবারে হবে।

ছি ছি, আমাকে এ কথা আগে বল নি কেন!

বলে ভদ্রলোক উঠে পড়ছিলেন। মিত্রা বলল: আর একটু বসুন।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন: ঠিক আছে, খুব সংক্ষেপে বাকিটা বলছি।

চোখ বন্ধ করে তিনি কিছু ভাবলেন, তার পরে বললেন: রাজস্থানের রাজারা নিজেদেব সূর্যবংশীয় বলে প্রচার করেছেন। আপনি রাঠোরদের কথা জানতে চেয়েছিলেন। রাঠোররা বলেন, তাঁরা রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশের বংশধর, কনৌজ তাঁদের আদি

বাসস্থান। আমার ধারণা যে এই রাঠোরদের জন্যেই ভারত মুসলমানের পরাধীন হয়েছে।

কেন ?

মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণে উদ্যত, তখনই তোমর ও চৌহানদের সঙ্গে রাঠোরদের গৃহবিবাদ শুরু হয় আর পৃথিরাজ চৌহান একা যুদ্ধ করে প্রাণ হারায়। এরা সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করলে পৃথিরাজেব পরাজয় হত না।

স্বাতি বলল : এই চৌহানরাও কি রামের বংশধর ?

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : না। এঁরা অগ্নিকুলের ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত। অগ্নিকুলের গল্প জানেন তো ?

আলোচনা শীঘ্র শেষ করলে মিত্রা খুশী হবে ভেবে আমি বললুম : জানি।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : অর্বুদ পর্বত-শিখরে বশিষ্ঠের আশ্রমে ঋষিদের অগ্নিকুণ্ডে জন্ম হয়েছিল চার জনের। তারা চারটি ক্ষত্রিয় জাতির জনক হয়েছিল প্রসার প্রতিহার চালুক্য ও চৌহান। এ গল্প রূপক হতে পারে। কিন্তু ঋষিরা কেন যজ্ঞ করে ক্ষত্রিয়দের আহ্বান করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার নিজের একটা মত আছে।

আমি তাঁর মত শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ভদ্রলোক বললেন : জৈনধর্ম তখন প্রবল হয়ে উঠছিল। ব্রাহ্মণেরা তাকে দমন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে ব্রাহ্মণের অগ্নিকুণ্ডে জন্ম এই কথা প্রচারিত হলে তারা নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

বললুম : ভেবে দেখবার মতো কথা।

পণ্ডিত মিশ্র বললেন : আর নয়, এইবারে আমি উঠি।

বলে এবারে আমাদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে নমস্কার করে ফিরে এলুম।

নানারকমের রান্না করেছিল মিত্রা। সে সব টেবিলে আনবার জন্যে মিত্রাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল চাওলা। কিন্তু স্বাতি তাকে ঠেলে দিয়ে নিজে এগিয়ে গেল। মিত্রাকে বলল: পুরুষমানুষকে রান্নাঘরে ঢুকতে দাও কেন মিত্রাদি?

চাওলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল: কেন দেয় তা তুমি বুঝবে না স্বাতিদি।

মিত্রা অমনি বলে উঠল: বাপ তুলে গাল দিও না বলছি।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে ভরে গেল চাওলার মুখ, বলল: ছি ছি, তোমার অত বড় বাপ! তাকে আমি গাল দিতে পারি!

স্বাতি হেসে বলল: ব্যাপারটা কী।

মিত্রা বলল: বিয়ের আগে রান্নাঘরে তো কোন দিন ঢুকি নি, রান্না কাকে বলে তাও জানতাম না। তাই নিয়ে অনেক তামাসা হয়েছে।

চাওলা বলল: তামাসা করেছি বলেই তো একদিন খানসামাকে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে রান্নাঘরে ঢুকেছ।

মিত্রা বলল: ভুল বোলো না। রান্না শিখে খানসামাকে জবাব দিয়েছি।

খেতে খেতে স্বাতি বলল: তোমার রান্নার হাতটি তো ভারি মিষ্টি!

চাওলা বাঙলায় বলল: মারের হাতটিও মিষ্টি। দরকার হলে এখনও—

মিত্রার দু চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঝলসে উঠল। সেই পুরনো দৃষ্টি। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে ফেলল। বলল: জুতো-ছাতার মার খাবার অভ্যাস ছিল তো, খালি হাতের মার তাই মিষ্টি লাগে।

কথাটা মিথ্যে নয় দোস্ত্।

বলে চাওলা আমার দিকে চেয়ে বলল: মিস্টার ব্যানার্জির কাছে যে মার খেয়েছি, তার পরে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারব বলে আশা ছিল না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: সে আবার কী!

চাওলা বলল: সে সব কথা তো কাউকে বলা যায় না, নিজেদের ব্যাপার। একেবারে পারিবারিক।

তার পরে মিত্রার দিকে একবার কটাক্ষে দেখে নিয়ে বলল: তবে তোমাদের আমরা পরিবারের লোক বলেই ভাবতে পারি। কী বল?

সে তোমার বদান্যতা।

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

চাওলা বলল: আমার বিজনেসের ব্যাপারটা তো তুমি জানতে! এদিক থেকে ওদিক করে আমার চলত। গাড়িটা ছিল ডাঁট দেখাবার জন্যে। হঠাৎ দেখি, এদিকের হাত আর ওদিকে যায় না। ব্যাপার কী! খোঁজ খোঁজ! অগতির গতি হন এর ভাই রাণা। সে বলল, টপ করে বিয়ে করে ফেল, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বললাম, তার মানে?

মিত্রা বলল: তোমরা মিথ্যে বাবাকে সন্দেহ করেছিলে!

সন্দেহ করেছিলাম বলেই তো বিয়ে করতে তুমি রাজী হয়েছিলে! তা না হলে তোমার ধনুক ভাঙা পণ কি আমি ভাঙতে পারতাম!

ওদের বিয়ের আগের কথা আমি জানি। দুজনে আলাদা ভাবে বলেছিল আমাকে। সেবারে সারাদিন ওখলায় কাটিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছি, মিত্রা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: চাওলার কথা কিছু জানতে চাইলেন না?

আমি বলেছিলাম: তার কি প্রয়োজন আছে?

প্রয়োজন! আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার আছে। আপনি জানতে না চাইলেও আমি বলব।

তার পরেই বলেছিল : ওকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

আমি বলেছিলাম : ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

চলতে চলতে মিত্রা বলেছিল : তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটে কুড়ুনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ একটা বিলাস। তার মন সমাজসচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে সে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

আর চাওলা অন্যত্র আমাকে বলেছিল : আমার দুঃখ কী জানো ? ভগবান নামে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি দুটো জিনিস এক সঙ্গে দেন না—বুদ্ধি আর ভাগ্য, কিংবা রূপ আর হৃদয়। যার বুদ্ধি দেন বেশি, তার ভাগ্য করেন ভোঁতা। আর রূপ ঢেলে দিলে হৃদয়টা কেড়ে নেন।

চাওলার আরও একটা বাধা ছিল এবং সে বাধাও কম নয়। মিত্রার বাবার কাছে পরীক্ষায় সে হেরে গিয়েছিল। তিনি যে পরীক্ষা নিচ্ছেন, এ কথা চাওলা বুঝতেই পারে নি। যখন বুঝল, তখন আর শোধরাবার উপায় ছিল না। চাওলাই আমাকে বলেছিল : ঝানু আই. সি. এস. আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঋণ করে একদিন-পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় জরুরি দরকার, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধার কর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পারতাম না! কিন্তু পিছিয়ে এলাম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব পরে জানতে পেরেছিলাম, বুড়ো আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন অমনি করে।

হাসতে হাসতেই সে যোগ করেছিল : তাঁর ধারণা যে পয়সা-ওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা বার করবেই, আর ধার কর্জ করে দিলে প্রেমটা খাঁটি বুঝতে হবে।

স্বাতি আমার মতো পুরনো গল্পের মধ্যে ডুবে যায় নি। সে বলল : ধনুক ভাঙার গল্পটা বলুন না মিস্টার চাওলা!

ও বলবে কি, আমি বলছি।

বলে মিত্রা বলল : ওরই ভয়ে বাবা দিনে দিনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে না পেরে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন যে বিদ্রোহ না করে আমার আর উপায় রইল না।

চাওলা হাসছিল।

স্বাতিও সহাস্যে বলল : কার সঙ্গে মিত্রাদি?

মিত্রা বলল : খুব ধনী লোক তারা, বেরিলিতে তাদের ভুরার কারবার!

ভুরা কী?

ভুরা জানো না! দিশি চিনি, গুড়ের মতো তার স্বাদ।

চাওলা সকৌতুকে বলল : ছেলেটি কী রকম?

মিত্রা বলল : ভুরার একটি বস্তা।

তার কথা বলার ধরনে স্বাতি ও আমি এক সঙ্গে হেসে উঠলুম। কিন্তু চাওলা গম্ভীর ভাবে বলে উঠল : হেসো না দোস্ত্, এ সব সীরিয়স ব্যাপারে হাসাহাসিটা ভাল নয়।

তার পরে মিত্রার দিকে চেয়ে বলল : দেখতে কেমন ছিল, তা জানতে চাইছি না। তার সঙ্গে আলাপ করে কেমন লেগেছিল তাই বল।

মিত্রা বলল : কথাটা আবার শুনতে চাও তো!

চাওলা বলল : গোপালবাবুর তো জানা নেই, তাই বলতে বলছি।

আমার দিকে চেয়ে মিত্রা বলল : আপনার মনে আছে তো, বাবা আমাকে আপনার কাছেও পাঠিয়েছিলেন! সারা দিন একসঙ্গে কাটাবার পরেও আপনি আমাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি, ওর সম্বন্ধেও না। তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জেগেছিল। কিন্তু অস্বীকার করব না, সেদিন আপনাকে আমি খুব অহঙ্কারী ভেবেছিলাম, আর একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে ভুগছেন বলে সন্দেহ করেছিলাম। পরে স্বাতি আমাকে বলেছিল, না. ওটা ঠিক নয়। সেই নাকি আপনাকে ঐ রকম আচরণ করতে শিখিয়েছিল।

আমি আশ্চর্য হলুম এই কথা শুনে। এটি আমার কাছে একটি নতুন কথা। আরও একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। দেরাদুন থেকে দিল্লী আসার পথে চাওলারাই আমাকে বলেছিল সেই কথা। চাওলা নাকি রাজকন্যার দুঃখ বোঝে না, মিত্রা তাই তাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না শুনে আমি কোন প্রতিবাদ করি নি। কিন্তু স্বাতি নাকি এই কথা শুনে মিত্রাকে বলেছিল, রাজার ঘরে যতক্ষণ ততক্ষণই রাজকন্যে। সেকালের রাজকন্যারা যখন মুনি ঋষিকে বিয়ে করতেন, তখন কি আর কেউ তাঁদের রাজকন্যে বলত! বলেছিল, মিস্টার চাওলার মতই ঠিক। রাজার ঘরের রাজকন্যার জন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই। যখন তিনি ঘুঁটে কুড়ুনীর মতো ঘুঁটে কুড়োন, তখন তিনি আর রাজকন্যে নন, তখন তিনি আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ। তাঁরও দুঃখ বেদনার জন্যে আমরা দায়ী হব। বলেছিল, মনের মিলনের জন্যে তো কোন উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ বা প্রতিপত্তির অভাব কেন তার প্রতিবন্ধক হবে! স্বাতি তার নিজের ধারণার কথাও নাকি বলেছিল। এ যুগে একজনের রোজগারে সংসারের অভাব কোন দিন ঘুচবে না। অন্তত প্রথম জীবনে। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই এখন সমান সংগ্রাম করতে হবে। মিত্রাকেও সে একটা চাকরি

করার পরামর্শ দিয়েছিল এবং নিজে যে তার জন্যে তৈরি হচ্ছে, সে কথাও নাকি বলেছিল।

মিত্রা যে স্বাতির সব কথা মেনে নিয়েছিল, সে কথা আমি সেবারেই জেনেছিলুম। চাওলাকে বিয়ে করবার আগেই সে চাকরি নিয়েছিল। এখনও সে নিশ্চয়ই চাকরি করে। কিন্তু আজ তো তারা কেউ কাজে গেল না! আমাদের জন্যেই কি গেল না! বেশ লজ্জিত ভাবে আমি বলে উঠলুম: আমাদের জন্যেই আজ তোমরা কাজে যেতে পারলে না তো!

এই অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে চাওলা হো-হো করে হেসে উঠল।

আমি আরও লজ্জিত হয়ে বললুম: হাসলে যে!

শুধু একটা কারণে নয়, দুটো কারণে হাসলাম। প্রথম কারণ, আজ যে রবিবার সে কথা তুমি বেমালুম ভুলে গেছ। আর দ্বিতীয় কারণ, তুমি এখন অন্যমনস্ক!

বললুম: অন্যমনস্ক বলতে পার না, আমি তোমাদের কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু মিত্রা তো তোমার কথা বলছিল! তুমি আউট্ হলে কী করে, সেই কথা শোন।

বললুম: ক্লীন বোল্ড্।

চাওলা হেসে উঠে বলল: বুঝেছ তাহলে!

তার পরেই বলতে লাগল: আমি বাজী ফেলেছিলুম মিত্রার সঙ্গে। শর্ত একটা। গোপালবাবু এলাহাবাদে নামলে আমি আউট্, না নামলে—

গোপাল আউট্।

উহুঁ, হল না।

তবে?

চাওলা হেসে বলল: মিত্রা ইন। মানে চাওলার মুঠোর মধ্যে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : রাজী হয়েছিল মিত্রা ?

চাওলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এ রকম শর্তে কি মিত্রা রাজী হয়! কিন্তু মিত্রার একটু সন্দেহ ছিল তোমার সম্বন্ধে, যে সন্দেহ স্বাতিদির মনে বিন্দুমাত্র ছিল না।

মানে ?

মানে খুব সোজা। মিত্রা তোমাব গতিবিধির উপরে নজর রেখেছিল। এলাহাবাদের সেই টাকার কুমীরের পোষ্যপুত্র হবাব জন্যে তুমি সেখানে নামলে কিনা, সিনিয়ার ব্যানার্জি টেলিফোনে সেই খবর নিলেন। ট্রেন থেকে নামো নি খবর পাবার পরেও কিছু দিন অপেক্ষা করেছিলেন। মাঝে মাঝে টেলিফোনে খবব নিতেন এলাহাবাদ থেকে। আর মিত্রা স্বাতির কাছে খবব পেল যে তুমি তোমার পুবনো বাজপদে আবার সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ।

বলে প্রবল ভাবে হেসে উঠল।

আমিও হেসে বললুম : এতে হাসির কী আছে!

চাওলা বলল : তোমার রাজপদের সম্বন্ধে কী একটা যেন মজাব কথা বলেছিলে! সারি সারি টেব্‌ল-চেয়ারের মধ্যে একখানা কাঠের চেয়ার, না ঐ রকমের কিছু!

হেসে বললুম : এ কথা তুমি এখনও মনে রেখেছ!

মনে রাখবার মতোই কথা যে! দোস্ত্‌!

তার পরেই বিষণ্ণ মুখে বলল : বুঝলে দোস্ত্‌, এ বড় দুঃখের কথা। এই ভাবেই সমাজে আমাদের বিচার হয়। বিদ্যে বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নয়। বিচার হয় অর্থ আর প্রতিপত্তি দিয়ে। গাধাকেও আমাদের বাবা বলতে হয়।

চাওলার কথায় স্বাতি হেসে উঠল। আর আমি বললুম : তাতে আপত্তি কী আছে!

চাওলা বলল : আপত্তি ঐ গাধারা যখন তোমাকে কেরানী বলে

নাক সেঁটকায়! ঐ গাধাদের কাজকর্ম দেখে নাক সেঁটকাবার যোগ্যতা কি তোমার নেই!

বলে সে আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম: আমাদের সে সুযোগ কোথায়!

এইভাবে সমাজকে এগোতে দিলে সুযোগ কোন দিনই আসবে না। যোগ্যতার সমাদর না থাকলে কি সমাজের মঙ্গল আছে!

এইবারে আমি হেসে বললুম: বেশ দার্শনিকের মতো কথা বলছ দেখছি!

চাওলা গম্ভীর হয়ে বলল: কিন্তু আসল কথাটি ভুললে চলবে না। ভুবার বস্তার সঙ্গে আলাপ করে তোমার কেমন লেগেছিল, সেই কথা বল।

বলে মিত্রার দিকে তাকাল।

মিত্রা বলল: তোমাদের মতো বেহিসেবী মোটেই নয়। পাওনা-গণ্ডার কথা খুব ভাল বোঝে। বাবা কোন উইল করেছে কিনা, মায়ের গয়নাগাঁটি কে পাবে, কলকাতায় ঘরবাড়ি আছে কিনা—এই সব নিয়েই আলোচনা হয়েছিল প্রথম দিনে।

তার পর?

বলে চাওলা সকৌতুকে তাকাল তার মুখের দিকে।

মিত্রা বলল: পরের দিনই আমি আমার সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে দিলাম—চাকরি করব, বাপের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখব না। আমাকে দেখে যে বিয়ে করতে চায়, তার কথা আমি ভেবে দেখব।

চাওলা বলে উঠল: দুনিয়ায় বোকা তো একটিই ছিল, লাফিয়ে গিয়ে বলল, ভুরার বস্তা তো ফেঁসে গেল, এবারে আর আপত্তি কী?

চেয়ার ছেড়ে চাওলা লাফিয়ে উঠল, মিত্রার পায়ের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটো কাছাকাছি এনে বলল: এমনি করে গরুড়ের মতো হাত জোড় করে বললাম, দেবি, এবারে কি তোমার দয়া হবে না?

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল, আর মিত্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল চাওলার দিকে। চাওলা আবার তার চেয়ারে ফিরে এসে বলল : দেবী বলল, বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বললাম, তাই তো আমি চাই। দেবী বলল, খাওয়াতে পারবে? বললাম, এখন তো ছবেলা খাচ্ছি, তখন একবেলা নিশ্চয়ই পারব। দেবী বলল, আর এক বেলার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে, এই তো! বললাম, তাহলে তো খুবই ভাল হয়। দেবী প্রসন্ন হয়ে বলল, ঠিক আছে।

তার পরে মুর্গির একটা পায়ে কটাস করে কামড় দিয়ে বলল : দেবীর কৃপায় এখন চারবেলা খাচ্ছি, পরিবারও বেড়েছে।

আমি বললাম : বন্ধুবান্ধবদেরও জোর জবরদস্তি করে খাওয়াচ্ছ!

চাওলা বলল : এ আমাদের পাঞ্জাবী নিয়ম দোস্ত্, এ না করলে সমাজে আমরা পতিত হয়ে যাব।

স্বাতি হঠাৎ রাণার প্রসঙ্গ তুলল। মিত্রার দিকে চেয়ে বলল : রাণাবাবুকে অনেকদিন দেখি নি।

উত্তরটা চাওলা দিল, বলল : দেখবে কী করে! বিয়ের কিছু-দিন পরেই তো সে বদলি নিয়ে দিল্লীর বাইরে চলে গেছে!

কেন?

নানারকমের কেলেঙ্কারী হয়েছিল এই বিয়ে নিয়ে।

কেলেঙ্কারী!

তাকে কেলেঙ্কারীই বলে। তাদের অফিসেরই স্টেনোগ্রাফারকে বিয়ে করেছিল তো! এই নিয়েই নানা কথা। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন। কিন্তু বেচারা রাণার পক্ষে সে অফিসে কাজ করা আর সম্ভব হয় নি।

পরম বিস্ময়ে স্বাতি মিত্রার মুখের দিকে তাকাল। মিত্রা বলল : দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করেও বাবা রেহাই পান নি, ছুটি নিয়ে ঋষিকেশে চলে গেছেন। একটা আশ্রমে আছেন তিনি।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিত্রা।

গতবারেই মিত্রা আমাকে বলেছিল ঃ বাবাকে আমরা অনেক দুঃখ দিলাম।

এই মন্তব্যের পিছনে মিত্রারও দুঃখ ছিল অনেক। তারা নিশ্চয়ই তার বাবাকে দুঃখ দিতে চায় নি। তাদের মা ছিল না। এই দুটি ছেলে মেয়েই ছিল মিস্টার ব্যানার্জির সব। দুজনেই তাঁকে দুঃখ দিয়েছে। সেই বেদনা বোধহয় তিনি কোন দিনই ভুলতে পারবেন না।

আমাদের আহার শেষ হয়ে এসেছিল। চাওলা আমাকে চুপি-চুপি বলল ঃ দুটো ঠিকানা আমি তোমাকে দেব, যদি ভাল লাগে তো দেখে এসো তাদেব।

আমি কোন প্রশ্ন না করে তার মুখের দিকে তাকালুম।

চাওলা বলল ঃ একটি রাণার ঠিকানা, আর একটি—

চাওলা বলতে পারছিল না। তাই দেখে মিত্রা বলল ঃ আর একটি ওর হারিয়ে যাওয়া দিদির।

আমি চমকে উঠে বললুম ঃ খবর পেয়েছ তার ?

চাওলা গভীর স্বরে বলল ঃ গান্ধীধামের আদিপুরে তারা বাস করছে।

স্বাতি বলল ঃ আমরা তো ওদিকে যাব, নিশ্চয়ই দেখা করে আসব।

চাওলা কোন উত্তর দিল না। তার দু চোখ এখন ছল ছল করছে।

৮

দিল্লী জংশন থেকে রাত নটা দশ মিনিটে ছাড়ল একানব্বুই নম্বর বিকানের মেল। সময় মতো চললে এই ট্রেন সকাল আটটা পঞ্চান্ন মিনিটে বিকানের পৌঁছবে। বালুরাম অনেক আগেভাগে স্টেশনে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিজেদের জায়গাও দেখে রেখেছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে প্রবল উৎসাহে টেনে নিয়ে গেল। সব গুছিয়ে দেবার পরে জিজ্ঞাসা করল: খেয়েদেয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল: হ্যাঁ।

তার পরেই প্রশ্ন করল: আপনি ?

বালুরাম একটু লজ্জিত ভাবে বলল: আমরা অন্ধকার হবার আগেই খেয়ে নিই।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: জৈনরা এই নিয়ম মানেন বলে শুনেছি।

বালুরাম বলল: আমরা তো জৈন। অপ্রয়োজনীয় বোধে জৈন শব্দটা আমি নামের পেছন থেকে বাদ দিয়েছি।

অপ্রয়োজনীয় কেন ?

আমাদের পদবীটা ধর্মের পরিচয় জ্ঞাপক। ওটা প্রচার করার কোন সার্থকতা দেখি না।

তার পরেই এই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে বলল: ট্রেন ছাড়তে তো এখনও কিছু দেরি আছে, আপনারা কি শুয়ে পড়বেন ভাবছেন ?

স্বাতি বলল: প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ছুটোছুটি দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। ট্রেন ছাড়বার পরেও যাত্রীরা ছুটতে ছুটতে আসছে দেখলে আমার ভারি মজা লাগে।

আমি বললুম : সে দৃশ্য দেখতে হলে হাওড়া বা শেয়ালদয় লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের দেখতে হয়।

স্বাতি বলল : তাতে কোন মজা নেই। এক ট্রেন ফেল করে তারা আর এক ট্রেনে যাবে। কিন্তু এখানে এই গাড়ি ফেল করলে বাড়ি ফিরে যেতে হবে ; রিজার্ভেশন নষ্ট হবে, ভাড়ার টাকা নষ্ট হবে -এসব জেনেও লোকে দেরি করে কেন আসে, তা বুঝি না।

বালুরাম বলল : সময় সম্বন্ধে সবাই সমান সচেতন নয়।

স্বাতি বলল : যারা বেশি সচেতন, তারা আবার ট্রেনে যাতা-য়াতের সময়টাকেও অপচয় হচ্ছে মনে করে। কিংবা বেশি আগে স্টেশনে আসাও পছন্দ করে না।

বালুরাম বলল : তাদেব জন্য উড়ো জাহাজ আছে, কিংবা মোটরের পথ।

মোটরে কি সময় কম লাগে ?

বালুবাম বলল : দূরত্বটা জানি। কিন্তু মোটবে কখনও যাই নি বলে সময় ঠিক কত লাগে বলতে পারব না।

তার পরেই বলল : মোটরে যাবার দুটো ভাল পথ আছে। যে পথটা পিলানি ঝুনঝুনু চুম্ ও রতনগড় হয়ে যায় সেটাই সংক্ষেপ, দুশো আশি মাইল। আর যে পথ রোতক হিসার আদুলপুর সর্দার শহর ও রতনগড় হয়ে যায়, সেটা মাইল চল্লিশেক বেশি। দিল্লী থেকে জয়সলমের পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়। কিন্তু বিকানের বা জয়সলমেরে হাওয়াই আড্ডা নেই। উড়ো জাহাজে শুধু যোধপুরেই যাওয়া যায়। যোধপুর থেকে বিকানের দেড়শো মাইল।

এই অঞ্চলের সড়ক পথ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। তাই বললুম : সড়ক পথে যাতায়াত নিশ্চয়ই খুব আরামপ্রদ।

বালুরাম বলল : সেটা খুবই স্বাভাবিক। দেশরক্ষার প্রয়োজনে রাজস্থানের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে এখন ন্যাশনাল হাইওয়ে।

পাকিস্তানের সীমান্তে রাজস্থানের জেলাগুলির নাম আপনি নিশ্চয়ই জানেন !

স্বাতি বলল : আমরা কিছুই জানি না ভেবে আপনি বলুন।

বালুরাম বলল : উত্তরে গঙ্গানগর ও বিকানের, পশ্চিমে জয়সলমের ও বার্মের, এবং দক্ষিণে গুজরাত ও কচ্ছ। যোধপুরের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন সীমান্ত নেই, এই জন্যে যোধপুরের উপর দিয়ে কোন ন্যাশনাল হাইওয়ে যায় নি। অমৃতসর থেকে কচ্ছ পর্যন্ত আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে চলে যেতে পারবেন। প্রথমেই গঙ্গানগরে এসে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সেখানকার ক্যানাল কলোনি ও চারিদিকে বাজরার চাষ দেখে বিশ্বাস হবে না যে রাজস্থানে এসে পৌঁছে গেছেন। ক্যানালের জলে এই অঞ্চলের চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে।

গঙ্গানগর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবার আগেই বালুরাম বলল : গঙ্গানগর থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে আপনারা বিকানেরে চলে আসবেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : দূরত্ব কতটা ?

বালুরাম মনে মনে হিসেব করে বলল : দেড়শো মাইলের কমই হবে। তিন চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন। তার পর বিকানের থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে আপনারা জয়পুর যেতে পারবেন, জয়সেল-মেরেও যেতে পারবেন। যোধপুরে যাবার রাজপথও ভাল।

স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল : দূরত্ব জানতে ইচ্ছে করছে তো ? জানি। আমার কাছে এ একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার ! কখনও ট্রেনে কখনও বাসে যাতায়াত করি বলে দূরত্ব মোটামুটি জানা আছে। জয়পুর থেকে বিকানের দুশো তিরিশ মাইলের কিছু বেশি। আর যোধপুর থেকে নাগৌর হয়ে দেড়শো মাইল। যোধপুর থেকে সড়ক পথে উদয়পুরেও যাওয়া যায় পালি ও সদ্রি হয়ে। সোয়া দুশো মাইলের মতো পথ।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: এই সব পথঘাট চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না কেন বল তো!

বললুম: সামনে একখানা মানচিত্র খোলা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হত না।

স্বাতির বাঙলা কথার উত্তর আমি বাঙলায় দিয়েছিলুম। বালুরাম একটা প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে। হেসে বললুম: এদিকটা আমাদের ভাল জানা নেই তো, তাই আপনার বর্ণনা বুঝতে আমাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

ভদ্রলোক বিচলিত না হয়ে বলল: বুঝেছি।

তার পরেই প্রশ্ন করল: আপনারা রাজস্থানের কোন্ কোন্ শহরে গেছেন?

স্বাতি বলল: জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর গড়—

বালুরাম তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল: উদয়পুর আর আবু। এই তো!

হ্যাঁ।

বালুরাম বলল: এ হল টুরিস্টের রাজস্থান। চারণদের রাজস্থান, সরকারী রাজস্থান। দীর্ঘ দিনের উপেক্ষায় যে রাজস্থান ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল, এ সে রাজস্থান নয়। এবারে আপনারা উপেক্ষিত রাজস্থান দেখতে যাচ্ছেন।

একটু থেমে বলল: এই দিল্লী জংশন স্টেশনটাকে ভাল করে চেনেন তো?

স্বাতি বলল: না।

এই স্টেশনে ব্রড গেজ ও মিটার গেজ দুইই আছে, আর রেল-লাইন গেছে নানা দিকে। পূর্বে মথুরা আগ্রা, আবার আলিগড় কানপুরের দিকে গেছে, মীরাট সাহারাণপুরের দিকেও গেছে। উত্তরে চণ্ডীগড় কালকা, অমৃতসর আর ভাটিণ্ডা-ফিরোজপুরের দিকেও গেছে। এ সব ব্রড গেজ লাইন। আমরা মিটার গেজ লাইনে

যাচ্ছি। এ লাইনে রেওয়ারি জংশন পর্যন্ত একটিই পথ। ওয়েস্টার্ন রেলের ট্রেন রেওয়ারি থেকে দক্ষিণ জয়পুরের ওপর দিয়ে আমেদাবাদে যায়। আর আমরা নর্দার্ন রেলেব ট্রেনে পশ্চিমে লোহারু সাতুলপুর রতনগড় হয়ে বিকানের যাব। রেওয়ারি থেকেও মিটার গেজ লাইনে উত্তরে ভাটিণ্ডা যাওয়া যায়। আবার বিকানেব থেকেও সরাসরি ভাটিণ্ডা যাবার মিটার গেজ লাইন আছে।

স্বাতির দিকে চেয়ে আমি বললুম: এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

স্বাতি বলল: হ্যাঁ।

ইংরেজীতে কথা, তাই বুঝতে পেরে বালুরাম খুশী হয়ে বলল: দিল্লী থেকে ন্যাশনাল হাইওয়েও গেছে পাঁচ দিকে—আগ্রা, জয়পুর, মোরাদাবাদ, চণ্ডীগড় ও অমৃতসরের দিকে। শেষের পথটি গঙ্গা-নগরের উপর দিয়ে রাজস্থানের সীমান্তের নিকট দিয়ে জয়সলমের বার্মের হয়ে বম্বে এসেছে। চণ্ডীগড়ের দিকের পথটি আম্বালা থেকে অমৃতসরে গেছে। এ দেশে এখন প্রতিদিন নতুন নতুন পথ তৈরি হচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে যাত্রীদের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যস্ততা দেখা দিল। বাহিরেও এই ব্যস্ততা লক্ষ্য করে বালুরাম তার ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল: এইবারে ট্রেন ছাড়বে।

স্বাতি বলল: ছাড়লেই বাঁচি।

কেন?

এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

বালুরাম খুশী হয়ে বলল: আমারও তাই। আমিও ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসি।

তার পরেই একটু বিষণ্ণ মুখে বলল: কিন্তু সব সময়ে সুযোগ পাই নে। মনের বাসনা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়।

বাহিরে বাঁশির শব্দ শুনতে পেলুম। ইঞ্জিনের সিটির কিছু পরেই ট্রেন দুলে উঠল। তার পরে যাত্রা শুরু হল। মরুভারত

যাত্রা। বালুরামের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে এখন আর তার দৃষ্টিতে কোন বিষণ্ণতা নেই, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার দু চোখের দৃষ্টি।

বালুরাম হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, বলল : দেখেছেন কী ভুল হয়েছে!

আমি চমকে উঠে বললুম : কিছু ফেলে এসেছেন বুঝি?

না না, তা নয়। আপনার জন্যে কিছু টুরিস্ট লিটারেচার সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু তা আপনার কাছে পৌঁছে দেবার সময়ই পাই নি।

হেসে বললুম : তাতে কোন ক্ষতি হয় নি তো।

ক্ষতি হয় নি মানে! দিল্লীতেই আপনি সব পড়ে দেখতে পারতেন।

বলতে বলতেই সে তার একটা বড় ব্যাগের গায়ের একটা পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র টেনে বার করল। তার পরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল : ভাল কিছু পেলাম না, বুঝলেন! রাজস্থান সরকার কোন বই-টই বোধহয় এখনও বার করে নি। কয়েকটা পুরনো প্যাম্ফ্লেট ছিল আমার কাছে—কয়েকটা শহরের সম্বন্ধে সামান্য কিছু কথা আছে এতে।

সেই প্যাম্ফ্লেটগুলি হাতে নিয়ে দেখলুম যে কয়েকখানা কাগজ দু-তিন ভাঁজ করে দিয়েছে। উপরে শহরের নাম লেখা, আর ভিতরে সামান্য কিছু কথা। ছাপা ও কাগজ দুইই খারাপ। এরই সঙ্গে পাব্লিকেশন্স ডিভিশনের কয়েকটি ফোল্ডার আছে। তার কাগজ ও ছাপা ভাল হলেও বিষয়বস্তু মোটেই আকর্ষণীয় নয়। কোন দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা বা ছবি নেই। স্পষ্টতই মনে হল যে এগুলি বিদেশী টুরিস্টদের জন্যে ছাপা।

এর পরে বালুরাম একখানা চটি বই আমার দিকে এগিয়ে দিল। এটিও সরকারী বই, অনেকদিন আগে ছাপা। কয়েকটি প্রধান শহরের কিছু বর্ণনা আছে, আর কিছু ছবি। কিন্তু বালুরাম বলল :

মরুভূমির শহরগুলির সম্বন্ধে সামান্যই লিখেছে। এই বইএর বর্ণনা পড়ে আপনার মনেই হবে না যে আপনারা মরুভূমিতে এসেছেন।

এই বইখানিও আমি উল্টেপাল্টে দেখে নিলুম। বালুরাম আমাকে তা দেখবার সুযোগ দিয়ে স্বাতিকে বলল: শহরে ঘুরেও তো আপনারা বুঝতে পারবেন না যে মরুভূমির মাঝে এই সব শহর গড়ে উঠেছে! এ কথা বুঝতে হলে শহরে পৌঁছবার আগে থেকেই আপনাদের চোখ খুলে থাকতে হবে।

স্বাতি বলল: তা তো থাকতেই হবে।

বালুরাম বলল: চুরু জংশন থেকে ট্রেন ছাড়বে ভোর সাড়ে চারটেয়। তখন চারিদিকে অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পাবেন না। রতনগড়ে পৌঁছবে পাঁচটা আঠারো মিনিটে, আর ছাড়বে পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে। ঘুম ভেঙে গেলে দুধারের দৃশ্য দেখবেন।

দিল্লী সরাই রোহিলা, প্যাটেলনগর, দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্ট ও পালম আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। যাত্রীরা অনেকেই এখন শুয়ে পড়েছেন। আমরাও শোবার উদ্যোগ করলুম। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটেছে মরুভারতের দিকে।

৯

সকালবেলায় সময়মতোই ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ির ভিতরে বাতি জ্বলছিল বলে সময় বোঝা যাচ্ছিল না। হাতের ঘড়িতে সময় দেখলুম, তার পরে উঠে বসে তাকালুম বাহিরের দিকে।

আকাশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। কিন্তু এই আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই তখন নজরে পড়ছে না।

বালুরাম একটা উপরের বাঙ্কে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু স্বাতি তার বিছানায় নেই। বুঝতে পারলুম যে যাত্রীরা উঠে পড়বার আগেই সে মুখ হাত ধুয়ে আসতে গেছে। বাথরুমটা এখন পরিচ্ছন্ন থাকে বলেই সে একটু তাড়াহুড়ো করে। আমি তৎপর না হলে হয় তো আমাকেও তাড়া দেবে। নোংরামি সে পছন্দ করে না, নোংরামি থেকে দূরে থাকবার জন্যে তার সারাক্ষণের চেষ্টা আমি দেখতে পাই।

এখন আমরা রাজস্থানের বুকের উপর দিয়ে চলেছি। রাজস্থানের কথায় অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেবারে দিল্লী থেকে ফেরার আগে স্বাতি বলেছিল, পূজোয় তারা সৌরাষ্ট্রে যাবে রম্যাণি বীক্ষ্য করতে।

কথাটা অশুদ্ধ হলেও তার পরিহাস আমার ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম: তোমার রম্যাণি বীক্ষ্যর কি শেষ নেই ?

স্বাতি হেসেছিল আমার প্রশ্ন শুনে। বলেছিল: শেষ! ভারত বর্ষের কি শেষ আছে! কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি এলে রাজস্থানের উপর দিয়ে এসো না, এসো ডিঙিয়ে।

তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, এমন

অনুরোধ সে কেন করছে! কিন্তু কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় নি। সে নিজেই বলেছিল: রাজস্থান দেখলেই তো আবার ভ্রমণ কাহিনী লিখবে। ও দেশের ব্যাপারে আমার অরুচি ধরেছে।

কিন্তু অরুচি কিসের জন্যে তা বলে নি। রাজস্থানের গল্প অনেক পড়েছে। কিংবা কালো বাজারের কথা হয়তো মনে পড়েছে। তার আসল অরুচি রাজস্থানের ভ্রমণ কাহিনীর উপরে, না মানুষের জন্যে, তা বুঝতে পারি নি। পরে মনে হয়েছিল যে সত্যিই আমরা রাজস্থানের অনেক গল্প পড়েছি শৈশবে। কত বীর, কত বীরাঙ্গনার কাহিনী। পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ হত, বুক ফুলে উঠত গর্বে। রাজপুতকে সেদিন নিজেদের প্রতিবেশী মনে হত। রাজস্থানকে বাঙলারই অন্তর্গত ভাবতুম। কিন্তু কালো বাজার দেখবার পরে এই ধারণা আমাদের পাল্টে গেল। রাতারাতি সব গল্প ভুলে গেলুম। রাজপুত বলে যে একটা জাত ছিল রাজস্থানে, সে কথা আর মনে রইল না। তার বদলে একটা নতুন জাত চোখের সামনে সারাক্ষণ জেগে রইল। তাদের কারও হাতে ঢাল তরোয়াল নেই, তার বদলে ওজনের দাঁড়ি পাল্লা আর গজের মাপকাঠি নিয়ে তারা কলকাতার বড়বাজারে জাঁকিয়ে বসেছে। লোকে বলে, এরাও রাজস্থানে ছিল, রাজস্থান থেকেই এরা এসেছে। আমি বলি, আমাদের গল্পের রাজপুত আজ কোথায় গেল!

স্বাতি ফিরে এসে আমার পাশে বসল, বলল: কী ভাবছ বল তো!

আমি চমকে উঠে বললুম: কিছু ভাবছি বুঝি!

বাইরের দৃশ্যের দিকে তো তোমার দৃষ্টি নেই?

বললুম: তোমার একটা পুরনো কথা মনে পড়েছে।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে তাকাল। তাই দেখে আমি বললুম: এক সময়ে রাজস্থানের ভ্রমণ কাহিনীর ওপরে তোমার অরুচি ছিল।

স্বাতি হেসে বলল : চিঠি লিখে তোমাকেও তো জানিয়েছিলাম যে এবারে তুমি সঙ্গে থাকবে না বলে আরও ভাল লাগছে।

হ্যাঁ, তার কারণও জানিয়েছিলে—চোখ জুড়িয়ে প্রাণ ভরে সব দেখতে পাবে, তথ্য আর তত্ত্বের চাপে খাবি খেতে হবে না।

স্বাতি সহাস্যে বলল : তার পরে ?

তার পরে জয়পুর থেকে টেলিগ্রাম করে আমাকে ডেকে আনলে।

আর আমি তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম স্টেশনে। তাই তো ?

বললুম : কিন্তু সে কথা সেদিন স্বীকার কর নি। বলেছিলে, স্টেশনে বেড়াতে এসেছিলে।

স্বাতি বলল : এসব কি নতুন করে ভাববার কথা! অতীতটাকে ভুলে যেতে পারছ না কেন বল তো!

বললুম : আমি অন্য কথা ভাবছি।

কী ?

রাজস্থান দেখতে যার আপত্তি ছিল, সে আবার রাজস্থানের পথে কেন বেরিয়ে পড়ল! রাজস্থান দেখা আর তা নিয়ে লেখার কথা কি শেষ হয়ে যায় নি!

স্বাতি বলল : শেষ হয়েছে কিনা দেখতেই তো যাচ্ছি।

আমি বাহিরের দিকে তাকালুম, হাতের ঘড়িতে সময়টাও দেখলুম একবার। তাই দেখে স্বাতি বলল : কলকাতায় সূর্যোদয় হয়েছে, কিন্তু এখানে এখনও তার দেরি আছে। পশ্চিমে আমরা অনেক দূরে এসে গেছি।

তার পরেই সে আমার মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম বার করে দিল।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। পৃথিবী এখন আর অস্পষ্ট নয়, প্রত্যুষের প্রসন্ন আলোয় এক অজ্ঞাত পৃথিবীকে আমি আবিষ্কার করলুম।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে স্বাতি জানলার ধারে সরে এসে বলল : বোসো।

আমি কোন কথা না বলে তার পাশে বসে পড়লুম।

মনে হল, আমরা বুঝি মরুভূমির বুক চিরে এগিয়ে চলেছি। যে ধারটা দেখতে পাচ্ছি সে ধারে কোন লোকালয় নেই, গাছপালা চাষবাসেরও কোন চিহ্ন নেই। শুধু বালি আর তার মাঝে মাঝে এক এক ফালি ছায়াব মতো। ঐ ছায়া আকাশের নয়। তবে কিসেব ছায়া ?

স্বাতি আস্তে আস্তে বলল : ঐ অন্ধকার ছায়াগুলো কি কোন লতাগুল্মের ?

বললুম : তাই হবে।

স্বাতি বলল : আলো আব একটু স্পষ্ট হলেই বোঝা যাবে।

তার পরে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল যে বালুরাম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। বিকানের পৌঁছতে এখনও দেরি আছে বলে তাকে জাগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

স্বাতি বলল : শহর দেখবার সময়ে বালুরামবাবুকে আমরা সঙ্গে নেব না।

কেন ?

স্বাতি সকৌতুকে বলল : এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

বালুরাম বিকানেরে কেন এসেছে, সে কথা আমার মনে পড়ে গেল। হেসে বললুম : স্টেশনেই তাকে বিদায় দেব।

স্বাতি বলল : তার আগে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা আমাদের জেনে নিতে হবে।

ঠিক এই সময়ে উপর থেকে বালুরামের কণ্ঠস্বর শুনে আমরা দুজনেই চমকে উঠলুম। বালুরাম বলল : আপনারা যদি আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করেন, তাহলে আমার চোখ বুজে শুয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

বলে লাফিয়ে নিচে নেমে এল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : আপনি কি জেগেই ছিলেন নাকি!

বালুরাম সহাস্যে বলল : আপনারা যেমন আমার কথা ভাবছিলেন, আমি তেমনি আপনাদের কথা ভেবেই চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে আপনারা নিতান্তই বেরসিক।

হেসে বললুম : বেরসিক নয়, ভ্রমণ-রসিক। ভ্রমণে বেরিয়ে আমরা ভ্রমণ ছাড়া আর কোন কথা ভাবি না। চিরকালই আমাদের এই অভ্যাস।

স্বাতি প্রথমটায় লজ্জা পেয়েছিল। এইবারে সামলে নিয়ে বলল : আপনি কি ভাবছেন যে এখনও আমাদের লুকিয়ে-চুরিয়ে কথা বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি?

বালুবাম বলল : এ প্রয়োজন কোন দিন ফুরোয় বলে আমার মনে হয় না।

বললুম : আপনার ধারণাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এ ধারণা সত্য হোক, এই প্রার্থনা করি।

স্বাতি বলল : আপনি যে বাঙলা কথা বোঝেন, তা আমাদের জানা ছিল না।

বালুরাম বলল : বুঝি বলব না, কিছু অনুমান করতে পারি। যেমন, অনুমান করেছি যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চান না।

স্বাতি বলে উঠল : সে আপনার জন্যেই। আমরা চাই না যে বন্ধুর কাছে না গিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে সময় নষ্ট করেন।

আর এও অনুমান করেছি যে আমাকে ছুটি দেবার আগে এই শহরের সম্বন্ধে কিছু জেনে নেবেন।

বললুম : একেবারে খাঁটি অনুমান।

তবে এক কাজ করুন। কাল রাতে যে কাগজপত্রগুলো দিয়েছিলাম, তার উপরে একটু চোখ বুলিয়ে নিন। ইচ্ছা করলে বিছানাও জড়িয়ে নিতে পারেন।

বলতে বলতেই বালুরাম নিজের বিছানাটা জড়িয়ে একটা বড় ব্যাগের মধ্যে পুরে নিল। আর তোয়ালে ও মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলে গেল: মিনিট পাঁচেকের জন্য ছুটি নিচ্ছি।

একটি ছোট পুস্তিকায় তিনটি শহরের বিবরণ আছে—বিকানের জয়সলমের ও যোধপুর। সর্বাগ্রে বিকানেরের নাম। সাড়ে চার লাইনে এই শহরের বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে। ১৪৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিকানের একটি মরুভূমি-শহর, একটু উঁচু ভূমিতে অবস্থিত ও সুন্দর প্রাচীর বেষ্টিত। পাঁচটি গেট আছে। ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৩ সাল পর্যন্ত রাজা রায়সিংহ যে চমৎকার দুর্গটি নির্মাণ করেন, শহরে সেইটিই প্রধান। শহরে অনেকগুলি দেখবার মতো পুরনো বাড়ি, হিন্দু ও জৈন মন্দির ও মসজিদ আছে।

এর পরে দর্শনীয় স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণও আছে। পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভাণ্ড্ সাগর মন্দির। এটি পার্শ্বনাথের নামে উৎসর্গ করা ষোড়শ শতাব্দীর জৈন মন্দির। দুর্গ ও রাজ-প্রাসাদও পাঁচ কিলোমিটার দূরে। রাজা রায়সিংহ রাজত্ব করেছিলেন ১৫৭১ থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত। এই দুর্গ নির্মাণ করতে তাঁর পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। দুর্গের চারিদিকে পরিখা আছে, আর ভিতরে আছে লাল ও হলদে বালি পাথরের অনেকগুলি প্রাসাদ ও মন্দির। উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলির নাম অনুপ মহল রঙ মহল আর বিজয় মহল। এর থাম খিলান ও পাথরের জালি দেখবার মতো। চন্দ্র মহল ও ফুল মহলে আয়না। কারুকার্য আর ছবি দেখতে হয়। লালগড় প্রাসাদ ছ কিলোমিটার দূরে, লাল পাথরের সুন্দর প্রাসাদ। মহারাজা গঙ্গাসিংহ এই প্রাসাদ তাঁর পিতা মহারাজা লালসিংহের স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন। এর ভিতরে পুঁথি ও চিত্রের সংগ্রহশালা আছে। এই প্রাসাদেরই একাংশে হোটেল হয়েছে। তার নাম লালগড়

প্যালেস হোটেল। একজনের থাকা খাওয়ার খরচ দৈনিক একশো টাকা।

চিড়িয়াখানা গঙ্গানিবাস পাবলিক পার্কের মধ্যে। জাদুঘরের নাম গঙ্গা গোল্ডেন জুবিলি মিউজিয়ম। ১৯৩৭ সালে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এর উদ্বোধন করেন। মহারাজার নিজস্ব মৃৎশিল্পের সংগ্রহ, মুদ্রা চিত্র ও অস্ত্রশস্ত্র এর মধ্যে রক্ষিত আছে। শুক্রবার ও ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিনা পয়সায় দেখা যায়। শহরে উদ্যান আছে অনেকগুলি—ভবন প্যালেস পার্ক, গঙ্গানিবাস পাবলিক পার্ক, নাথজী পার্ক ও রতনবিহারী মন্দিরের উদ্যান।

এই পর্যন্তই। এর পরে শহরের বাহিরে দূরে যেতে হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে কাছে দেব কুণ্ডের দূরত্ব পাঁচ মাইল। রাজাদের সমাধি-স্থান। অনেকগুলি ছত্রি আছে। তার মধ্যে সুন্দর ও বৃহৎ হল রাজা করণ সিংহের ও মহারাজা অনুপ সিংহের ছত্রি। প্রথমটি সারল্য ও দ্বিতীয়টির বিচিত্র কারুকার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যের একটি চিত্র আছে। মহারাজা সুরত সিংহের ছত্রিটি মকরানার সাদা মার্বল পাথরে নির্মিত। তার ভিতরের ছাদে রাজপুত চিত্রকলার নিদর্শন আছে।

এ ছাড়াও দূরে দূরে দর্শনীয় স্থান আছে। দেশলোক, গজলের প্রাসাদ ও কোলায়ৎজী। কিন্তু সে সবের বিবরণ পড়বার সময় পেলুম না। ব্যস্তসমস্ত ভাবে বালুরাম ফিরে এসে বলল: খুব দেরি হয়েছে কি?

স্বাতি নিঃশব্দে বসে থেকে আমাকে পড়বার সুযোগ দিয়েছিল। এইবারে দাঁড়িয়ে বলল: মোটেই না। দেখছেন না, বিছানা গোটাবারও সময় পাই নি।

এ কথা বলতেই আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাতি বিছানা তোলবার কাজে লেগে গেল।

বালুরাম প্রথমে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করল। ট্রেন তখন একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল।, গোটা কয়েক বাড়ি, দু-একজন মানুষ ও কিছু গাছপালা দেখতে পেলুম। দেখতে দেখতেই সে দৃশ্য শেষ হয়ে গেল। বালুরাম বলল : আর একটা স্টেশন বোধহয় পেরোতে হবে।

বলে নিজের জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেলল। তার পরে আমাদের সামনে আর এক ভদ্রলোকের বেঞ্চির একটা কোনায় বসে বলল : নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানতে পেরেছেন!

বললুম : তা পেরেছি।

বালুরাম বলল : আবার অনেক কথাই ওতে পাবেন না।

কী রকম?

এই ধরুন, বিকানের নামটা কেন হল!

আমি বললুম : বিকা নামে একজন রাঠোর রাজপুত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাধা দিয়ে বালুরাম বলল : ইংরেজীতে শহরের নাম বিকানের, কিন্তু আমাদের ভাষায় শব্দটা বীকানের। মারবাড় বা যোধপুরের মহারাজা যোধা রাওএর পুত্র বীকা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নের শব্দটি তো নগরের অপভ্রংশ নয়। এই নের শব্দটি কেন যুক্ত হল, সে কথা কোনখানে নেই।

স্বাতি বলল : তাই তো! যোধপুরের মতো বিকাপুর হতে পারত!

খুশী হয়ে বালুরাম বলল : আমি শুনেছি যে বীকা তাঁর রাজধানী স্থাপনের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন, তা ছিল নৈর বা নের নামে একজন জিত বা জাঠের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি দখলের সময়ে নেরের অনুরোধে বীকা মেনে নিয়েছিলেন যে রাজধানীর নামের সঙ্গে তার নামও যুক্ত থাকবে। এইজন্যেই নাকি রাজধানীর নাম হয়েছে বীকানের। কিন্তু বিকানেরের ইতিহাসে এ কথা নেই।

বরং একটি কিংবদন্তী আছে। সংক্ষেপে সেই কথা হল যে একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সেই স্থানেই এই নগরের পত্তন হয়।

স্বাতি বলল : বীকা তো যোধপুরেরই রাজা হতে পারত, নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কী দরকার ছিল তাঁর ? কিংবা এই নতুন রাজ্য তো যোধপুরের অন্তর্গত করতে পারত !

বালুরাম বলল : সামান্য একটা ঘটনায় পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। ১৪৮৮ সালের ঘটনা। রামের বংশধর রাঠোর রাজপুত রাও যোধা মারবাড় রাজ্যের রাজধানী মাণ্ডোর থেকে যোধপুরে স্থানান্তরিত করেছিলেন ১৪৫৮ সালে। একদিন বৃদ্ধ রাজা রাজসভায় উপযুক্ত পুত্র বীকাকে অপমান করলেন।

কী অপমান ?

বীকা রাজসভায় এসেছিলেন দেরিতে, তার পরে সভায় বসে তাঁর কাকা কান্ধলজীর কানে কানে কিছু বলছিলেন। তাই দেখে রাজা ব্যঙ্গ করে বললেন, খুড়ো ভাইপোর কী পরামর্শ হচ্ছে ! কোন নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে না তো ! এই ব্যঙ্গের উত্তর দিয়েছিলেন রাজার ভাই কান্ধলজী। তার পরে ভাইপো বীকা বীদা ও আরও বহু অনুচর নিয়ে যোধপুর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। জাঙ্গল প্রদেশের একজন লোক রাজসভায় উপস্থিত ছিল। সে খবর দিল যে তাদের দেশ বালুচদের আক্রমণে এখন দুর্বল, সহজেই তা জয় করা সম্ভব হবে।

স্বাতি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এই গল্প। এইবারে প্রশ্ন করল : জাঙ্গল প্রদেশ কোন্‌টা ?

বালুরাম বলল : জাঙ্গল ও কুরুজাঙ্গল নাম মহাভারতেও আছে। উত্তর রাজস্থান ও তার সীমান্তে এই জাঙ্গল প্রদেশ। পুরাকালে সাল্ব জনপদের অন্তর্গত ছিল। সরস্বতী নদী প্রবাহিত হত এই দেশে। সরস্বতী নদী এখন নেই, কিন্তু তার দুই তীরে অনেক দূর পর্যন্ত বহু টিলার অবশেষ পুরাতত্ত্ব বিভাগ খুঁজে পেয়েছে। সে

যুগের ইতিহাস তো নয়ই, তার পরেরও কোন ইতিহাস এখন পাওয়া যায় না। বিকানেরের ইতিহাসেই পাওয়া যায় যে বীকা এই জাঙ্গলের অনেকগুলি গ্রাম অধিকার করে রাজা হয়ে বসেন।

আমরা আর একটি স্টেশন পেরিয়ে গেলুম। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মতো শ্যামল একটি ভূখণ্ড। সেই দিকে চেয়ে বালুরাম বলল: এটিই এ লাইনের শেষ স্টেশন। এইবারে আমরা বিকানের পৌঁছব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: অনেক দিন পর আমরা নতুন দেশ দেখতে বেরিয়েছি।

বালুবাম বলল: এ দেশের লোকের মতে বিকানের দেখতে হয় শ্রাবণ মাসে।

কেন?

বিকানের সেই সময়েই সব চেয়ে সুন্দব।

গতবারে রাজস্থান ভ্রমণের সময়ে একটা শ্লোক শুনেছিলুম বলে আমার মনে পড়ে গেল। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ জায়গাটা রাজস্থানের ভাল, তাই নিয়ে লেখা শ্লোক। বালুরাম আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: জানেন নাকি?

বললুম: মনে পড়ছে না।

বালুরাম সেই শ্লোকটি আমাদের শোনাল।

সিয়ালো তো খাটু ভলো, উনানে অজমের।
জোধানোঁ নিতরো ভলো, সাবন বীকানের॥

আমি বললুম: হ্যাঁ মনে পড়েছে।

আর স্বাতি বলল: এর মানে কী?

বালুরাম বলল: শীতের সময় খাটু ভাল, খাটু হল নাগৌর জেলা। আর গরম ভালো আজমীরে। যোধপুর সব ঋতুতে ভাল, আর বিকানের ভাল শ্রাবণ মাসে।

আমার মনে হল যে আমি যে পাঠ শুনেছিলুম, তা কিছু অন্য

রকম। সেই সন্দেহ প্রকাশ করতেই বালুরাম বলল: ঠিক বলেছেন, এর আরও একটা পাঠ আছে।

বলে সেই পাঠ আমাদের শোনাল।—

সিয়ালো সোরঠ ভলো, উনালো গুজরাত।
বরসা মে বাগড় ভলো, কচ্ছড়ো বাহর মাস॥

এ তো একেবারেই অন্য রকম দেখছি। শীতে সৌরাষ্ট্র, গরমে গুজরাত, বর্ষায় বাগড় আর বারো মাস ভাল কচ্ছ। কিন্তু বাগড় কোন্ দেশ?

বালুরাম হেসে বলল: বিকানেরের বর্ষা কিছুতেই বাদ পড়বে না।

ট্রেনের গতি মন্থর হতেই স্বাতি বলল: বিকানের স্টেশনে নেমে আমরা কী করব বলুন।

বালুরাম বলল: ওয়েটিং রূমে স্নান করে ক্লোকরূমে মালপত্র জমা দিয়ে দেবেন। এই সময়ের মধ্যে আমি যোধপুরের টিকিট কেটে এনে দেব। রাতের গাড়িতে যাত্রা, তাই বার্থ রিজার্ভেশনের দরকার আছে।

তার পর?

আপনাদের একটা টাঙ্গায় তুলে দেব শহর দেখবার জন্যে।

স্বাতি বলল: আর আপনাকে আমরা স্টেশনেই ছুটি দেব।

বালুরাম বলল: খানিকক্ষণের জন্যে। দুপুরে আবার দেখা হবে ওয়েটিং রূমে।

১০

বিকানের স্টেশনেই আমরা জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লুম। রাতের গাড়িতে যোধপুরে যাবার ব্যবস্থা করে বালুরাম বলে গিয়েছিল : জুনাগড় আর লালগড় এ বেলায় দেখে নেবেন। যদি কিছু বাকি থাকে, ও বেলায় আমি দেখিয়ে দেব।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলেছিল : জুনাগড়!

বালুরাম হেসে উত্তর দিয়েছিল : সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় শহর নয়। জুনাগড় মানে পুরনো দুর্গ। বিকানের ফোর্টকে আমরা জুনাগড় বলি। লালগড় প্যালেস তৈরি হবার পরে এর নাম জুনাগড় হয়েছে।

আমি বলেছিলুম : আপনি ভাববেন না, নতুন জায়গা দেখার দুর্ভাবনা আমাদের নেই।

বালুরাম তবু বলেছিল : জুনাগড়ে যাবার পথে রতনবিহারী মন্দির দেখে যেতে পারেন।

স্বাতি বলেছিল : টুরিস্ট অফিসটা কোন্ দিকে ?

বালুরাম বলেছিল : সার্কিট হাউসের গায়ে। লালগড় থেকে ফেরার পথে ও দিকটা হয়ে আসতে পারবেন।

না না, আপনি আর দেরি করবেন না।

বলে বালুরামকে আমি বিদায় দিয়েছিলুম।

স্টেশনের বাহিরেই অনেকগুলো টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। ভাড়া ঠিক করে একখানা টাঙ্গার পিছনে আমরা উঠে বসলুম।

টাঙ্গাওয়ালা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা শহর দেখতে এসেছি। তাই তার ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক মেরে প্রশ্ন করল : দুপুরে খাবেন কোথায় ?

স্বাতি বলল: স্টেশনে তো রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে।

তা আছে। কিন্তু হোটেলেই ভাল খাবার পাবেন। ঠিক যেমনটি চান।

আমি বললুম: তাহলে হোটেলেই খাব।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: তবে যাবার সময়ে অর্ডার দিয়ে যান। তারা রেডি করে রাখবে।

বলতে না বলতে সে আমাদের একটা হোটেলে নিয়ে এল। নিজেই ব্যবস্থা করে দিল ম্যানেজারকে ডেকে। তার পরে আবার টাঙ্গায় বসে বলল: স্টেশনের কাছেই তিনটে হোটেল আছে— ডিলাক্স গ্রীন আর রূপন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ভাড়া কত?

ভাড়া অনেক। শুধু ঘর ভাড়াই মাথা পিছু পাঁচ টাকা। তবে আপনারা দুজন থাকলে আট টাকা নেবে।

সেই সঙ্গেই যোগ করল: সার্কিট হাউসে বোধহয় একজনকেই চোদ্দ টাকা দিতে হয়। কিন্তু সকালের চায়ের জন্যে আর পয়সা নেয় না। চারবেলা খেলে মাথা পিছু পঁচিশ টাকা।

তার পরেই বলল: এত খরচ বলে সাধারণ লোকে ডাক-বাংলোতেই যায়। সেখানে একখানা ঘরের ভাড়া পাঁচ টাকা, আর ছ টাকা দিয়ে দুজনেই থাকতে পারবেন।

স্বাতি বলল: আমরা আজই ফিরে যাব।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: সেই ভাল। বিকানেরে এমন কিছু নেই যে অত খরচ করে রাতে থাকার দরকার।

তার মন্তব্য শুনে স্বাতি হাসল। বোঝা গেল যে যাত্রীদের সঙ্গে গল্প করা এই লোকটির অভ্যাস। বাধা না পেলে সে সারাটা পথ কথা বলবে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্বাতি তাকে সে সুযোগ দিতে চাইল না। বলল: শহরটি খুব পুরনো বলে মনে হচ্ছে না।

মনে হবে।

বলে টাঙ্গাওয়ালা রাস্তার ধারেই টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে বলল: এই যে সামনে যে গেট দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম কোর্ট গেট। এই গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই পুরনো শহর দেখতে পাবেন।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। সে বাঙলায় কথা বলেছিল, আর টাঙ্গাওয়ালা অবলীলাক্রমে তার উত্তর দিল নিজের ভাষায়। আমি বললুম: না, এখন আমরা ওদিকে যাব না। সময় থাকলে ফেরার পথে যাব, কিংবা বিকেল বেলায়।

টাঙ্গাওয়ালা এবারে অন্য পথ ধরল।

আমাদের কাগজপত্রের মধ্যে এই শহরের একটা মানচিত্র ছিল। সেটি আমি এক নজরে দেখে নিয়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পুরনো বিকানের শহরটা ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। রেলপথের এক ধারে পুরনো শহর, নতুন শহর অন্য ধারে। দুই শহরের মাঝখানে কোর্ট গেট। এটি ছাড়াও আরও চারটি গেট আছে চারি ধারে। এও দেখেছিলুম যে পুরনো শহরটি ছোট ছোট পাড়ায় বিভক্ত। বাড়ি চক ও মহল্লা সেই সব পাড়ার নাম। একেবারে দক্ষিণের দিকে শ্রীলক্ষ্মীনাথজীর মন্দির।

টাঙ্গাওয়ালা যাতে কথা বলতে না পারে তার জন্যে স্বাতি নিজেই খানিকক্ষণ কথা বলল। সবই অপ্রয়োজনীয় কথা। কিন্তু এরকম কথা বেশিক্ষণ বলা যায় না বলেই তাকে এক সময় থামতে হল। আর এই সুযোগেই টাঙ্গাওয়ালা বলল: রতনবিহারীজীর মন্দিরে প্রণাম করে জুনাগড়ে যাবেন তো?

আমি বললুম: অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে না তো?

না।

বলেই সে আমাদের মন্দিরের দিকে নিয়ে এল। কিন্তু যেখানে নামিয়ে দিল, তার ধারে কাছে কোন মন্দির দেখতে পেলুম না।

টাঙ্গা থেকে নেমেই স্বাতি বলল : এখানে মন্দির কোথায় ?

এই তো মন্দির !

বলে টাঙ্গাওয়ালা সামনের একটি উদ্যানের ভিতরে দুটি অট্টালিকা দেখিয়ে দিল। সামনেরটি রাজস্থানী শৈলীতে নির্মিত কয়েকতলা উঁচু। দুধারে গম্বুজ, আর মাঝখানে অর্ধচন্দ্রাকার চূড়া দেখতে নহবৎখানার মতো। অনেকগুলি ধাপ বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। এরই পাশের বৃহৎ অট্টালিকাটি ত্রিতল। তার উপরেও গম্বুজ আছে। আগেরটি যদি মন্দির হয় তো এটি নিঃসন্দেহে মন্দিরের ধর্মশালা। স্বাতি বলল : এসো, ভিতরটা তাড়াতাড়ি দেখে আসি।

বলে এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে টাঙ্গাওয়ালা বলল : ভিতরে রতনবিহারী আর রসিক শিরোমণি আছেন।

উদ্যান পেরিয়ে আমরা মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাদের ধারণায় একে মন্দির বলে মনে হবে না। সারা ভারতে আমরা যে রকম মন্দির দেখতে অভ্যস্ত, এর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এ একেবারে অন্য জাতের মন্দির। একজন দর্শনার্থীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এটি বল্লভ সম্প্রদায়ের মন্দির। মহারাজা রতন সিংহের আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের বয়স এখনও দেড় শো বছর হয় নি।

স্বাতি বলল : বেটদ্বারকায় আমরা যে মন্দির দেখেছি, তাও ঠিক মন্দির বলে মনে হয় নি।

বললুম : এ মন্দির সে রকম মনে হচ্ছে না। গম্বুজ আছে, নানা রকমের কারুকার্যও দেখতে পাচ্ছি, আর সবই তো পাথরের।

মন্দিরের ভিতরে যাবার সময় স্বাতি আমাকে ডাকল না। সে জানে, দেবদর্শনের আগ্রহ আমার নেই। তাই সে তাড়াতাড়ি

ভিতরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে নিচে নেমে এল। বলল : চল এইবারে।

উদ্যানের বাহিবে এসে আমরা টাঙ্গায় বসলুম। বললুম : এবারে সোজা জুনাগড়।

স্বাতি বলল : জুনাগড় বললে সৌরাষ্ট্রের জুনাগড়ের কথা মনে পড়ে।

বললুম : জুনা শব্দটি বোধহয় সংস্কৃত জীর্ণ শব্দ থেকে এসেছে।

কেন ?

এই শব্দটির ব্যবহাব নানা ভাষায় আছে। ইন্দোরেও জুনাগড় আছে। আরও হয়তো অনেক জায়গায় আছে, যা আমরা জানি না। কাজেই মনে হয় যে সংস্কৃত বা ঐ রকমেব কোন ভাষা থেকে এই শব্দটির জন্ম। জুনাগড়েব দুর্গটি সত্যিই জীর্ণ। কিন্তু এখানে বা ইন্দোরে এই শব্দটি পুরাতন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাজা মহারাজারা যখন নতুন প্রাসাদ তৈরি করে পুরনো প্রাসাদ পরিত্যাগ করে যান, তখনই পুরাতন প্রাসাদের নাম হয় জুনামহল বা জুনাগড়।

স্বাতি তার ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল : জুনাগড়ের ভিতরে কী দেখবার আছে দেখে নাও।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এ সব সঙ্গে এনেছিলে বুঝি ?

তা না হলে দেখবে কী!

পথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বিকানেরের কথা পড়ে নিলুম। ষষ্ঠ রাজা রায় সিংহের রাজত্ব কাল ছিল ১৫৭১ থেকে ১৬১১ সাল। ১৫৮৮ সালে তিনি এই বিশাল দুর্গটির নির্মাণ শুরু করেন। উঁচু প্রাচীর দিয়ে দুর্ভেদ্য করে গড়তে তাঁর সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। দু হাজার দেড় শো হাত এই দুর্গের পরিধি। তার চারিধার ঘিরে কুড়ি হাত প্রশস্ত পরিখা। ভিতরে অনেকগুলি

মহল। ফুল মহলের প্রবেশপথে উৎকীর্ণ অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি; অনুপ মহলে ছিল দেওয়ান-ই-খাস, তার পাথরের দেওয়াল লাল ও সোনালি রঙে চিত্রিত; গজ মন্দিরে শিস মহল এবং ছাতার মহলের কারুকার্যমণ্ডিত ছাদের তলায় একটি রাসলীলার চমৎকার ফ্রেস্কো। এ ছাড়াও আছে রঙ মহল, বিজয় মহল, চন্দ্র মহল ও গঙ্গানিবাস। একসঙ্গে এই সমস্ত মহল নির্মিত হয় নি। মনে হয়, এক-একজন রাজা এক-একটি মহল নির্মাণ করে পছন্দ মতো নাম দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি মহলেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

জুনাগড়ে পৌঁছতে আমাদেব বেশিক্ষণ সময় লাগল না। লাল প্রাকাবে ঘেরা এই বিশাল দুর্গটির গেটের সামনে পৌঁছে টাঙ্গা-ওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিল। বলল: আপনারা দেখুন, আমি সামনে ঐ গাছের ছায়ায় দাঁড়াচ্ছি।

সর্বসাধারণের এই দুর্গে প্রবেশের অনুমতি আছে কিনা, স্বাতি সে কথা জানতে চাইল না। কাউকে ভিতরে যাতায়াত করতেও দেখলুম না। স্টেশন থেকে বেরোবার সময় স্বাতি তার ক্যামেরা সঙ্গে আনতে ভোলে নি। পিছনে খানিকটা সরে এসে বলল: সামনে একজন লোক পেলে ভাল হত।

বললুম: আমি দাঁড়াব?

স্বাতি হেসে বলল: তুমি আড়ালেই থাকো।

কেন?

লেখককে আমরা কল্পনার চোখেই দেখতে চাই।

আমি হেসে বললুম: তাহলে তুমি দাঁড়াও।

স্বাতি বলল: কোনও শিল্পী এ রকম কথা বলবে না।

কেন?

আমি তো বিকানেরের মেয়ে নই! কৃত্রিমতায় শিল্প নষ্ট হয়।

স্বাতি নানা জায়গায় সরে সরে শেষ পর্যন্ত একটা পছন্দ মতো জায়গা থেকে বিকানের ফোর্টের ছবি তুলে নিল।

আমি বললুম: এবারে কি ভিতরে যাবে?

স্বাতি বেলার দিকে চেয়ে বলল: না। উদয়পুরে রাজপ্রাসাদ দেখেছি, দুর্গ দেখেছি অম্বর আর চিতোরে। বিকানেরে আমরা মরুভূমি দেখব।

কিন্তু মরুভূমি কোথায়?

স্বাতি টাঙ্গার কাছে ফিরে এল। উঠে বসে বলল: এইবার লালগড়ে চল।

আমি তার পাশে উঠে বসতেই টাঙ্গাওয়ালা লালগড় প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হল।

এই প্রাসাদটির পরিচয় আমি গাইড বইএ দেখে নিলুম। মহারাজা গঙ্গা সিংহ তাঁর পিতা মহারাজা লাল সিংহের নামে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন নিজের জন্যে। ১৯০০ সালে এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এর একাংশে এখন সরকারী হোটেল।

টাঙ্গাওয়ালা তার মুখ ফিরিয়ে একবার আমাদের দেখল। তার পরে প্রশ্ন করল: মহারাজা গঙ্গা সিংজীর নাম কিতাবে আছে?

আমি তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই বলল: তিনিই এ রাজ্যের সব চেয়ে মস্তুর রাজা। ইংরেজের কাছে ভারতের কোন রাজা তাঁর মতো ইজ্জত পান নি। তাঁর গঙ্গা রিসালার নাম শুনেছেন তো!

আমি বললুম: না।

স্বাতি বলল: তুমি কি এর কাছে শুনে কিছু লিখবে?

বললুম: সবার কাছে না শুনলে জানব কী করে!

তার পরেই টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম: রিসালা মানে কী?

আমার এই প্রশ্ন শুনে টাঙ্গাওয়ালা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বলল: উটের বাহিনী। মরুভূমিতে লড়াইয়ের জন্যে মহারাজার অনেক উট ছিল। সেই উটের বাহিনী নিয়ে তিনি নানা দেশে লড়াই করেছেন। ইংরেজ তাঁকে এরই জন্যে খুব খাতির করত। কোনও

মরুভূমির দেশে যুদ্ধ বাধলেই ইংরেজ তাঁকে খোশামোদ করত। মহারাজা নিজেই সেই উটের বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ে যেতেন বলে দেশে বিদেশে তাঁর খুব নাম ছিল।

স্বাতি বলল : কই শহরে তো একটাও উট দেখতে পাচ্ছি না!

টাঙ্গাওয়ালা বলল : মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। উটের গাড়িও আছে।

তাই নাকি?

বলে স্বাতি আগ্রহ প্রকাশ করল।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : উটের গাড়ি বুঝি আপনারা দেখেন নি!

না।

শহরের বাইরে গেলে —

না না, শহরের বাইরে এখন যেতে হবে না। তুমি লালগড় প্যালেসের দিকেই চল।

টাঙ্গাওয়ালা কিছু মনোক্ষুণ্ন হয়ে বলল : উটের গাড়িও দেখবার মতো।

সেবারে চিতোর গড় থেকে উদয়পুরে যাবার পথে উটের গাড়ির কথা আমি এক মারবাড়ী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলুম। তাঁর নামটা এখন মনে পড়ছে না। তিনি বলেছিলেন যে উটের গাড়ি কতকটা এক্কা গাড়ির মতোই, তবে অনেক উঁচু আর বসবার জায়গাটা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সামনে ঘোড়ার বদলে উট। যা নতুন মনে হবে, তা হল এই গাড়ির চালক গাড়িতে না চড়ে উটের পিঠে বসে দু ধারে পা ঝুলিয়ে। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল বলেই মনে আছে। কিন্তু স্বাতি এই উটের গাড়ির কথা শোনে নি বলেই আশ্চর্য হয়েছিল।

লালগড় প্রাসাদে পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। টাঙ্গা থেকে নেমে আমরা প্রাসাদের কাছে এগিয়ে গেলুম।

লাল পাথরে তৈরি এই প্রাসাদটি অনেক আধুনিক। আধুনিক

মানে, এর স্থাপত্যকলা গত শতাব্দীর শেষের দিকের। পাথরের উপরে নানা রকমের কারুকার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভিতরে দেখবার কী আছে?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

প্রাসাদের বর্ণনা আমার পড়া ছিল। বললুম: ভিতরে একটি পাণ্ডুলিপি ও চিত্রের সংগ্রহশালা আছে।

আর কী?

আর এই প্রাসাদেরই একাংশে বিকানেরের সবচেয়ে ভাল হোটেল।

স্বাতি বলল: উদয়পুরে পিছোলা লেকের মাঝখানে সেই সুন্দর প্রাসাদটির ভিতরেও একটি হোটেল হয়েছে শুনেছি।

বললুম: বিদেশী টুরিস্ট আমদানি করতে পারলেই তো দেশে পয়সা আসবে! তারাই এখন আমাদের রাজা!

স্বাতি আমার কথা শুনে পিছিয়ে এসে বলল: তবে আমরা অনধিকার প্রবেশ করব না।

স্বাতি যে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকবে না, আমি তা জানি। কিন্তু তার অনীহার কারণ জানি না। হেসে বললুম: তবে ফিরেই চল।

স্বাতি বলল: টুরিস্ট অফিসটা দেখে ফেরা যাক।

সে তো সার্কিট হাউসে!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল: টুরিস্ট অফিস হয়েই আমরা হোটেলে খেতে যাব।

কাজেই সেই রকম নির্দেশ দিয়েই আমরা টাঙ্গায় উঠে বসলুম।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: জাদুঘর দেখবেন না? গঙ্গা গোল্ডেন মিউজিয়ম?

এই পথেই আমরা এসেছি, ফিরবও এই পথে। কিন্তু স্বাতি বলল: মিউজিয়ম মানে তো রাজার পোশাক-আশাক!

বললুম : কতকটা তাই। রাজারা শখ করে যা কিছু সংগ্রহ করতেন—পাথর ও মাটির মূর্তি চিত্র অস্ত্রশস্ত্র আর মুদ্রা—সেই সবই সাজানো আছে একটা সুন্দর বাড়িতে।

স্বাতি বলল : কলকাতার মিউজিয়ম দেখবার পর আর কোথাও মিউজিয়ম দেখবার দরকার নেই।

এখন আমরা সার্কিট হাউসের দিকে যাচ্ছি। বিকানেরের টুরিস্ট অফিস সেইখানেই।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : চিড়িয়াখানা সার্কিট হাউসের কাছে। ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারবেন।

স্বাতি হেসে বলল : আমরা ছেলেমানুষ নই।

আমি বললুম : এক সময় দেশীয় রাজাদের এ সব প্রেস্টিজের ব্যাপার ছিল।

মানে ?

তাদের রাজধানীতে স্কুল কলেজ হাসপাতালের মতো এক একটা চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর না থাকলে রাজার মান থাকত না। রাজারা তাই নিজেদের মানের জন্যে এই সব প্রতিষ্ঠা করতেন। প্রজাদের শিক্ষা বা মনোরঞ্জন ছিল গৌণ উদ্দেশ্য।

স্বাতি বলল : সব রাজাকে এক পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়।

সে কথা মানি। কিন্তু কেউ যদি মহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করতেন, বা নিজের শখে করতেন, তাহলে আমরাও অনেক বড় কিছু দেখতে পেতুম।

যেমন ?

যেমন জামনগরের সোলারিয়ম। সূর্যের আলোয় রোগের চিকিৎসা। নবনগর রাজ্যের জামসাহেব নিজের চিকিৎসা করিয়েছিলেন বিদেশে, কিন্তু দেশের লোকের জন্যে এই সোলারিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের রাজধানীতে। এখন নাকি পৃথিবীতে এই একটি সোলারিয়মেই চিকিৎসা হয়।

কথায় কথায় সার্কিট হাউসে আমরা পৌঁছে গেলুম। এরই গায়ে একটি ঘরে টুরিস্ট অফিস। নতুন কোন টুরিস্ট লিটারেচার না পেয়ে মর্মাহত হলুম। মনে হল, রাজস্থান সরকার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেই নির্ভর করে আছে। সময় নষ্ট না করে আমরা বেরিয়ে এলুম।

১১

হোটেলে দুপুরের আহার সেরে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এলুম বিশ্রামের জন্যে। রাতের ট্রেনেই যখন বিকানের ত্যাগ করব তখন অন্য কোন বিশ্রামের স্থানের প্রয়োজন নেই। দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই বলে একখানা বেঞ্চি বা দুখানা চেয়ার পেলেই আমাদের চলে যায়। আবাব ভাল সহযাত্রী পেলে অনেক কিছু জানাও যায়।

দুখানা চেয়ার টেনে আমরা পাশাপাশি বসলুম। বালুরামের জন্য এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। স্বাতি বলল: ভদ্রলোকের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারলে মন্দ হয় না।

কেন বল তো?

রাজস্থানী মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ধারণা হত।

বললুম: এর আগে কি তা হয় নি?

স্বাতি বলল: দিল্লীতে দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে তাদের কোন প্রভেদ দেখি নি।

স্বাতি একটু থেমে বলল: তার কারণ আছে। তাদের বাবারা দিল্লীতে বড় চাকরি করেন। সর্বভারতীয় আবহাওয়ায় তারা মানুষ। তাই তাদের দেখে রাজস্থানী মেয়ের সম্বন্ধে কোন ধারণা করা ঠিক নয়।

যেমন কলকাতার বড়বাজারের মারোয়াড়ীদের দেখেও কোন ধারণা করা উচিত নয়।

কিন্তু এই প্রস্তাবটা তোমাকে করতে হবে।

বললুম: তাহলে ফল হবে না।

স্বাতি তখনই আমার কথা মেনে নিয়ে বলল: বুঝেছি। কিন্তু কী ভাবে কথাটা বলা যায় বল তো!

বললুম : সরল ভাবে বল, তোমার বন্ধুকে দেখতে চাই। রাজী হলে তাতেই হবে।

কিন্তু এরা যে রকম পর্দানসীন শুনেছি তাতে—

আমি একা হলে এ রকম প্রস্তাব করতে ভয় পেতুম।

স্বাতি বলল : আমারও ভয় করছে।

ঠিক এই সময়েই দরজার সামনে বালুরামকে দেখা গেল। তার সঙ্গে এক সপ্রতিভ মহিলা। বালুরাম তার দিকে ফিরে বলল : তোমায় বলি নি সুভদ্রা, এতক্ষণে ওঁরা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন!

বলে দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে এসে আমাদের চমকে দিল।

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। বালুরাম বলল : আপনাদের কথা শুনে সুভদ্রা বলল : ছি ছি, একি কাজ করেছ! ওঁদের তো আমাদের বাড়িতে আনা উচিত ছিল! এক-সঙ্গে আমরা খেতে পারতাম। এর উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি কী বলেছি জানেন?

বলে আমাদের দিকে একবার সহাস্যে চেয়ে বলল : আমি বলেছি, নিরামিষ খেতে ওঁরা অভ্যস্ত নন। সত্যি বলি নি!

স্বাতি বলল : আমাদের বোঝা না নিয়ে আপনি ভালই করেছেন। আমরাও শহর দেখেছি। আর—

বলে স্বাতি হাসল। আর এই হাসি দেখে লজ্জা পেল সুভদ্রা।

স্বাতি তার এই লজ্জা উপভোগ করে বলল : কিন্তু আপনাকে আবিষ্কার করবার জন্যে মনে মনে আমরা তৈরি হয়ে ছিলাম। আপনি না এলে আমরাই আপনার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।

সুভদ্রা বলল : আমি কি মূল্যবান জিনিস যে আমাকে আবিষ্কার করার জন্যে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : বালুরামবাবু আমাদের মরুভূমি দেখাতে এনেছেন, কিন্তু আমরা মরুভূমির মানুষও দেখতে চাই।

বিশেষ করে আপনার মতো একজন মানুষ, যার টানে আর একজন মরুভূমির মানুষকে ঘুরে ফিরে বিকানেরে আসতে হয়।

আমি বললুম: বালুরামবাবু সত্য কথাটা গোপন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

কী রকম?

বলে বালুরাম আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: আপনি বলেছিলেন যে বিকানের শ্রাবণে ভাল, কিন্তু আমি দেখছি যে আমাদের কাছে বিকানের 'নিতকো ভাল'।

আপনাদের কাছেও নয় কি!

বলে স্বাতি সহাস্যে সুভদ্রার দিকে তাকাল।

কথায় কথায় প্রকাশ পেল, সুভদ্রা একটি মেয়েদের স্কুলে পড়ায়। বালুরামের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। কিন্তু তাদের বিবাহে কিছু বিঘ্ন আছে। সহসা সে কথা তারা প্রকাশ করতে চাইল না।

আমি বললুম: জীবনে প্রেমটাই বড়, তার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। বিবাহকে যারা প্রেমের চেয়ে বড় মনে করে, তারা ভুল করে। বিরহে প্রেম মধুর হয়, মলিন হয় মিলনে।

স্বাতি হাসল আমার কথা শুনে, আর বালুরাম বলল: এ তো আদর্শের কথা। কিন্তু জীবনে এ কথা মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়।

বললুম: মেনে নিলে জীবনটা সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু বালুরামের মুখ বড় বিষণ্ণ দেখাল। আমার কথা বোধহয় মেনে নিতে পারছিল না, প্রতিবাদ করতেও চাইছিল না। তাই চুপ করে রইল।

স্বাতি বলল: আপনাদের কাছে আমার অনেক কিছু জানবার আছে।

বলুন।

বলে সুভদ্রা স্বাতির মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল: আপনাদের সমাজের কোন কথাই আমরা জানি না—আপনাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচয় জানার কোন সুযোগ আমাদের নেই।

বালুরাম বলল: আপনি প্রশ্ন করুন। আমরা যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

স্বাতি বলল: প্রথমে বিয়ের কথাই বলি। কলকাতায় আপনাদের বিয়ের শোভাযাত্রা দেখেছি—ভারি জমকালো ব্যাপার। বাজনা বাদ্যি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বর বিয়ে করতে যায়। শুধু এইটুকুই জানি।

বিয়ের অনুষ্ঠান জানতে চান তো?

বলে বালুরাম সুভদ্রাকে বলল: তুমি বল।

অনেক দিন আগে রাজস্থানে ভ্রমণের সময়েই ভীমরাজবাবু নামে এক মারবাড়ী ভদ্রলোকের কাছে আমি তাদের বিবাহ পদ্ধতির কথা শুনেছিলুম। খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন তিনি। আর সব কথা এখন মনেও নেই। স্বাতি অন্য গাড়িতে ছিল বলে সে এই গল্প শোনে নি। তাই তাদের বিবাহের কথা শোনবার জন্যে অনেক আগ্রহ নিয়ে সুভদ্রার দিকে তাকাল।

কিন্তু সুভদ্রা বালুরামকে বলল: তুমিই বল না।

বালুরাম বলল: সব কথা কি আমি জানি!

সুভদ্রা বলল: কিছু বাদ গেলে আমি বলে দেব।

বালুরাম বলল: সব ক্ষেত্রে ঠিক আমাদের মতো হয় না, আর তা হয় না বলে কোন বিঘ্নও হয় না। ছেলেমেয়ের বাপ মায়েরাই বিয়ে ঠিক করেন। আর খুব কাছাকাছি জানাশোনার মধ্যেই বিয়ে ঠিক হয়। এই জন্যে বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: সত্যি!

সুভদ্রা বলল : বিয়েব আগে অনেক অনুষ্ঠান আছে কিনা, তাই এই সুযোগ পাওয়া যায়।

বালুবাম বলল : বাগদত্ত হবার কোন অনুষ্ঠান আপনাদের আছে কিনা জানি নে। তবে আমাদের আছে। বাগদত্ত হবার পরে–

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এই অনুষ্ঠানটি কী রকম ?

সুভদ্রা বলল : সেদিন ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েব বাড়িতে আসবে একটি রূপোর থালায় ফল মিষ্টির সঙ্গে একটি আংটি। মেয়ে সেই আংটি পববে আব মেয়েব বাবা আংটিব বদলে একুশটি টাকা বেখে সেই থালা ফেবত দেবে। ছ মাস থেকে এক বছব এই বাগদত্ত অবস্থায থাকতে হবে। তার পব বিয়ে।

বালুবাম বলল : ভানাব কথা বলবে না ?

সুভদ্রা বলল : বিয়েব দশ-পনেব দিন আগে ভানা নামের একটি অনুষ্ঠান হয়।

বালুবাম সহাস্যে বলল : এব পবেব দিন কটাই সবচেয়ে মধুব।

কী বকম ?

বলে আমি তাব মুখেব দিকে তাকালুম।

বালুবাম বলল : ভানাব পবে বোজ নিমন্ত্রণ—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ কবে খাওয়াবে। তারা পান সুপুবি এলাচ শুকনো ফল নিয়ে ঘোড়া বা টাঙ্গায় চেপে, এখন মোটরে চেপে, সূর্যাস্তের আগেই এসে উপস্থিত হবে। সূর্যাস্তের পরে গান বাজনা হবে, আমোদ আহ্লাদ, তার পরে খাওয়া। রাতে তারা যে যার বাড়ি ফিরে যাবে কিছু উপহার নিয়ে। উপহার সাধারণত টাকা।

স্বাতি বলে উঠল : ভারি সুন্দর ব্যবস্থা তো !

সুভদ্রা বলল : আপনাদের বুঝি এ রকম হয় না ?

স্বাতি বলল : উঁহু। আমাদের মা-ঠাকুমার আমলে বর-কনে

তো বিয়ের আগে মুখ দেখতেও পেত না। বিয়ের দিনে হত তাদের শুভদৃষ্টি।

এখন?

স্বাতি হেসে বলল: শুভদৃষ্টি আছে। কিন্তু তার আগেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বাপ মায়েরাই বলে, ছেলে একবার মেয়ে দেখুক। কিন্তু সে না-দেখারই মতো।

আমার দিকে চেয়ে বলল: সবাইকে এ রকম ভাল ছেলে ভাববেন না। অনেক ছেলে মেয়েই এখন ভাব করে বিয়ে করছে।

আমি বললুম: মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। বিয়ে করব বলে ছেলেদের নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে, তার পরে পালিয়ে যাচ্ছে অন্যের সঙ্গে।

সুভদ্রা সকৌতুকে হাসল আর বালুরাম বলল: এ তো সব দেশেই আছে।

বলে আড়চোখে তাকাল সুভদ্রার দিকে।

স্বাতি বলল: এইবারে বিয়ের গল্পটা শেষ করুন।

বালুরাম বলল: বিয়ের তিন দিন আগে মেয়ের বাবা মিষ্টি পাঠাবেন ছেলের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিতরণের জন্যে। তার পর দিন ডোরা বা পালডার অনুষ্ঠান। সেদিন দু পক্ষই ফল ও মিষ্টি পাঠাবেন, তার সঙ্গে জামাকাপড়। মেয়ের জন্যে অলঙ্কারও আসবে ছেলের বাড়ি থেকে।

স্বাতি বলল: আমাদের গায়-হলুদে তত্ত্ব যায়। আবার অনেক বিয়েয় অধিবাসের ডালায় থাকে মেয়ের জন্যে অলঙ্কার।

সুভদ্রা কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ পেল না। তার আগেই বালুরাম বলল: বিয়ের দিন বরযাত্রী বেরোবে শোভাযাত্রা করে। যার যত পয়সা, তার তত জাঁকজমক। আলো থাকবে, ব্যাণ্ড বাজবে। রাজপুত যোদ্ধার বেশে বর যাবে ঘোড়ার পিঠে, হাতে

খোলা তলোয়ার। পিছনে পায়ে হেঁটে যাবে বরযাত্রী। মেয়ের বাড়িতে মহা সমারোহে তাদের সম্বর্ধনা জানানো হবে, কিন্তু বিয়ের রাতে কোন ভোজ হবে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: সেকি! আমাদের বরযাত্রী তো ভোজ খেতেই আসে!

আমি বললুম: বিহারে শুনেছি তিন দিন খাওয়াতে হয়।

বালুরাম বলল: আমাদেরও ভোজ আছে, কিন্তু দু-একদিন পরে। এর নাম নিয়াতি ভাত। মেয়ের বাবাকে এই সামাজিক ভোজে অনেক সময় হাজার দশেক লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়।

হাজার দশেক!

বালুরাম বলল: আগে এই ব্যবস্থাই ছিল। এখন কোন বিধি-নিষেধ হয়েছে কিনা জানি না।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। সেই মারবাড়ী ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে এই সব ভোজে পাতে ঘি দেবার একটা মজার ব্যাপার ছিল। খাবার পরিবেশন করা হত কানা-উঁচু থালায়। আর প্রথমেই বদনার মতো নল লাগানো পাত্র দিয়ে ঘি পরিবেশন করা হত। আপত্তি না করা পর্যন্ত ঘি ঢেলে যেতে হবে। প্রাচীনেরা খাবার আগে থালায় চুমুক দিয়ে সেই ঘি খেতেন। অনেকে আবার নিতেন। প্রথা রক্ষায় এখনও নাকি দু-এক চুমুক ঘি খেতে হয়।

স্বাতি বলল: কিন্তু বিয়ের গল্প এখনও শেষ হয় নি।

বালুরাম বলল: বিয়ে বৈদিক মন্ত্রে হয়। মুহূর্ৎ মানে বিয়ের লগ্নে বর কনেকে নিয়ে মেয়ের বাবা মা বসবে মণ্ডপের নিচে। আগেকার দিনে কনে সাদা রঙের ঘাগরা ও ছোট জামার উপরে চাদর জড়িয়ে বসত। এখন লাল শাড়ির চল হয়েছে। মুখে চন্দন আর সিঁদুর, গা ভর্তি গয়না। ঘণ্টা দুই ধরে পুরুত মন্ত্র পড়ান।

তার পর?

তাব পর —

বালুরামকে ভাবতে দেখে সুভদ্রা বলল : কিছুক্ষণের জন্যে বর কনেকে বরের বাড়িতে যেতে হয়।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : বিয়ের রাতেই !

সুভদ্রা বলল : হ্যাঁ, বিয়ের রাতেই মিনিট কয়েক বরের বাড়িতে কাটিয়ে তাবা আবার কনের বাড়িতে ফিরে আসে। তার পব বিদা উৎসবটি হবে নিয়াতি ভাতের পরদিন ভোর বেলায়।

বালুরাম বলল : কিন্তু কনে তার পর থেকেই বরেব সঙ্গে সংসার করতে পারবে না।

কেন ?

নিয়ম নেই। বছব না ঘুরলে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে পাবে না।

স্বাতি বলল : এ ভারি ঝামেলা তো।

সুভদ্রা বলল : মন্দ কি !

স্বাতি বলল : বিয়ের আগে দেখাশোনার ব্যাপারটা আমার ভারি ভাল লাগছে। বেশ আধুনিক ব্যাপার।

সুভদ্রা বলল : কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন স্বাধীনতা নেই। সবই নিয়মমাফিক করতে হয়। নিয়ম মানেই পরাধীনতা।

আমি বললুম : আনন্দ নিয়ম ভেঙে। এই জন্যেই ছেলেমেয়েরা আজকাল নিয়ম ভাঙছে।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : আমরা তো পুরাকালের মানুষ। আমরা সব নিয়ম রক্ষা করেছি।

বালুরাম বলল : আমরাও খুব রক্ষণশীল। দেশে এখনও আমাদের সামাজিক আচার নিয়ম মেনে চলতে হয়।

আপনারা কী করবেন ভেবেছেন ?

বলে স্বাতি সুভদ্রার দিকে তাকাল।

মাথা নিচু করে সুভদ্রা বলল : জানি নে।

তার লজ্জা দেখে আমি এই প্রসঙ্গ বদলাবাব জন্যে বললুম ঃ নাচ গান আপনার কেমন লাগে ?

নাচ গান !

বলে সুভদ্রা আমার মুখেব দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল ঃ নাচ গান আমবা খুব ভালবাসি, নাচ গানের কথা শুনতেও ভাল লাগে।

বালুবামেব মুখের দিকে চেয়ে মনে হল যে এ বিষযে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সুভদ্রা খুশী হয়ে বলল ঃ আমাবও খুব ভাল লাগে, কিন্তু শেখবার সুযোগ আমাদের খুবই সামান্য। শুনে শুনে যতটা শেখা সম্ভব, ততটাই শিখি।

স্বাতি বলল ঃ ওয়েটিং রুম না হয়ে এটা কোন নিরিবিলি জায়গা হলে—

বাধা দিয়ে সুভদ্রা বলল ঃ দোহাই আপনাব, আপনি আমাকে নাচতে বলবেন না।

স্বাতি বলল . বেশ, তাহলে কথায় বুঝিয়ে দিন।

সুভদ্রা বলল ঃ ঘুমর আমাদের কাছে একটি জনপ্রিয় নাচ।

স্বাতি আমাব মুখেব দিকে তাকাল। আমার মনে হল যে তার বোধ হয় সাঁওতালদের ঝুমর নাচের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু কোন কথা বলে আমি সুভদ্রাকে বাধা দিলুম না।

সুভদ্রা বলল ঃ হোলি দেওয়ালিতে মেয়েরা ঘুমর নাচ নাচে, গাঙ্গোর পূজোর সময়েও।

গাঙ্গোর পূজো !

বলে স্বাতি সুভদ্রার দিকে তাকাল।

আমার মনে হল যে এই গাঙ্গোর পূজার কথা আমি এর আগে কারও কাছে শুনেছিলুম। কিন্তু কী শুনেছিলুম তা মনে পড়ল না। তাই সুভদ্রার কাছে আবার শোনবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম। বললুম ঃ এই পূজোর কথাও কিছু বলুন।

সুভদ্রা বলল: গাঙ্গোর আর তীজ এই দুটি হল রাজস্থানের প্রধান উৎসব। গাঙ্গোর বসন্তের উৎসব, দেবী গৌরীর পূজা। মেয়েরা এই উৎসবের দিনের আগে এক পক্ষকাল গৌরী পূজা করে। উৎসবের দিন শোভাযাত্রা বেরোয় অনেক জায়গায়।

তার পরেই জিজ্ঞাসা করল: জয়পুর বা উদয়পুরে এই উৎসব দেখেন নি?

স্বাতি বলল: না।

তবে একবার দেখবেন। ভারি ভাল লাগবে আপনাদের। জয়পুরের সিটি প্যালেস থেকে গৌরীর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। হাজার হাজার গ্রামবাসী মেয়েপুরুষ এসে যোগ দেয় এই শোভাযাত্রায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আর উদয়পুরের উৎসব আরও সুন্দর। পিছোলা লেক দেখেছেন তো?

দেখেছি।

সেই লেকের জলে শোভাযাত্রা হয় নৌকোয়। নিজের চোখে না দেখলে সে দৃশ্য কল্পনা করা যায় না।

স্বাতি বলল: কিন্তু এক দিনে দু জায়গায় দেখব কী করে?

এক এক বছর এক এক জায়গায় দেখবেন।

তাহলে এ দেশে এসেই বাস করতে হবে।

আমি বললুম: এইবারে তীজের কথা বলুন।

সুভদ্রা বলল: তীজে দেবী পার্বতীর পূজা। বর্ষার শুরুতে এই পূজা হয়। ঘরে ঘরে দুদিন পূজা হবে পার্বতীর, তার পরে তিনি বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবেন। বড় বড় শহরে শোভাযাত্রা বেরোবে। তার পুরোভাগে থাকবে চমৎকার করে সাজানো হাতি ঘোড়া আর উট। এই দৃশ্য দেখতে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে শহরে আসবে গ্রামবাসী। তাদের সাজসজ্জা ও রঙের বাহার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

বালুরাম আমার দিকে চেয়ে বলল: রাজস্থান দেখতে হলে

এইসব উৎসবও দেখতে হয়। রাজস্থান কতগুলো বড় বড় শহর আর দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বালির মরুভূমিতেও তার সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। পূজা উৎসব নাচ গান সাহিত্য, সব মিলিয়ে রাজস্থান।

আমি এইবারে গল্পের খেই ধরিয়ে দিলুম: তাহলে ঘুমর নাচের কথা বলুন।

বলে সুভদ্রার দিকে তাকালুম।

সুভদ্রা বলল: খুব সরল এই নাচ। মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে পিতলের থালায় পূজার উপচার নিয়ে চলতে চলতে গুনগুন করে গান গাইবে। আর সেই গানের কলি স্পষ্ট হয়ে উঠলেই থালা রেখে দিয়ে নাচ শুরু করবে। হাত তুলে বৃত্তাকারে নাচবে ঘুরে ঘুরে। নাচের তালে তালে দুলবে সারা শরীর।

বালুরাম বলল: ঘুমরকে অনেকে ঝুমর নাচও বলে।

তার পরেই সুভদ্রাকে প্রশ্ন করল: ভাওয়াই সম্প্রদায়ের কথা বলবে না?

সুভদ্রা বলল: ইতিহাসের কথা আমি জানি নে।

বালুরাম আমার দিকে চেয়ে বলল: মধ্যযুগের রাজা-উজীরদের কাছে নাচের কোন দাম ছিল না। বড়লোকেরা নৃত্যশিল্পীদের দেখে নাক সেঁটকাত। তাই ভাল ঘরের ছেলেদের নাচ শেখার বা নাচবার উপায় ছিল না। শোনা যায় যে শ চারেক বছর আগে নাগোজী নামে একজন জাঠ সমাজ ছেড়ে নৃত্যশিল্পীদের একটি দল গড়ে তোলে। এই দলটিই এখন ভাওয়াই সম্প্রদায় নামে রাজস্থানে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের ছেলেরা ছোট থেকেই নাচ শেখে। নাচ দেখিয়ে রোজগারই তাদের জীবিকা। বর্ষার পরে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। গুরু যেমন শিষ্যের বাড়ি যায়, এরাও তেমনি যজমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ দেখায়। মেয়েরা নাচে না, ছেলেরাই মেয়েদের পার্ট করে।

আমি বললুম: এদের নাচটা কী রকম?

বালুরাম বলল : উচ্চাঙ্গের নাচ নয়, লোকনৃত্য বলতে পারেন বা নৃত্যনাট্য— জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে এক বকমেব নৃত্যাভিনয়। এই সব নৃত্যনাট্য গ্রামবাসীদেব জীবনযাত্রা নিয়ে বচিত। ধর্মেব ভাব তাতে নেই, ববং মাঝে মাঝে অশ্লীলতাব ধাব ঘেঁষে যায়। ঢোলা-মাকব বিখ্যাত প্রেম কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও নৃত্যনাট্য আছে।

আমি হেসে বললুম : এই তো, নাচেব সম্বন্ধে আপনাব দিবিা অভিজ্ঞতা আছে দেখছি।

খুশী হয়ে বালুবাম সুভদ্রাকে বলল : মরুভূমিব ফাযাব ডান্সেব কথা বল না।

সুভদ্রা বলল : গুরু গোরখনাথেব ভক্ত সিধ জাঠেবা এই নাচ নাচে। মরুভূমিব একেবাবে শেষ প্রান্তে তাদেব বাস। কিন্তু চৈত্র মাসে গুরু জসনাথেব মেলায তাদেব দেখতে পাওযা যায।

স্বাতি বলল : আপনারা নিশ্চয়ই এই নাচ দেখেছেন?

সুভদ্রা বলল : দেখে খুব আশ্চয হয়েছি।

কেন?

অমানুষিক বলে মনে হয়েছে, কিছু অলৌকিকও বটে। মস্ত বড় আগুন জ্বালা হয়, আর গান শুরু হয় ড্রাম আর পাইপ বাজিয়ে। এক দল সিধ জাঠ আগুনেব উপবে লাফিয়ে পড়ে ঘণ্টা খানেক ধবে নাচবে এমন ভাবে যেন স্টেজের ওপরে নাচছে। মুখ দেখে বোঝা যাবে না যে আগুনে তাদের কোন রকম কষ্ট হচ্ছে।

আশ্চর্য!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : এও এক রকমের যোগ সাধনা।

স্বাতি বলল : মরুভূমির দেশে এই বকমের নাচ আরও আছে নাকি?

সুভদ্রা হেসে বলল : না।

বালুরাম বলল : কেন, মারবাড়ের কাঠপুত্‌লি নাচ ?

সে ঠিক মরুভূমির নাচ নয়। আর আজকাল মারবাড়ের কাঠ-পুত্‌লিওয়ালারা শুনেছি সারা ভারতবর্ষে এই নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। দেখেন নি আপনারা ?

না। তবে শুনেছি এদের কথা।

বালুরাম বলল : ব্যাপারটা খুব সহজ। কাঠের পুতুলে সুতো বাঁধা থাকে। কাঠপুত্‌লিওয়ালা সেই সুতো ধরে টেনে টেনে নাচ দেখায়। তার বউ ঢোলক বাজিয়ে গান গেয়ে গল্পটা শোনায়। সাধারণত রাতে এই নাচ দেখানো হয়।

সুভদ্রা বলল : সম্প্রতি উদয়পুরে গেছেন ?

স্বাতি বলল : কিছু দিন আগে গিয়েছি।

এবারে গেলে লোক-কলামন্দির বা ঐ ধরনের কোন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে যাবেন। রাজস্থানের নানা রকমের লোককলার মধ্যে কাঠপুত্‌লির নাচও দেখতে পাবেন। বেশ মজা লাগবে আপনাদের।

বালুরাম তার ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : এইবারে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

আমি বললুম : তার চেয়ে এখন বেরিয়ে পড়া ভাল। যদি কিছু দেখবার থাকে তো অন্ধকার হবার আগেই দেখে নেওয়া যাবে।

বালুরাম সম্মতি জানিয়ে বলল : তাহলে তো কোন ভাল জায়গায় বসে আমরা চা খেতে পারব।

বলে উঠে দাঁড়াল। আমরাও উঠে পড়লুম।

১২

চা খেতে বসে বালুবাম বলল : ফোর্ট কেমন দেখলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তব দিল স্বাতি, বলল : বাইরে থেকেই দেখেছি।

সুভদ্রা বলল : ভেতরে যান নি ?

না। বাজা মহারাজার বাড়ি দেখবাব আগ্রহ আমার নেই।

কেন ?

সবই প্রায় একই রকমের। একটা দেখলে আর একটা দেখবার ইচ্ছে হয় না।

সুভদ্রা বলল : আমারও তাই মনে হয়.

বালুরাম বলল : ভিতরের বাড়িগুলো তো একসঙ্গে তৈরি হয় নি। তাই নানা রকমের বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়।

তার পবে ইতিহাসেব গল্প বলল বালুরাম : সবাই বলে রাজা রায়সিংহ এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু রায়সিংহ সম্বন্ধে অনেকেই কিছু জানে না। রায়সিংহ ছিলেন আকবর বাদশাহব সেনাপতি। তিনি বিকানেরে রাজত্ব করেছেন ১৫৭১ থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত। তাঁর সময়ে নির্মিত চৌবারা দেখবার মতো। এঁর প্রায় দুশো বছর পরে মহারাজা গজ সিংহ নির্মাণ কবেন ফুল মহল চন্দ্র মহল গজ মন্দির ও কাছেরি। আরও একশো বছর পরে মহারাজা ডুঙ্গর সিংহ নির্মাণ করেন ছেতার মহল ও চিনি বুরজ। লাল পাথরের গঙ্গা নিবাস নির্মাণ করেছেন মহারাজা গঙ্গা সিংহ। তাঁকে আমরা বিকানেরের শ্রেষ্ঠ রাজা মনে করি।

আমি বললুম : কেন এমন মনে করেন সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

বালুবাম বলল : তাঁর রাজত্বকালকে বিকানেরের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সময়টা বলুন।

১৮৮৭ থেকে ১৯৪৩।

হেসে বললুম ঃ এই সময়টাই তো ভারতের স্বর্ণযুগ। সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। তার পরেই ইংরেজ বুঝেছিল যে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে মন না দিলে তাদের পক্ষে রাজত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে উঠবে। দেশের সর্বত্র পথঘাট নির্মাণ, রেলপথ স্থাপন, ডাকঘর, ইলেকট্রিক -এই সব আধুনিক ব্যবস্থা হয়। এ শুধু ইংরেজ রাজ্যে নয়। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এ সময় অনেক উন্নতি হয়।

বালুরাম একটু দমে গেল। তার পরে বলল ঃ গঙ্গাসিংহজীর প্রধান কীর্তি হল গঙ্গানহর নির্মাণ করে রাজ্যের অনুর্বর ক্ষেত্রকে সুজলা সুফলা করে তোলা।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললুম ঃ এটা একটা বড় কাজ।

খুশী হয়ে বালুরাম বলল ঃ তাঁর গঙ্গা রিসালার জন্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে খুব খাতির করত। গঙ্গা রিসালা হল ক্যামেল কোর। বিকানের রাজ্যের উট তো বিখ্যাত, রাজা এই উটের বাহিনী নিয়ে ১৯০০ সালে চীন দেশে ও ১৯০৩-৪ সালে সোমালিল্যাণ্ডে যুদ্ধ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই বাহিনী ইজিপ্টেও পাঠানো হয়েছিল। তিনি একজন জেনারেল ছিলেন। নাইট উপাধি ছাড়াও পেয়েছিলেন আরও অনেক সম্মান—জি.সি.এস.আই, জি.সি.আই.ই, জি.সি.ভি.ও জি.বি.ই, কে.সি.বি ও এল.এল.ডি।

আমি জানি যে দেশীয় রাজাদের মন পাবার জন্যে ইংরেজ সরকার তখন দরাজ হাতে উপাধি বিলোতেন। শুধু দেশীয় রাজাদের নয়, জমিদার ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের জন্যেও তাঁদের দরাজ হাত ছিল। অনেক জমিদার রাজাবাহাদুর বা রায়বাহাদুর হবার জন্যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিত, অনেক সরকারী কর্মচারীও। দেশের গুণী ও মনীষীরাও অনেক সম্মান পেয়েছেন। সম্মান

পেয়েও তা ত্যাগ করেছেন মাত্র একজন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে আরও বেশি সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এ সব কথা বালুরামকে আমি বললুম না।

বালুরাম বলল: এই যে বিকানের শহর আপনি দেখলেন, এই শহরটা গঙ্গা সিংহজীর আমলেই তৈরি বলতে পারেন।

এর পরে বালুরাম দুর্গের কথায় ফিরে গেল। বলল: ফোর্টের ভিতরে গঙ্গা সিংহজীর নির্মিত গঙ্গানিবাস মহল করণপ্রোল থেকেই দেখা যায়।

করণপ্রোল!

হ্যাঁ। আপনারা নিশ্চয়ই করণপ্রোলের বাইরে থেকেই দুর্গ দেখেছেন!

দুর্গের দ্বারকে অনেক জায়গায় পোল বলে। এখানে দেখছি বালুরাম প্রোল বলছে। বললুম: গেটের নাম তো জানি নে, টাঙ্গাওয়ালা যেখানে নিয়ে গেল সেখান থেকেই দেখেছি।

বালুরাম বলল: পশ্চিম দিকের চাঁদপ্রোল তো বন্ধ থাকে, খোলা থাকে পূর্ব দিকের করণপ্রোল। এই দুর্গে আরও পাঁচটি দ্বার আছে। তাদের মধ্যে সূরজপ্রোলই সব চেয়ে প্রাচীন। তারই গায়ে দুর্গ নির্মাণের ইতিহাস লেখা আছে সংস্কৃত ভাষায়।

এই দুর্গের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলবার ইচ্ছা হয়তো বালুরামের ছিল। কিন্তু টেবিলে চা এসে পড়ায় স্বাতি বলল: এইবারে আমরা কোথায় যাব?

আমি বুঝতে পারলুম যে স্বাতি এবারে দুর্গের প্রসঙ্গ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু বালুরাম তা বুঝতে পারল না বলে প্রশ্ন করল: টাঙ্গাওয়ালা আপনাদের সুরসাগর দেখিয়েছে?

সুরসাগর!

সুরসাগর নামের একটি বিরাট জলাশয়! নিশ্চয়ই দেখায় নি।

তাহলে তার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে জুনাগড়ের অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তাই নাকি!

বালুরাম বলল: মনে হত উদয়পুরের পিছোলা লেক থেকে রাণাদের রাজপ্রাসাদ দেখছেন। আর

আর কী?

আর ভুলেই যেতেন যে আপনারা মরুভূমির দেশে এসেছেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: গাইড না থাকলে নতুন জায়গায় এই রকমই হয়।

স্বাতি বালুরামের দিকে তাকিয়ে বলল: এখন আর আমাদের কোন ভাবনা নেই।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সুভদ্রা বলল: এখন আমাকে ফিরতে হবে।

সে কি!

বলে স্বাতি তার মুখের দিকে তাকাল।

সুভদ্রা বলল: এখনও আমরা পুরোপুরি আধুনিক হয়ে উঠতে পারি নি। বিশেষ করে এখন যে এলাকায় যাচ্ছেন, সেই এলাকায়।

বালুরাম বলল: আমরা তো এখন পুরনো বিকানের দেখতে যাচ্ছি। সে দিকে অনেকেই আমাদের পরিচিত।

কিছু মনে করবেন না।

বলে সুভদ্রা নমস্কার করে একটা টাঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। আমরা অন্য একটা টাঙ্গায় উঠে পড়লুম।

আমরা পিছনে বসেছিলুম, বালুরাম সামনে বসেছিল টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে। বলল: চলো রাম পুরিয়োঁ কি হবেলী।

তার পরে আমার দিকে ফিরে বলল: সকাল বেলায় জুনাগড় দেখেছেন, আর লালগড় প্যালেস। এবারে আপনাকে

বিকানেরের এক ধনীর বাড়ি দেখাব। রাজস্থানী স্থাপত্যের একটা নমুনা দেখা হবে। যদি ভাল লাগে তাহলে ভৈরুদাসজী কোঠারীর বাংলাও দেখাব।

কোট গেটের নিচে দিয়ে আমরা এবারে পুরনো বিকানের শহরে প্রবেশ করলুম। গলির মতো সংকীর্ণ পথ, কিন্তু যানবাহন চলাচল করছে। বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে আর উঁচু উঁচু বাড়ি। বালুরাম বলল: এই হল প্রথম রাজা বীকাজীর প্রতিষ্ঠিত বিকানের। এইটিই ছিল রাজ্যের রাজধানী। সুরক্ষার জন্যে পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছিল, তাতে গেট ছিল পাঁচটি।

স্বাতি বলল: এই শহরে রাজার প্রাসাদও নিশ্চয়ই ছিল!

কিন্তু কোথায় ছিল, তা জানি নে। এখন যা দেখতে পাওয়া যায়, তা অত পুরনো নয়।

এক সময়ে আমরা একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। বালুরাম টাঙ্গা থেকে নেমে বলল: আপনারাও নামুন।

গলি এখানেও সঙ্কীর্ণ। নেমে দেখলুম যে বাড়িটি দেখতে হলে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে। লাল পাথরে তৈরি কয়েকতলা উঁচু বাড়ি। ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে এ বাড়ির সৌন্দর্য দেখা যায় না। খানিকটা পিছিয়ে যেতেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। এ তো কোন আবাস গৃহ বলে মনে হচ্ছে না! এ যে মন্দিরের মতো অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত! না জানলে কি একে মন্দির ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতুম!

স্বাতি ঠিক এই কথাই বলল: এ কোনও মন্দির নয়!

বালুরাম হেসে বলল: মন্দির কি এত তলা উঁচু হয়, না তার আকার হয় এই রকম!

সত্যিই তাই। এটি কোন বাসগৃহই বটে। তার বাহিরের দেওয়ালে লাল পাথরের উপরে এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হয়েছে। কত শিল্পী কত দিন ধরে এই কাজ করেছে, তার হিসাব নেই।

কিন্তু যিনি এই গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন, তাঁর শিল্পবোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

স্বাতি বলল : এখানকার মন্দির তাহলে আরও সুন্দর!

আমি বললুম : সকাল বেলায় রতনবিহারীজীর মন্দির তো দেখেছি!

সে তো আধুনিক মন্দির। পুরনো মন্দির দেখতে পাবেন এই এলাকাতেই।

বলে বালুরাম টাঙ্গাওয়ালাকে বলল শ্রীলক্ষ্মীনাথজীর মন্দিরের দিকে চলতে। আর টাঙ্গায় বসে আমাদের বলল : উদয়পুরে একলিঙ্গজীর মন্দির দেখেছেন তো, বিকানেরে তেমনি শ্রীলক্ষ্মীনাথজীর মন্দির।

স্বাতি বলল : একলিঙ্গজী শুনেছি মেবারের রাণাদের কুলদেবতা।

বালুরাম বলল : শ্রীলক্ষ্মীনাথজীও তেমনি বিকানের রাজাদের কুলদেবতা। রাজ্যাভিষেকের সময়ে ও অন্যান্য বিশেষ পাল-পার্বণে রাজাদের এই মন্দিরে আসতে হয়। রাও বীকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাও ঘুণকরণজী এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মেবারের সঙ্গে তফাত এইটুকু যে একলিঙ্গজী শিব আর শ্রীলক্ষ্মীনাথজী বিষ্ণু।

কথায় কথায় আমরা মন্দিরের নিকটে পৌঁছে গেলুম। একটি তোরণের নিচে দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের পথ। এই রকমের তোরণ পরে আরও দেখেছি। দুপাশে দুটি স্তম্ভ, একটি ত্রিভুজ দিয়ে তারা যুক্ত। পাথরের উপরে সুন্দর কারুকার্য।

প্রাঙ্গণে উঁচু শিখর বিশিষ্ট মন্দির, সামনে বৃহৎ গম্বুজের নিচে নাটমণ্ডপ। তার সামনেও একটি ছোট গম্বুজের নিচে অর্ধমণ্ডপ। মূল মন্দিরের শিখর কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো একই স্থাপত্যরীতির, কিন্তু উচ্চতায় ও গাম্ভীর্যে তুলনীয় নয়। সম্মুখের বৃহৎ নাটমন্দির তাকে প্রায় সম্পূর্ণ আড়াল করেছে। পরে আমরা এই রকমের আরও মন্দির দেখবারও সুযোগ পেয়েছি।

মন্দির দেখে বেরিয়ে আসবার সময় বালুরাম বলল: রাজ্যের প্রথম রাজা বীকাজী যে কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন, তার ধ্বংসাবশেষ আছে কচ্ছে, আর তাঁর ছত্রী। সে জায়গাটাকে বলে বীকাজীকি টেকরী।

কিন্তু আমরা সেদিকে গেলুম না। এমন কিছু দর্শনীয় নয় বলেই বালুরাম আমাদের সেদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল না। বলল: বিকানের শহরে মন্দিরের শেষ নেই। যেদিকে যাবেন, সেদিকেই মন্দির। জৈন মন্দির থাকলে হিন্দু মন্দিরও আছে ' আর শুধু বৈষ্ণব মন্দির নয়, শৈব ও শাক্ত মন্দিরও আছে।

তার পরে বলল: এখন একটু বিশেষ কাজ না থাকলে আরও দু একটা মন্দির আপনাদের দেখাতে পারতাম।

স্বাতি বলল: না না, কাজের ক্ষতি করে কিছু দেখাতে হবে না।

বালুরাম বলল: এক কাজ করা যাক। দু একটা মন্দিরের কথা আপনাদের বলে দিচ্ছি। আমাকে কোর্ট গেটে নামিয়ে দিয়ে আপনারা তা দেখে নিন।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি টাঙ্গায় উঠে বসল। আমরাও উঠলুম।

চলতে শুরু করেই বালুরাম বলল: এই শহরের সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির হল চিন্তামণিজীর মন্দির। রাও বীকাজীর রাজত্ব-কালে এই জৈন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। আদিনাথ ও অন্যান্য তীর্থঙ্করদের মূর্তি তো আছেই, এ ছাড়া একটি ভূমিগৃহে এক হাজারেরও বেশি দেবদেবীর ধাতুনির্মিত মূর্তি রক্ষিত আছে। আকবর বাদশাহর কাছ থেকে রায়সিংহ এই মূর্তিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

বালুরাম একটু থেমে বলল: আর একটি দর্শনীয় জৈন মন্দিরের নাম ভাণ্ডাসরজী কা মন্দির। শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে একটা উঁচু জায়গার উপরে এই বিশাল মন্দিরটি ভাণ্ডা শাহ নামে একজন

শ্রেষ্ঠী রাও লুণকরণজীর আমলে নির্মাণ করেছিলেন। শহরের নানা স্থান থেকে এই মন্দিরের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়, আবার এই মন্দিরের তিন তলার উপরে উঠেও শহরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এই মন্দিরের স্থাপত্য খুবই সুন্দর। বাদ্যযন্ত্র হাতে কয়েকটি নারীমূর্তি বিশেষ আকর্ষণীয়।

বেলার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: সেখানে পৌঁছবার পরে ছবি তোলার সময় আর থাকবে না।

বালুরাম দুঃখিত ভাবে বলল: যথেষ্ট আলো পাবেন না। তবু দেখবেন। আর পিছনে নেমিনাথের মন্দিরটিও দেখে নেবেন।

আমাদের ফেরার পথের ধারেই ধুনীনাথজীর মন্দির। ধুনীনাথ নামে এক যোগী এই মন্দির নির্মাণ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য ও গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি পেরিয়ে আসার পরে বালুরাম এই কথা বলল। বুঝতে পারলুম যে তার ফেরার তাড়া আছে বলেই আমাদের নামতে বলল না। তার বদলে বলল: এখানকার দুটি মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাগণেচীজীর মন্দির, আর লালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। নাগণেচীজী হলেন অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী। লোকে বলে বীকাজী এই মূর্তি যোধপুর থেকে এনে বিকানেরে প্রতিষ্ঠা করেন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়ে, দক্ষিণের পথ নাগণেচীজীর মন্দিরে গেছে। আর পূর্বের পথ গেছে শিববাড়ি। এইখানেই লালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহারাজা ডুঙ্গর সিংহ তাঁর পিতা লাল সিংহের নামে শিবের এই বিশাল মন্দির ও সরোবর নির্মাণ করেছিলেন। এই অঞ্চল এখন শিববাড়ি নামে পরিচিত।

আমরা তখন কোট গেটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলুম। তা দেখতে পেয়ে বালুরাম বলল: রাজা ও রাজপরিবারের সমাধি যদি দেখতে চান তো শহরের পূর্ব দিকে দেবীকুণ্ডে চলে যাবেন। কিন্তু তার বোধহয় সময় পাবেন না। শহর থেকে মাইল পাঁচেক

দূরে। পরে আমি এই সব দূরের জায়গার কথা আপনাদের বলব।

বলেই টাঙ্গাওয়ালাকে আদেশ করল: রোকো, রোকো।

টাঙ্গা থামতেই বালুরাম নেমে পড়ল।

ট্রেনে আবার দেখা হবে।

বলে বালুরাম অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের ভিতর।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। আমি বললুম: হাসলে যে!

কিন্তু স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল। আমি পাশে নেমে তার মুখের দিকে চাইতেই বলল: সুভদ্রার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

কিন্তু এখন আমরা কী করব?

স্বাতি বলল: মন্দির দেখে বেড়ালে তোমার কাজ এগোবে না: তার চেয়ে এখানকার বইএর দোকানে তোমার দবকারী কাগজপত্র খুঁজে দেখা যাক।

হেসে বললুম: সে তোমার ব্যর্থ চেষ্টা হবে।

তবু দেখা যাক।

অনেক দোকানে খোঁজা হল। ইংরেজীতে ভূগোলের বই আছে, ইতিহাসের নেই। কোন গাইড বই নেই, বিকানের পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দী ভাষায়। হিন্দীতে বীকানের বানান, বাঙলার মতো বিকানীর নয়। দীর্ঘ ইকারের ব্যবহার বড় বেশি। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে সহাস্যে বলল: পড়তে পারবে?

আমিও হেসে বললুম: বানান করে করে পড়ব।

তবে দাও একখানা বই।

বলে স্বাতি সেই বীকানের পরিচয়খানা কিনে নিজের ব্যাগে পুরল।

১৩

অন্ধকার পথে ঘুরে না বেড়িয়ে আমরা স্টেশনে ফিরে এসেছিলুম। সময় মতো আহার সেরে নিয়ে আমরা যোধপুরের ট্রেনে এসে উঠলুম। বিকানের থেকে মারওয়াড় মেল ছাড়ে রাত আটটা পাঁচ মিনিটে। ১০৮ মাইল পথ অতিক্রম করে যোধপুরে পৌঁছয় সকাল আটটায়। যোধপুরেই শেষ নয়। মারবাড় জংশন পর্যন্ত এই ট্রেন যায়। মারবাড় রাজস্থানের সদর রাস্তার উপর একটি জংশন, দিল্লী-আমেদাবাদ লাইনের উপর। উদয়পুরের দিক থেকে ট্রেন আসে, আসে যোধপুরের দিক থেকেও। কচ্ছে যাবার সময়ে মারবাড়ে আমাদের গাড়ি বদল করতে হবে।

স্বাতি বসেছিল গাড়ির ভিতরে জানলার ধারে, আর আমি বাহিরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বালুরামের অপেক্ষা করছিলুম। হঠাৎ স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: সুভদ্রাকে তোমার কেমন লাগল?

হেসে বললুম: খুব রোমান্টিক নয়।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি আশ্চর্য হল। তাই দেখে বললুম: বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরের অবস্থা, যেন বিয়েটা হয়েই গেছে।

এ রকম অবস্থা বুঝি রোমান্টিক হয় না?

বললুম: রোমান্স তখন শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ একজন যাত্রীকে দেখে বালুরাম বলে মনে হল। তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললুম: একটি পরিচিত মেয়ের কথা মনে কর।

কার কথা?

নিজের অজ্ঞাতসারেই একটি গরিব ছেলেকে যে ভালবেসে ফেলেছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে তা বলতে পারে নি। বড়লোক

বাবা-মা একটার পর একটা বিয়ের চেষ্টা করতে লাগল, আর মেয়েটি—

যাক আর বলতে হবে না।

হেসে বললুম ঃ এরই মধ্যে রোমান্স আছে। নীরব ভালোবাসাই রোমান্টিক। হৃদয়কে স্পন্দিত করে, অভিভূত করে না বুদ্ধি, আর দেহটাকে পূজার ফুলের মতো পবিত্র মনে হয়।

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল ঃ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তুমি নিজেই রোমান্টিক হয়ে উঠলে দেখছি।

বললুম ঃ ওদের মধ্যে এরকম কিছু দেখলুম না।

একটা কিছু বাধা আছে বলে আমার মনে হল।

বাধা!

সেই বাধাকে তারা অতিক্রম করতে পারছে না।

কেন?

জোর নেই মনে, সংকল্পে বিশ্বাস নেই।

নিজেদের কথাই আমার মনে পড়ে গেল। অসীম বিশ্বাসে শান্ত ছিল স্বাতির অন্তর। এই বিশ্বাস সে কোথা থেকে পেয়েছিল জানি নে। বম্বে শহরে জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিবাহ পাকা হচ্ছে। তার মা এই ব্যবস্থা করছেন দেখে আমি দেশে ফিরে আসছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে ট্রেন ছাড়বার আগে স্বাতির বাবা-মাকে আমি প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে গাড়ির দরজার কাছে চলে এল, তার পর প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি দূরে সরে গেলুম, আর মুখ তুলে স্বাতি হাসল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গিয়েছিল। বড় অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে।

তার পরে ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে। গাড়ির বাঁশি বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও আমি শুনতে পেলুম ঃ নিজের

ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জানো না গোপালদা, তাই এমন ভয় পাও। তোমার সম্পত্তি কি কেনা হয়ে যায় নি!

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, হাতল ধরে আমি উঠে পড়েছিলুম। তার পর ফিরে দেখেছিলুম স্বাতিকে। তার দু চোখের দৃষ্টি তখন বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমি তার কথা ভুল শুনি নি। আমার অতীত আর বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চাইছিল।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে যে সমস্ত ভয় আমার দূর হয়ে গিয়েছিল। জো রায়ের সঙ্গে এবারে স্বাতি যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াক। তার মন নিশ্চয়ই আমার মনে বাঁধা পড়ে গেছে। মনে হয়েছিল, জগতের সেরা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। হোক কথা, হোক কল্পনা। জীবনের চেয়ে স্বপ্নেই যে সুখ বেশি। সে সুখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিতে পেরেছিলুম।

মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। বলল: তোমাকে নিয়ে আর পারি নে।

কেন?

পুরনো কথায় আবার ডুবে গিয়েছ তো!

এও আমার কাছে এক বিস্ময়! স্বাতি এখনও আমার মনটা দেখতে পায় স্বচ্ছ ভাবে। আমার ভাবনার কথা তার কাছে আমি লুকোতে পারি নে। আমি কোন উত্তর দিতে পাবলুম না দেখেও স্বাতি হাসল।

আর ঠিক এই সময়েই আমি বালুরামকে দেখতে পেলুম। বেশ হন্তদন্ত ভাবে সে আসছে। সঙ্গে তার সামান্যই মালপত্র ছিল—চাদর জড়ানো একটা বালিশ আর একটা বড় ব্যাগ। এ দুটো হাতে করে সে আসছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল: দেরি হয়ে গেছে নাকি?

বললুম: না।

আসুন। তাহলে উঠে বসি।

বলে সে গাড়িতে উঠে পড়ল। আমিও তাকে অনুসরণ করে গাড়িতে উঠে পড়লুম।

ট্রেন ছাড়বার সত্যিই দেরি ছিল না। গুছিয়ে বসতে না বসতেই ট্রেন ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। বালুরাম একটু হাঁপাচ্ছিল, বলল: সকাল আটটা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: সে কি, আমি তো জানি এ ট্রেন শেষরাতে যোধপুরে পৌঁছয়!

বালুরাম হেসে বলল: রাত সাড়ে চারটেয় কিন্তু ছাড়ে সকাল আটটায়। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায়।

স্বাতি বলল: তবে তো ভালই হল, আপনার কাছে আমরা অনেক কথা জানতে পারব।

আমি বললুম: দেবীকুণ্ডের কথা আপনি শেষ করেন নি।

বালুরাম কিছু লজ্জিত ভাবে বলল: একটু তাড়া ছিল বলেই শেষ করতে পারি নি।

স্বাতি বলল: এইবারে বলুন।

আপনারা কি টুরিস্ট অফিসে গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলুম।

তার কাছেই টাউন হল। সেখান থেকে সোজা পূর্ব দিকে চলে গেলেই দেবীকুণ্ডে পৌঁছে যেতেন। বিকানেরের রাজা ও রাজ-পরিবারের লোককে এইখানে দাহ করা হয়। পঞ্চম রাজা রাও কল্যাণ সিংহজী থেকে শুরু করে শেষ রাজা শার্দুল সিংহজী পর্যন্ত সমস্ত রাজা রানী ও রাজকুমারদের সমাধি আছে এইখানে। সতী হবার মাহাত্ম্য তো আপনারা জানেন! এখানকার অনেক রানী স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। বাঙলার রামমোহন রায়ের আন্দোলনে এই আইন হবার পরে এখানেও এই প্রথা বন্ধ হয়েছে। কী নিষ্ঠুর প্রথা বলুন!

স্বাতি বলল : জোর করে পুড়িয়ে মারা সত্যিই নিষ্ঠুর। কিন্তু যাঁরা সত্যিকার শোকে সহমরণে গেছেন, তাঁদের জন্যে কি সমাজ দায়ী!

আমি বললুম : দায়ী বৈকি। চোখের সামনে কেউ পুড়ে মরবে, আর সবাই হাত গুটিয়ে তাই দেখবে!

এ নিয়ে একটা বির্তক হতে পারত, কিন্তু স্বাতি বলল : এ নিয়ে তর্ক করব না। এটা মনের জিনিস, আর সকলের মন সমান নয়।

তার পরে বালুরামের দিকে চেয়ে বলল : বিকানেরের আশে-পাশে আর কী দেখবার আছে বলুন।

বালুরাম বলল : আছে অনেক কিছু। তার মধ্যে প্রধান হল দেশলোক, গজনের ও কোলায়াৎজী।

ঠিক এই সময়েই একটা ঝাঁকানি খেয়ে বালুরাম থমকে থেমে গেল। বাহিরের দিকে তাকিয়ে বলল : ট্রেন ছাড়ল।

চকিতের জন্য একটু বিষণ্ণ হয়েছিল দৃষ্টি, তার পরেই সামলে নিয়ে বলল : দেশলোক এই পথেই পড়বে। যোধপুরের দিকে কুড়ি মাইল দূরে একটি রেলওয়ে স্টেশনে নেমে এই তীর্থ দর্শন করতে হয়। পাথরের উপরে সুন্দর কারুকার্য করা দোতলা মন্দির। মাঝখানে বড় গম্বুজ, পাশেও ছোট গম্বুজ আছে।

মন্দির কোন্ দেবতার ?

কর্ণীজীর।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : এ নামের কোনও দেবতার কথা তো শুনি নি!

বালুরাম বলল : কর্ণীজী তো দেবতা নন। তিনি ছিলেন একজন চারণের মেয়ে। তাঁর তৈরি মন্দির নয়, তাঁর নামেই মন্দির, তাঁরই পূজা হয় মন্দিরে।

এ কথা শুনে আমিও আশ্চর্য হলুম। বললুম : একজন চারণের মেয়ে এখন দেবতায় পরিণত হয়েছেন!

বালুরাম বলল : এ তো আজকের কথা নয়, পাঁচশো বছর আগেই তিনি দেবতার আসনে বসেছিলেন।

তার পরে শোনাল কর্ণীজীর কথা। ১৪৪৪ সালের আশ্বিন মাসে যোধপুরের এক গাঁয়ে চারণ মেহোজীর সপ্তম কন্যার জন্ম হয়েছিল। নাম তার রিধুবাঈ। সাতাশ বছর বয়সে এই কন্যার বিবাহ হল আর এক গ্রামের দীপোজীর সঙ্গে। কিন্তু আট মাস পরেই সেই কন্যা তার স্বামীকে দেবী রূপে দর্শন দিয়ে বললেন, বংশ রক্ষার জন্য তুমি অন্য বিবাহ কর, আমি চললাম। রিধুবাঈ দেশলোকে চলে এলেন। তাঁরই নাম হল কর্ণীজী। যোধপুর থেকে বেরিয়ে রাও বীকাজী দেশলোকে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। কর্ণীজী বলেছিলেন, যোধার চেয়েও তোমার প্রতাপ বেশি হবে, আর অনেক রাজা হবে তোমার চাকর। লোকের বিশ্বাস যে তাঁর আশীর্বাদেই বীকাজী বিকানের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অষ্টম রাজা সুর সিংহ এই মন্দির নির্মাণ করেন, আর মহারাজা গঙ্গা সিংহজী নির্মাণ করে দিয়েছেন অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত একটি তোরণ দ্বার। মন্দিরে একটি সোনার ছত্র আছে, সেটি দিয়েছেন মহারাজ জোরাবর সিংহ।

আমি বললুম : কর্ণীজীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী বোধহয় প্রচলিত আছে!

বালুরাম বলল : জানি নে।

এই উত্তর শুনে আশ্চর্য হলুম। একজন সাধারণ মহিলা এই ভাবে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন জেনে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু বিকানেরের লোক বোধহয় সে কথা ভুলে গেছে। কর্ণীজীকে এখন তারা দেবী বলেই জানে।

বালুরাম বলল : একজন চারণ এই মন্দিরের পূজারী। বছরে দুবার আশ্বিন আর চৈত্রে—মেলা বসে দেশলোকে।

তার পরেই ভদ্রলোক হেসে উঠল।

স্বাতি বলল : হাসছেন যে ?

হাসতে হাসতেই বালুরাম বলল : মন্দিরে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য দেখে আপনারা পাগল হয়ে যেতেন। সব সময় আপনাদের সতর্ক থাকতে হত।

মানে ?

বলে স্বাতি সবিস্ময়ে তাকাল বালুরামের দিকে।

বালুরাম বলল : যদি কোনও ইঁদুর আপনার গায়ে উঠে পড়ে তো তা সৌভাগ্য বলে মনে করবেন।

স্বাতি যেন শিউরে উঠল। তাই দেখে বালুরাম সকৌতুকে বলল : সাদা ইঁদুর দেখতে পেলেও তা সৌভাগ্য মনে করবেন। কিন্তু কোনও ইঁদুরের গায়ে পা পড়লেই বিপদ। আর পায়ের চাপে চেপ্টা হয়ে মরে গেলে কী দণ্ড দিতে হয় জানেন ?

বললুম : কী ?

সোনার ইঁদুর তৈরি করে মন্দিরে ভেট দিতে হয়।

স্বাতি বলল : আমার গা শিরশির করছে।

আর আমি বললুম : এই বারে অন্য জায়গার কথা বলুন।

বালুরাম বলল : বিকানেরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গজনের।

তার পরেই বলল : পথটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমরা এখন দক্ষিণে যোধপুরের দিকে যাচ্ছি। এই রেলপথের উপরেই দেশলোক। যে সড়ক পথ নাগোরের উপর দিয়ে যোধপুরে গেছে, দেশলোক সেই পথের উপরে। গজনের আর কোলায়াৎ দক্ষিণ পশ্চিমে। বিকানের থেকে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে জয়সলমেরের দিকে গেছে, গজনের সেই পথের উপরে কুড়ি মাইল দূরে। আর সেখান থেকেই একটা ভিন্ন পথে আরও মাইল দশেক এগিয়ে গেলে কোলায়াৎ।

স্বাতি বলল : এ সব জায়গার নাম আমরা শুনি নি।

বালুরাম বলল : এমন কিছু বিখ্যাত নয় বলেই শোনেন নি। অথচ বিকানের রাজ্যে এগুলোই হল বিখ্যাত জায়গা।

আমি বললুম ঃ দেখবার কী আছে বলুন।

বালুরাম বলল ঃ একটি সুন্দর লেকের ধারে মহারাজাব তুঙ্গর নিবাস মহল। আর চাবি ধাবেব সংরক্ষিত স্থানে আছে অসংখ্য স্যাণ্ড্ গ্রাউজ। মহাবাজাবা এখানে পাখি শিকাবে আসতেন। শিকাবেব শখ থাকলে আপনাবাও যেতে পাবেন। লালগড প্যালেসে মহারাজাব সেক্রেটাবির কাছে অনুমতি নিতে হবে। গজনের প্যালেসের একাংশে হোটেল আছে। সেখানে থাকবাব অনুমতিও পাবেন। মাথা পিছু একশো টাকা, দুজনেব দেডশো, তাব ওপবে সার্ভিস চার্জ শতকবা দশ টাকা।

স্বাতি হেসে বলল ঃ বেশ সস্তা।

বালুবাম বলল ঃ বিদেশীবা সস্তাই ভাবে।

স্বাতি আমাব দিকে চেয়ে বলল ঃ স্যাণ্ড্ গ্রাউজ কি বালি হাঁস?

বললুম ঃ বলতে পাবব না।

বালুবাম আমাদেব বাঙলা কথা বুঝতে পেরেছিল। বলল ঃ আমবা ভডতিতব বলি।

স্বাতি বলল ঃ আমরা বলি তিতিব।

আব শীতেব সময় সাইবেবিয়া থেকে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ইংবেজীতে বলে সাইবেবিয়ান গীজ্, আব স্থানীয লোক বলে মুর্গাবী।

বালুরাম একটু থেমে বলল ঃ শীতেব সমযে এলে এ জায়গাটা আপনাদের মন্দ লাগত না। এই পথেই কোডমঙ্গেসব নামে একটি জায়গা আছে। একটি ঐতিহাসিক সবোবরের জন্য বিখ্যাত। তার তীরে ভৈরবেব মন্দির। এ সবের কিংবদন্তী বলে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে একটি প্রাচীন বাজবাড়িতে এখন একটি মোটেল হয়েছে। তাতে তিনখানি ঘর আছে। দেশী শিকারীরা এইখানে থেকেই শিকাব করে।

স্বাতি বলল ঃ বন্দুকের নাম শুনেই আমরা ভয় পাই।

আমিও।

তবে এইবারে কোলায়াতের কথা বলুন।

বালুরাম বলল : এটি তীর্থস্থান। কপিলমুনির মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

স্বাতি বলল : কপিলমুনির মন্দির তো গঙ্গাসাগরে!

বালুরাম বলল : আমরা জানি কপিলমুনিব আশ্রম ছিল এইখানে। এখানেই তিনি তপস্যা করেছিলেন আর মায়ের জীবন দান করেছিলেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : কপিলমুনি মায়ের জীবন দান করেছিলেন, এ রকম কোন গল্প আমার জানা নেই। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল একজন বিখ্যাত ঋষি। তিনি ছিলেন কর্দম প্রজাপতির পুত্র, তাঁর মায়ের নাম দেবহুতি। তিনি তাঁর মাকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ অষ্টাঙ্গযোগ ও কলা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর নিরুপদ্রবে তপস্যাব জন্যে পাতালে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন।

বালুরাম ভয়ে ভয়ে বলল : আমি এ সবের কিছু জানি না।

আমি হেসে বললুম : আপনি কোলায়াতের কথা বলুন।

বালুরাম বলল : কোলায়াতে একটি সুন্দর জলাশয় আছে। তার বাঁধানো ঘাট, নাম কপিল ঘাট। কপিলমুনির মন্দির ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে প্রধান হল পঞ্চমন্দির আর গঙ্গাজীর মন্দির। কার্তিকের পূর্ণিমায় মস্ত বড় মেলা হয়। অনেক সাধুসন্ত আসেন। যাত্রীদের জন্যে ধর্মশালা আছে অনেক। আপনারা এলে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কপিল ভবনে থাকবেন।

স্বাতি বলল : রেলের স্টেশন আছে নাকি!

বালুরাম বলল : বলতে ভুলে গেছি, বিকানের থেকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন গজনের হয়ে কোলায়াৎ পর্যন্ত এসেছে।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাতেই বালুরাম লজ্জিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল : এইবারে শোবার আয়োজন করা যাক।

১৪

বালুরাম আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে এই ট্রেন শেষরাতে যোধপুরে পৌঁছবে, কিন্তু তার জন্যে উদ্বিগ্ন ভাবে রাত কাটাবার দরকার নেই। ট্রেন যোধপুরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ মানে কয়েক ঘণ্টা। কাজেই বাকি রাতটুকু ট্রেনেই ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

বেশ একটু খট্‌কা লেগেছিল মনে, তাই সময়টা জেনে নিয়েছিলুম। ভোর চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমরা যোধপুর স্টেশনে পৌঁছব। কলকাতায় এ সময়কে শেষরাত বলে না। এ দিকে সূর্য অনেক দেরিতে ওঠে বলেই এরা সাড়ে চারটেকে শেষরাত বলছে। সকাল আটটার পরে এই ট্রেনই মারবাড় যাবে।

কিন্তু যোধপুরে ট্রেন পৌঁছবার পরে আমাদের আর শুয়ে থাকতে হয় নি। বোধহয় একটু দেরিতেই এসেছিল। যাত্রীর কলরবে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমাদের। আর তার পরে জেগে শুয়ে থাকবার ইচ্ছা হয় নি। আমরা উঠে পড়েছিলুম।

বালুরাম অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: জাগিয়ে দেবে ?

বললুম: না জাগিয়ে তো নামবার উপায় নেই !

কিন্তু—

মায়া হচ্ছে ঘুম ভাঙাতে ?

স্বাতি বলল: কাল তার অনেক পরিশ্রম হয়েছে।

হেসে বললুম: দেহের চেয়ে মনের পরিশ্রম হয়েছে বেশি। দুদিক সামলানোর পরিশ্রম।

ঠিক এই সময় বালুরামের কণ্ঠস্বর শুনে আমরা চমকে উঠলুম।

চোখ বুজেই বালুরাম বলল : আমার জন্যে আপনারা ভাববেন না। ওয়েটিং রুমে গিয়ে আপনারা মুখ হাত ধুয়ে নিন। আর একটু গড়িয়ে নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আসছি।

বুঝতে কষ্ট হল না যে বালুরাম জেগেই ছিল। তাই বললুম : ওয়েটিং রুমে কেন, স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই ?

বালুরাম বলল : আছে বৈকি। কিন্তু শুধু শুধু পয়সা খরচ করবেন কেন ! রাতের ট্রেনে তো জয়সলমের যাবেন, আর সারাদিন শহরে ঘুরবেন। একটুখানি বিশ্রামের জন্যে ওয়েটিং রুমই যথেষ্ট।

কথাটা মিথ্যা নয়। পয়সার মূল্য যে এরা আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, এই উপদেশ দিয়ে বালুরাম তা প্রমাণ করল। স্বাতি বলল : সেই ভাল। আমরা ওয়েটিং রুমেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। চা খাব একসঙ্গে।

বালুরাম বলল : চা তো আমি খাই নে। তবে স্টেশনেই চা পাবেন। ভাল রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে।

স্বাতি একজন কুলি ডেকে নিল। তার মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আমরা নেমে পড়লুম।

প্ল্যাটফর্মের উপরে একটি দোতলা বাড়ির নিচের তলায় প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুম। বেশ প্রশস্ত জায়গা। ভিড়ও কম। স্বাতি বলল : জিনিসপত্র ক্লোকরুমেই জমা করে দাও না। স্নানের সরঞ্জাম এই ব্যাগেই আছে।

পরামর্শটা মন্দ নয়।

বলে আমি কুলিকে নিয়ে ক্লোকরুমে চলে গেলুম।

ক্লোকরুমে মালপত্র জমা দেবার নিয়ম কানুন আমাদের জানা আছে। নাসা স্টেশনে এই কাজ করে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। সুটকেশে তো বটেই, হোল্ডলেও একটা তালা ঝোলাতে হয়। ঠিক এই জন্যেই আমরা এমন একটা হোল্ডল সঙ্গে নিই যাতে তালা লাগানো যায়। কিন্তু যোধপুরে এসে হেরে

গেলুম। এরা বলল, সুটকেশের এক দিকে তালা দিলে চলবে না, দুদিকে তালা দিতে হবে।

আমাদের সুটকেশের এক দিকে একটি তালা আছে, দুদিকে নেই। যে বাবুটি আপত্তি করল, মিষ্টি কথায় সে মানল না। অন্য দিকটা টেনে দেখিয়ে দিল যে সে দিক দিয়ে জিনিসপত্র বার করে নেওয়া সম্ভব। তাকে বোঝাবাব চেষ্টা করলুম যে বাক্সটা যখন তোমার মতো সৎ ব্যক্তির কাছেই থাকছে, তখন আমরা নিশ্চিন্ত আছি। সে রকমের ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু সে বলল, আইন হল আইন, তা সবাইকে মানতে হবে।

এর পরে মেজাজ গরম না করে উপায় নেই। বললুম: আইনটা দেখাও তো যে দুদিকে দুটো তালা ঝোলাতে হবে।

সেও মাথা গরম করে বলল: দেখাব না, যা ইচ্ছে হয় করুন।

এর পরে আমি কী করতে পারি! এই সময়ে এর ওপরওয়ালা কাউকে পাওয়া যাবে না। পেলেও সে তার বাবুকেই সমর্থন করবে। আর আমি আর দশজনের মতো স্টেশন মাস্টারের কাছে কমপ্লেন বুক চেয়ে নিয়ে খুব কড়া করে একটা অভিযোগ লিখতে পারি। কিন্তু তাতে আমার বিপদের কোন সুবাহা হবে না।

এখন একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে আমরা অবাঞ্ছিত। একটা রিটায়ারিং রুম দখল করলে এই মালপত্র আর ক্লোকরুমে জমা করতে হবে না। কুলি আমার দিকে চেয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। আব আমি রিটায়ারিং রুমে যাবার নির্দেশ দেব কিনা স্থির করবার আগেই স্বাতিকে দরজার কাছে দেখতে পেলুম।

কাছে এসে স্বাতি বলল: দেরি হচ্ছে কেন?

বললুম: কী ঝামেলা দেখ।

বলে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললুম।

ও এই ব্যাপার!

বলে স্বাতি তার হাতব্যাগের ভিতর থেকে চাবির থোকা বার করে সুটকেশের গা তালা দুটো বন্ধ করে দিল। বলল: দেখুন তো, আর খোলা যাচ্ছে কিনা!

ভদ্রলোক টেনেটুনে দেখে বলল: ঠিক আছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। আর আমি এমন বিরাট একটা সমস্যার এত সহজে সমাধান হয়ে গেল বলে তার পরিহাসের হাসি নিঃশব্দে হজম করে ফেললুম।

ভদ্রলোক আমাদের মালের রসিদ তৈরি করে ফেলল। স্বাতি ধন্যবাদ দিয়ে সেই রসিদ নিয়ে আমাকে বলল: এসো এইবারে।

ওয়েটিং রুমে একে একে আমরা মুখ হাত ধুয়ে স্নান সেরে নিলুম। ভ্রমণে বেরিয়ে সকালে স্নান করে বেরোবার একটা আনন্দ আছে। সারাদিন নিশ্চিন্ত। দুপুরে আহার না জুটলেও ভাবনা নেই। সন্ধ্যাবেলায় আর একবার স্নান করবার সুযোগ পেলে সারাদিনের ক্লান্তি ও গ্লানি সহজে দূর হয়ে যায়।

স্বাতি বলল: আমরা কি চায়ের জন্যে বেরিয়ে পড়ব, না অপেক্ষা করব বালুরামবাবুর জন্যে?

এর উত্তর আমাকে দিতে হল না। দরজার সামনে বালুরামকে দেখতে পেয়ে বললুম: আপনি একশো বছর বাঁচবেন।

কেন?

এই মুহূর্তে আমরা আপনার কথাই ভাবছিলুম।

তৈরি হয়ে নিয়েছেন তো! তবে আসুন।

বলে ভদ্রলোক আমাদের রিফ্রেশমেন্ট রুমে ডেকে নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে বলল: আমি আপনাদের সঙ্গে বসব না, এ বেলায় আপনাদের সঙ্গে থাকতেও পারব না। নিজের চাকরিটা বাঁচিয়ে দুপুর বেলায় আপনাদের কাছে আসব—এইখানে, এই ওয়েটিং রুমে।

স্বাতি বলল: এখানে আমরা কী দেখব, সে কথা জানতে পারলেই চলবে।

আমি বললুম : মোটামুটি আমি আন্দাজ করে নিয়েছি।

বলুন।

বলে বালুরাম আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : যোধপুর ফোর্ট, যশোবন্ত থারা আর মাণ্ডোর।

বালুরাম খুশী হয়ে বলল : ব্যস ব্যস, এ বেলায় এই যথেষ্ট। আর ফেরার পথে উমেদ ভবন প্যালেসও দেখে আসবেন। এখানে স্কুটার রিক্সা পাওয়া যায়। তাতে উঠে বসলে পাহাড়ের উপরে দুর্গের দরজায় আপনাদের পৌঁছে দেবে।

বালুরাম একটা টেবলে আমাদের বসিয়ে দিয়ে বলল : এইবারে আমাকে ছুটি দিন।

স্বাতি বলল : আপনি যখন চা খান না, তখন—

বালুরাম হাসতে হাসতে বিদায় নিল।

স্টেশনের বাহিরে এসে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ছোটখাট একটি বাজার বসেছে এইখানে। স্বাতি বলে উঠল : দেখ দেখ।

জনকয়েক রাজস্থানী স্ত্রীলোক নানা রঙের চুড়ি বিছিয়ে বসেছিল পাশাপাশি। স্ত্রী পুরুষের ভিড় হয়েছে সেখানে। খানিকটা এগিয়ে ফল মূলের দোকান। তার পরেই সদর রাস্তা, তার দুধারে দোকান-পাট। স্টেশনের সামনে অনেকগুলি টাঙ্গা ও অটো রিক্সা যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কয়েকজন এগিয়েও এসেছিল। কিন্তু তাদের উপেক্ষা করে আমরা দোকানপাট দেখতে দেখতে এগিয়ে এসেছিলুম। এইবারে একখানা অটো রিক্সার সঙ্গে দরাদরি করে উঠে বসলুম। প্রথমেই আমরা ফোর্ট দেখতে যাব।

একটু গুছিয়ে বসেই স্বাতি তার হাতের ব্যাগ খুলল। যোধপুরের সম্বন্ধে একখানি সরকারী পুস্তিকা বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল : একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

বললুম : বিশেষ কিছু নেই।

তবু দেখে নাও।

একটুখানি নজর দিতেই সব কথা মনে পড়ে গেল। ভারত স্বাধীন হবার আগে এই দেশীয় রাজ্যের নাম ছিল মারবাড়, রাজধানী ছিল এই যোধপুর শহরে। ১৪৫৯ সালে এই শহর পত্তন করেছিলেন রাও যোধা নামে একজন রাঠোর প্রধান। এঁরা রাজপুত এবং রামের বংশধর বলে দাবী করতেন।

এই মারবাড় রাজস্থানের সবচেয়ে বড় রাজ্য ছিল। আয়তন ছিল পঁত্রিশ হাজার বর্গমাইল। কিন্তু বেশির ভাগ ভূমিই উষর, বালিয়াড়িতে পূর্ণ। রাজ্যের উত্তরাংশ থর মরুভূমির অন্তর্গত।

শহরটি একটি বালিপাথরের পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। আর চারশো ফুট উঁচু একটি শৈলের উপরে নির্মিত হয়েছে যোধপুর দুর্গ। এ রকমের সুন্দর দুর্গ নাকি রাজস্থানে আর নেই। শহরের পথে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরেই আমরা এই দুর্গটি দেখতে পেলুম।

পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো পথ আছে। সেই পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। শহর থেকে দুর্গে ওঠবার জন্য জয় পোল আর ফতে পোল নামে দুটো দ্বার আছে। এর মাঝে মাঝে আরও অনেক দ্বার ও প্রাচীর আছে। দুর্গ রক্ষার জন্যে এই সব নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের ভিতরে আছে অনেকগুলি প্রাসাদ।

স্বাতি আমার হাত থেকে পুস্তিকাখানি কেড়ে নিয়ে বলল: এইবারে সামনে দেখ।

সমতল ভূমি ছেড়ে আমরা এখন পাহাড়ে উঠছি। প্রাচীর আর গেটগুলি পেরিয়ে যাচ্ছি একটার পর আর একটা। এক সময়ে পথের ডান দিকে একটি সুন্দর সৌধ দেখতে পেলুম। সাদা মার্বল পাথরে তৈরি এই সুন্দর সৌধটি দেখে স্বাতি বলল: এটা কী?

বললুম: ছবিতে এর নাম দেখেছি যশোবন্ত থারা।

আমি যে ঠিকই চিনেছিলুম, তা বুঝতে পারলুম অটো রিক্সাওয়ালার কথায়। সে বলল: ফেরার পথে ওখানে যাব।

আর একটুখানি উঠেই আমরা দুর্গের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। বিশাল দরজা, কিন্তু দরজার দিকে না এগিয়ে স্বাতি পাহাড়ের ধারে এগিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করে এসে পথের অন্য ধার থেকে নিচের দৃশ্য দেখলুম যেন আকাশ থেকে যোধপুর শহর দেখতে পাচ্ছি। অনেক নিচে খেলার ঘরের মতো ছোট ছোট ঘর বাড়ি দিগন্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত শহরের মানচিত্র সঙ্গে থাকলে এখান থেকেই শহরটা চিনে নিতে পারতুম।

দুর্গের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম যে এটি কোন পাহাড়ের গায়ে নয়, একটি খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছে নিচে থেকে উপরে উঠবার জন্যে দ্বিতীয় পথ চোখে পড়ল না পাহাড়ের গা এমন চাঁচা-ছোলা যে কোন মানুষের পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

স্বাতি তার ক্যামেরা খুলে ছবি তুলল একখানা। বলল : এই দুর্গটি অন্য দুর্গের মতো নয়।

বললুম : পাহাড়ের উপরে দুর্গ তো এই রকমই হয়।

স্বাতি বলল : চিতোর গড় বা অম্বরের দুর্গ কি এই রকম? পাহাড় সেখানে পাহাড়ের মতো।

আর এখানে?

এখানে মনে হচ্ছে, বিরাট একখণ্ড পাথরের উপরে দুর্গ।

পাথর কি এত বড় হয়?

স্বাতি বলল : পাহাড়ের গায়ে গাছপালা থাকলে একে পাথর বলতাম না।

তার পরেই তার দৃষ্টি পড়ল কয়েকজন রাজস্থানী স্ত্রী-পুরুষের দিকে। তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছিল। দুটি পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। দূরের গ্রাম থেকে দুর্গ দেখতে এসেছে বলে মনে হল। সাদা দাড়ি গোঁফ, একজনের দাড়ি দু ভাগ করে উপর দিকে তোলা।

পরনে ধুতি ও সাদা জামা, মাথায় পাগড়ি। স্ত্রীলোকটি ঘাগরার উপরে লম্বা ঝুলের জামা পরেছে। তার মাথায় ওড়না। স্বাতি তৎপর ভাবে বলল : এদের একটা ছবি তুলতে হবে।

আমি হাত তুলে তাদের দাঁড়াতে বললুম। স্বাতি ছবি তুলতে একটুও দেরি করল না। তার পরে আমার দিকে ফিরে বলল : এদের অজ্ঞাতসারে তুলতে পারলে ছবিটা সত্যিই ভাল হত।

আমি বললুম : তাহলে ওদের ফিরে গিয়ে আবার আসতে বলব ?

তাতে লাভ নেই। ওরা আর সহজ ভাবে এগিয়ে আসতে পারবে না।

বলতে বলতে স্বাতি নিজেই দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমি তার পিছনে এগিয়ে গিয়ে বললুম : সমস্ত দুর্গটা ঘুরে দেখবে নাকি ?

স্বাতি হেসে বলল : না। মোটামুটি একটুখানি দেখেই ফিরে আসব।

বললুম : আমি তাহলে এই ছায়ায় একটুখানি বসছি।

বুড়ো হয়ে গেলে ?

বলে ফিরে এসে কয়েকখানা পুস্তিকা আমার হাতে দিয়ে গেল।

আমি এই সব খুলে প্রয়োজনীয় সংবাদ জানবার চেষ্টা করলুম। না, মরুভূমির সম্বন্ধে কোন কথা এতে নেই। আছে শুধু বৃষ্টিপাতের কথা। বিকানেরে ও জয়সলমেরে বৃষ্টিপাত হয় বছরে আটাশ সেন্টিমিটার এবং যোধপুরে একত্রিশ সেন্টিমিটার। ইঞ্চির হিসাবে এগারো থেকে বারো ইঞ্চির মতো। বাঙলা বা আসামের কোন কোন জায়গায় এক দিনেই এর চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

এই তিনটি শহরের লোকসংখ্যাও আছে। বিকানেরে লোকসংখ্যা একলক্ষ নব্বুই হাজারের কিছু কম, যোধপুরে তিন লক্ষ আঠারো হাজারেরও বেশি, আর জয়সলমেরে মাত্র ষোল হাজার পাঁচশো আটান্নজন লোকের বাস। রাজস্থানী ও হিন্দী ভাষার

প্রচলন তিনটি শহরেই আছে। বিকানের ও যোধপুরে ইংরেজীও চলে, কিন্তু জয়সলমেরে ইংরেজী অচল বলে দেখলুম।

এই পুস্তিকায় অন্যান্য শহর থেকে যোধপুরের দূরত্ব ও যানবাহনের কথাও আছে। যোধপুর থেকে আজমীর ও জয়পুব হয়ে দিল্লী ও আগ্রায় যাওয়া যায়। জয়পুব দুশো ন মাইল দূবে। সেখান থেকে দিল্লী একশো ষাট মাইল আর আগ্রা একশো আটষট্টি মাইল। উদয়পুব একশো বিরানব্বুই মাইল দূরে, আর মাউণ্ট আবুর দূরত্ব একশো পঁয়ষট্টি মাইল। এর চেয়ে বেশি দূবে জয়সলমের। আগে পোকারন পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে বাসে চড়তে হত। এখন এই একশো আশি মাইল পথ ট্রেনেও যাওয়া যায়, বাসে যাবারও অসুবিধে নেই। বিকানেবেও বাসে যাওয়া সুবিধেব।

যোধপুরে অটো রিক্সার অভাব নেই। টাঙ্গাও অনেক, ট্যাক্সিও আছে। বিকানেরেও ট্যাক্সি আছে, কিন্তু অটো রিক্সা নেই। জয়সলমেরে শুধু টাঙ্গা আছে বলে লেখা আছে। তাতেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে পৌছবার পবে দুর্ভোগের কথা আগে বুঝতে পারি নি।

স্বাতি ফিবে এল এই সময়েই। তাকে দেখতে পেয়ে বললুম : দেখা হয়ে গেল ?

স্বাতি বলল : তুমি একা বসে আছ বলেই তাড়াতাড়ি ফিবে এলাম।

কী দেখলে ?

পঁচিশ পয়সার টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হয়। আমি শুধু মন্দিরে একটা প্রণাম করে এলাম।

ফেরার পথে আমরা যশোবন্ত থারার সামনে এসে নামলুম। পথের ধারে দাঁড়াল অটো রিক্সা। আমরা পায়ে হেঁটে ভিতরে এলুম। পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি জমির মাঝে সাদা মার্বল

পাথরের এই সমাধি সৌধটি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের। একটি অট্টালিকা, একজন রাজার সমাধি। রাজস্থানের অন্যান্য রাজ্যে একটি সমাধি ক্ষেত্রে অনেক রাজার সমাধি। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখছি। যশোবন্ত সিংহের নামে এই সুন্দর সমাধি সৌধটি কেন এখানে নির্মিত হয়েছিল, সরকারী পুস্তিকায় তাব কোন হদিস নেই।

আমরা বাহিরে ঘুরে ঘুরে এই সমাধির শোভা দেখলুম। ভিতরে প্রবেশের দরজা ছিল বন্ধ। ভিতরে নাকি রাজবংশলতা দেখতে পাওয়া যায়। এই সৌধের চারি পাশে একটি উদ্যান রচনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখন তা শুকনো। এখন এর সৌন্দর্য কোন যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

পথে এসে আমরা আবার অটো রিক্সায় উঠলুম।

১৫

এবারে কোথায় যাব ?

মাণ্ডোরে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল : সেখানে কী আছে ?

বললুম : তোমার বইএ পড়েছি যে যোধপুরেব আগে সেখানেই ছিল মারবাড় রাজ্যের রাজধানী।

সে জায়গা বুঝি অনেক দূরে ?

শহর থেকে দূরত্ব ছ মাইলের কিছু বেশি।

আর এ জায়গার দূরত্ব ?

চার মাইলের কম। কিন্তু ভেবো না যে এখান থেকে দু-তিন মাইল গেলেই মাণ্ডোরে পৌঁছব।

কেন ?

হেসে বললুম : কোন্ জায়গা কোন্ দিকে তা লেখা নেই। শহরের কোন নক্সাও দেখি নি।

স্বাতি বলল : বালুরামবাবুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে ভাল হত।

পাহাড়ের উপর থেকে আমরা নেমে এসেছিলুম। এইবারে সমতল পথে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আকাশের সূর্য দেখে আমি বললুম : মাণ্ডোর শহর উত্তর দিকে।

স্বাতি আকাশের দিকে চেয়ে হেসে বলল : কিন্তু ইতিহাসের কথা তো আকাশে লেখা নেই, তুমি কি ইতিহাস ভুলে গেছ ?

বললুম : যোধপুরের ইতিহাস আমার জানা নেই, কিন্তু এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটা কথা আমার মনে পড়ছে।

স্বাতি বলল : তাই বল।

বললুম ঃ কনৌজের রাজা জয় চাঁদের মৃত্যুর পরে সেই বংশেরই একজন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

তুমি কি ইতিহাসের কথা বলছ ?

ইতিহাসে আছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু মনে হচ্ছে টড সাহেবের রাজস্থানে এই কথা পড়েছি।

স্বাতি বলল ঃ এমন সংক্ষেপে নয়, যতটা মনে আছে সবটাই বল।

বললুম ঃ স্কুলের বইএ পড়েছিলুম যে একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গাড়োয়াল বংশের চন্দ্রদেব কনৌজের রাজা হন। এই বংশেরই জয়চ্চন্দ্র সিংহাসনে বসেন ১১৭০ সালে। দিল্লীর সিংহাসনে পৃথ্বিরাজ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে পরিচিত। কাজেই জয়চ্চন্দ্রের তিনি চিরশত্রু।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল ঃ তুমি কি সংযুক্তার গল্প বলবে ?

বললুম ঃ এই গল্পের দুটো রূপ আছে। ইতিহাসে পড়েছিলুম যে জয়চ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করে সব রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আর পৃথ্বিরাজ আসেন নি বলে তাঁর একটা পাথরের মূর্তি তৈরি করে দ্বারীর বেশে দরজায় স্থাপন করেছিলেন। এই সভাতেই সংযুক্তার স্বয়ম্বর হয়। সংযুক্তা সেই পাথরের মূর্তির গলাতেই মালা দেন। পৃথ্বিরাজ ছদ্মবেশে কনৌজেই উপস্থিত ছিলেন এবং সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে যান।

স্বাতি বলল ঃ এই গল্পই তো আমরা জানি।

টডের রাজস্থানে গল্পটা একটু অন্য রকম পড়েছিলুম। ঘটনাটা আর একটু বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে !

অনেক দিন আগের পড়া বলে অনেক কথা ভুলেও গেছি। এইটুকু মনে আছে যে জয়চাঁদের আমলে উত্তর ভারতে ছিল চার জন শক্তিশালী রাজা—কনৌজে জয়চাঁদ। এঁরা কনৌজিয়া রাঠোর

বলে পরিচিত; দিল্লীতে তুয়ার বা তোমর বংশের পরে পৃথিরাজ চৌহান; মেবারে গিহ্লোট বংশ ও অনহিলবাড়ায় সোলাঙ্কি বংশের রাজারা। জয়চাঁদের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেয়ে সামন্ত রাজাদের নিয়ে সবাই এলেন কনৌজে, এলেন না দিল্লীর পৃথিরাজ ও মেবারের সমর সিংহ। তাঁরা বললেন যে জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নয়। জয়চাঁদ বললেন, এই কথা! তার পরে দুজনের সোনার মূর্তি তৈরি করে দরজার দুধারে বসিয়ে রাখলেন। এই অপমানের কথা দিল্লীতে পৌঁছলেই পৃথিরাজ বললেন, এর উপযুক্ত শাস্তি দেব—জয়চাঁদের যজ্ঞ নষ্ট করে তার কন্যাকে হরণ করে আনব।

স্বাতি বলে উঠল: সংযুক্তার স্বয়ম্বরের কথা নেই?

নেই বলেই মনে হয়। অন্তত পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

তার পর?

পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল পৃথিরাজের সঙ্গে জয়চাঁদের। অসংখ্য রাজপুত মারা পড়েছিল। যুদ্ধ জয় করে সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথিরাজ দিল্লী ফিরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু দুটি রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর ভয়াবহ হয়েছিল এই গৃহবিবাদের পরিণাম। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই বিবাদ না হলে ভারত মুসলমানের অধীন হত না। হলেও অত শীঘ্র হত না।

স্বাতি বলল: এর পরের ঘটনা মনে পড়ছে। বিদেশী মুসলমানরা এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিতে দেরি করে নি। শিহাবুদ্দিন ঘোরীর কাছে পৃথিরাজ পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। আর পরে জয়চাঁদও পরাজিত হয়েছিলেন।

বললুম: নৌকোয় চড়ে পালাবার সময় গঙ্গায় ডুবে মরেছিলেন।

কিন্তু যোধপুরের প্রতিষ্ঠা কেমন করে হল?

বললুম: ভট্ট কবিদের লেখা অনেকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন টড সাহেব। তারই কোন বইএ আছে যে নয়নপাল নামে একজন রাঠোর কনৌজের রাজা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন

জয়চাঁদের বংশেরই রাজা। কিন্তু জয়চাঁদের মৃত্যুর পরে আর যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা ফিরে আসেন রাজস্থানের মরুভূমিতে। এঁদের মধ্যেই ছিলেন জয়চাঁদের ভাইপো শিবজী। এই শিবজীই বিশাল মারবাড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

স্বাতি বলল: মারবাড় শব্দটি কোথা থেকে এল বলতে পার?

অনুমান করতে পারি। মরুস্থলী বা মরুদেশ কথাটি মরুবার বা মরুবাড় হয়েছিল বলে মনে করি। তার পরে মরুবাড় শব্দটি মরবাড় বা মারবাড়ে পরিণত হয়েছে। রাজাদের দেশ যেমন রাজবাড়া, তেমনি মরুভূমির দেশ মারবাড়। এই ব অন্তঃস্থ ব, এর উচ্চারণ ওয়। মারোয়াড়। এই ওয়াড় ওয়াড়া বা ওয়াডা ভারতের নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অনহিলওয়াড়া, বিজয়ওয়াডা—

বুঝেছি। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

কী?

কনৌজ থেকে শিবজী মরুভূমিতে চলে এলেন কেন, আর এসেই একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন কী করে?

বললুম: ভট্ট কবিদের লেখায় পাওয়া যায় যে শিবজী দ্বারকা যাত্রা করেছিলেন তীর্থ-মানসে। মরুভূমির উপর দিয়েই যাচ্ছিলেন। অনহিলবাড়ার সোলাঙ্কি রাজার অতিথিও হয়েছিলেন। নানা কারণে তাঁকে ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছে, সোলাঙ্কিদের সাহায্যও পেয়েছিলেন। ১২১১ সালে কনৌজ থেকে তাঁরা বিতাড়িত হয়েছিলেন। তার পরে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগেছিল।

স্বাতি বলল: তীর্থ করতে এসে রাজ্য স্থাপন করল, এ যুক্তি ঠিক মনঃপূত হল না।

বললুম: হবে না। রাজবংশের ছেলে রাজ্য হারিয়ে তীর্থে গিয়ে বাস করবে, এ সত্য হতে পারে না। বরং ভাগ্যান্বেষণে তাদের

মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছিল, এ কথা মেনে নেওয়া সোজা। এ দিকে এসে হয়তো ভেবেছিল, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে আসা যাক, তারপরে চেষ্টা করে দেখা যাবে। এবং এই চেষ্টা করতে গিয়ে মরুদেশটা জয় করাই তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল।

আমাদের অটোরিক্সা তখন মাণ্ডোরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে মনে হল। তাই বললুম: অনহিলবাড়ার সোলাঙ্কিরা সাহায্য করেছিল বলে হয়তো নিজেদের নতুন রাজ্যের নাম তারা মরুবাড়া রেখেছিল। আব রাজধানী স্থাপন করেছিল এই মাণ্ডোরে। এই জায়গার নাম কোথাও মন্দর, কোথাও বা মুন্দর দেখেছি। ইংরেজীতে দেখছি ম্যাণ্ডোর বা মাণ্ডোর।

আমাদের অটোরিক্সা এসে এক জায়গায় দাঁড়াতেই আমরা নেমে পড়লুম। এ জায়গাকে কোন পুরাতন শহর বলে মনে হল না। অটোরিক্সার ড্রাইভারের দিকে তাকাতে সে বলল: এ জায়গাই মাণ্ডোর, এই গেট দিয়ে ভিতরে চলে যান।

ভিতরে প্রবেশ করে মনে হল, আমবা একটা বিশাল উদ্যানেব মধ্যে প্রবেশ করেছি। তারই মধ্যে নানা রকমের ঘর বাড়ি। পরিত্যক্ত রাজধানী বললে আমাদের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা এ রকম নয়। কোন ধ্বংসস্তূপ নেই, কোন প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন নেই, কোন ঘাট-বাঁধানো সরোবর বা ভেঙে পড়া প্রাকার নেই। শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের মাঝে চাষীদের কুঁড়েঘরও দেখতে পাওয়া গেল না। স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি তাই দেখে বললুম: তোমার বইগুলো একবার দাও তো!

স্বাতি নিঃশব্দে তার ব্যাগ থেকে বইগুলো বার করে দিল। আমি তাড়াতাড়ি সে সবের উপর চোখ বুলিয়ে নিলুম। খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এইখানেই আছে যোধপুরের অনেক রাজার সমাধিসৌধ। আর একটি মন্দির আছে, তার নাম 'শ্রাইন অফ থ্রি হাণ্ড্রেড মিলিয়ন গড্‌স্'। একটি ঘরের নাম 'হল্ অফ হিরোস'।

তার মধ্যে ষোলটি বিরাট মূর্তি আছে। ব্যস এই পর্যন্তই, আর কোন দ্রষ্টব্য এখানে নেই।

স্বাতি বলল : তার মানে, মাণ্ডোর এখন একটি বাগান। পুরনো রাজধানী বলা আর উচিত হবে না।

আর একখানি বইএর পাতা উল্টে ঠিক এই কথাই পেয়ে গেলুম। সেখানে এই জায়গার নাম মাণ্ডোর গার্ডেন্‌স্‌।

খানিকটা অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলুম যে উদ্যানের এই অংশেই সেই মন্দির আর 'হল্‌ অফ হিরোস'। 'থ্রি হাণ্ড্রেড মিলিয়ান গড্‌স' মানে ত্রিশ কোটি দেবতা। আমাদের পুরাণে তো দেবদেবীর সংখ্যা ত্রেত্রিশ কোটি। সে যাই হোক, মন্দিরে আমরা কোন দেবতাকেই আবিষ্কার করতে পারলুম না। তার বদলে 'হল্‌ অফ হিরোস'-এ দেখলুম ষোলটি বিরাট মূর্তি একখানি পাথর কেটে তৈরি। নানা রঙ দিয়ে মূর্তিকে বীর এবং দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। শিল্পী-সুলভ সৌন্দর্য এতে নেই।

আর একটু এগিয়েই বুঝতে পারলুম যে আমরা একটি সাজানো উদ্যানের মধ্যে এসে পড়েছি। দুধারে বাঁধানো পথ, মাঝখানে জলের ধারা বইছে। এক ধারে একটি প্রাসাদের মতো সুন্দর বাড়ি, তার পিছনে পাহাড়। চারিদিকে গাছের ছায়া, সামনে ছোট বড় ফুলের গাছ, টবে পাম ও পাতাবাহর। যারা এই উদ্যানের শোভা মনোযোগ দিয়ে দেখে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশই গ্রামবাসী বলে মনে হল। শহরে এসে প্রচণ্ড কৌতূহলে এই সব দেখছে।

আরও একটু এগিয়ে স্বাতি থমকে দাঁড়াল। বলল : এইখানে দাঁড়িয়ে কি তোমার কিছু মনে পড়ছে ?

আমি আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে তাকালুম। পিছনের পাহাড় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে-সেখানে কয়েকটি পত্রবহুল গাছ, ঝাউএর মতো সূক্ষ্ম পত্রের গাছও আছে। আর বাঁধানো খাতে সবুজ জল। সহসা আমার মোগল উদ্যানের কথা মনে পড়ে

গেল। বললুম ঃ তুমি কি কাশ্মীরের মোগল উদ্যানের কথা ভাবছ?

স্বাতি খুশী হয়ে বলল ঃ কোথায় মিল আছে বল তো?

বললুম ঃ এখানে তো চিনার গাছ নেই, তরতর করে ঝর্ণার জলও বয়ে আসছে না ধাপে ধাপে, ফুলের কোন বাহারও নেই। তবু এই সাজানো বাগান আর পিছনের পাহাড় দেখে মোগলদের কথাই মনে হচ্ছে। এই বাগান বোধহয় মোগলদের অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল।

স্বাতি বলল ঃ মরুভূমির দেশ না হলে ঐ পাহাড় থেকে ঝর্ণার জল পাওয়া যেত।

এই জল পাহাড় আর মানুষ দেখে যোধপুরকে মরুভূমির দেশ বলে মনে হয় না।

সত্যিই এখানে এখনও বালি দেখতে পাই নি।

বললুম ঃ বালি দেখবার কথা নয়।

কেন?

বালি পাথরের একটি নিচু পাহাড়ের উপরে এই শহরটি তৈরি হয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমরা আরও এগিয়ে গিয়েছিলুম। এই-বারে দেখতে পেলুম অনেকগুলি সমাধি সৌধ। নানা আকারের এই সৌধগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। যোধপুরের রাজাদের দাহ করা হত এইখানে, তারই উপরে নির্মিত হত সমাধি সৌধ। উঁচু ভিতের উপরে কারুকার্যময় মন্দিরের আকার এই সব সমাধির। সরকারী পুস্তিকায় দেখেছি যে অজিত সিংহের সমাধিই সব চেয়ে বড় ও আকর্ষণীয়। পিছনে মন্দিরের শিখরের মতো দেউল, তার সামনে যেন গম্বুজবিশিষ্ট নাট মন্দির। আর এর সঙ্গে যুক্ত ছুটি স্তম্ভের উপরে যেন একটি নহবৎখানা। একে সমাধি সৌধ না বলে দেবতার মন্দির বললেই যেন ভাল হত।

স্বাতি বলল ঃ এই স্থাপত্য শৈলীকে কি রাজস্থানী বলা চলে?

বললুম ঃ সাধারণত ধর্মের প্রভাব থাকে স্থাপত্য শৈলীতে, দেশের প্রভাব নয়। এই শৈলীতে হিন্দু ধর্মের প্রভাব আছে মোটা কাজে, সূক্ষ্ম কাজে জৈন ধর্মের প্রভাব। মানে, হিন্দু মন্দিরের গায়ে জৈন কারুকার্য।

এক সময়ে আমরা উদ্যানের বাহিরে বেরিয়ে এলুম। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে আমাদেব অটোবিক্সা এই দিকেই অপেক্ষা করছে। হাতে সময় ছিল বলে উমেদভবন প্রাসাদে নিয়ে যেতে বললুম।

উমেদভবন একটি আধুনিক রাজপ্রাসাদ। মহারাজা উমেদ সিং বর্তমান শতাব্দীতেই এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতার সব রকম বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা আছে এব ভিতরে। এরই একাংশে এখন ওবেরয় যোধপুর নামেব সবচেয়ে ভাল হোটেল। দুজনে থাকবার মতো একখানা ঘরের ভাড়া একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। সার্কিট হাউসে ভাড়া তেষট্টি, দুজনের খাবাব পয়সা আলাদা দিতে হয় না। পাঁচ থেকে পনর টাকা ঘর ভাড়ায় চলনসই হোটেল অনেক আছে। তাদের নাম গ্র্যাণ্ড, আদর্শ, অরুণ, অশোক, পরমাব, প্রীতম লজ, আগরবাল লজ, মুন্দ্রাপ্যালেস, শান্তিভবন লজ। এছাড়াও যোধপুরে অনেক বাসোপযোগী স্থান আছে। রেলওয়ে স্টেশনেই রিটায়ারিং রূম আছে, ডাকবাংলো মাইল খানেকের কিছু বেশি দূরে। টুরিস্ট বাংলোও আছে। ঘরের ভাড়া ছোট বড় হিসেবে শীতে দশ-পনর, আর গ্রীষ্মে এগারো-ষোল। পাখার জন্য এক টাকা অতিরিক্ত ভাড়া।

পথে যেতে যেতেই এই সব কথা আমি পড়ে নিয়েছিলুম। আর উমেদভবন প্যালেসে পৌঁছে দেখলুম যে কী একটা কারণে সেদিন বিনা দর্শনীতে রাজবাড়ির ভিতরটা দেখতে দিচ্ছে। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড়।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম। স্বাতি বলল ঃ রাজবাড়ির ভিতরে আর কী দেখব!

তবে এমন ভিড় কেন রাজবাড়ি দেখবার ?

স্বাতি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : হাতে যখন সময় আছে, তখন দেখতে আপত্তি নেই।

এক যাত্রীদলের সঙ্গে আমরাও সব ঘুরে ঘুরে দেখে নিলুম। মহারাজা কোথায় কি করতেন, কী খেলতেন, সিনেমা দেখতেন কোথায় এই সব। এ তো গান্ধীজীর শবরমতী আশ্রম নয়. রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোও নয়। এই প্রাসাদ দেখে আমাদের মনে কোন নতুন ভাবনা এল না। নির্বিকার চিত্তে আমবা বেরিয়ে এসে অটোরিক্সায় বসলুম।

চালক জানতে চাইল, এবারে আমরা কোথায় যাব।

আমি বললুম : আর কোন জায়গার নাম জানি নে।

জানবার দরকাব নেই।

বলে স্বাতি স্টেশনে ফেরার নিদেশ দিল।

মধ্যাহ্নেব সূর্য তখন মাথাব উপরে উঠে আসছে। তাই দেখে স্বাতি জিজ্ঞাসা কবল : স্টেশনেই খাবে, না বাইবেব কোন হোটেলে ?

বললুম : তোমাব পছন্দ মতো জায়গায়।

স্বাতি বলল : তাহলে পথের দুধাবে নজর রেখো।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে একটা হোটেলে আমবা নেমে পড়ে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলুম।

১৬

স্টেশনে ওয়েটিং রূমে ফিরে স্বাতি বলল: বালুরামবাবু তো এখনও আসেন নি, তুমি একটু চোখ বুজে বিশ্রাম কব।

আর তুমি কী করবে?

চিঠি লিখব একখানা।

আমি জানি স্বাতি তার বাবা-মাকে নিয়মিত চিঠি লেখে। হঠাৎ এই মরুভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা হতেই সে একখানা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে যে ফিরতে দিন দশেক দেরি হবে। আজ এখান থেকে চিঠি লিখে সব খবর দেবে। আমি তাই আর কোন প্রশ্ন না করে একখানা চেয়ারে বসে চোখ বুজলুম। অনুমানেই বুঝতে পারলুম যে স্বাতি একখানা চেয়ার টেবলের ধারে টেনে নিয়ে বসল। চিঠি লেখার সরঞ্জাম তার ব্যাগের মধ্যেই আছে।

দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস আমার নেই। ঘুম আসে না। তার বদলে নানা রকমের ভাবনায় মন অস্থির হয়ে ওঠে। বড় বিচিত্র মনে হয় এই জীবন। নিজের জীবন, কিন্তু নিজে কি আমরা এই জীবন পরিচালনা করি! না, তা করতে পারি! তিন বছর আগে তো আমি স্বাতিকে চিনতুম না! যেদিন তাকে প্রথম দেখলুম, সেদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম যে এই তিন বছরে তার সঙ্গে সারা ভারত পরিক্রমা করব! আর আমার অলস উদ্দেশ্যহীন জীবন এমন এক নির্দিষ্ট ধারায় আবর্তিত হয়ে উঠবে! না, ভাবি নি, ভাববার মতো কোন আলো তো আমার সামনে ছিল না!

তবে কি আমার এই জীবন অন্য কেউ পরিচালনা করছে! স্বাতি!

চোখ মেলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। নিবিষ্ট মনে সে

এখন চিঠি লিখছে। চিঠি লিখছে কলকাতায় তার বাবা-মাকে। সমস্ত খবর দেবে। নিজের খবর, আমার খবর, আমাদের নতুন দেশ ভ্রমণের খবর। এর আগে আমরা সবাই একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি। সেই দিনগুলির কথাও আমার মনে পড়ছে।

তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল পাতানো। তাই মা তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে সারাক্ষণ সচেতন থাকতেন। আতঙ্কের চোখে দেখতেন আমার সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা। কিন্তু তার বাবাকে আমি কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখি নি। তাঁর ব্যবহারে খানিকটা প্রশ্রয়ের ভাবই দেখেছি। কিন্তু স্বাতি আমার জীবন পরিচালনা করছে, তা কখনই ভাবি নি, ভাববার মতো কারণ কখনও ঘটে নি।

তবে কি কোন অদৃশ্য শক্তি আমাদের জীবন পরিচালনা করছে! এই শক্তিকেই কি আমরা বিধাতা বলি! কিন্তু তা কি সম্ভব! কোটি কোটি মানুষের জীবন কি বিধাতা একা পরিচালনা করতে সক্ষম? কী ভাবে পরিচালনা করেন। আমরা আগে কিছু জানতে পারি না কেন!

ভাগ্য বলে কি কিছু আছে! যদি থাকে তো কে এই ভাগ্য স্থির করেন! তার বিধিনিষেধ কি কিছু নেই! না, কারও খামখেয়ালিপনায় এই ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়!

চোখ বুজে আমি হয়তো আরও অনেক কথা ভাবতুম। কিন্তু তার সুযোগ হারালুম বালুরামের কথায়। ভদ্রলোক খুব মৃদু স্বরে স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করল: গোপালবাবু বুঝি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?

স্বাতির উত্তরও আমি শুনতে পেলুম: চোখ বুজে ধ্যান করছে।

ধ্যান!

বালুরামের কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা যেন উথলে উঠল।

আর স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল: ভাবছে,

বালুরামবাবু কখন আসবে, এলে ইতিহাসের গল্প শুনবে তার কাছে।

আমি বললুম: আমার ওপরে হুকুম হয়েছিল চোখ বুজে থাকবার জন্যে।

কেন?

উনি একমনে চিঠি লিখবেন।

স্বাতি তৎপর ভাবে চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে উঠে গেল। বাথরুমে গিয়ে খামের মুখটা সেঁটে এল জল দিয়ে। তার পরে সেখানা ব্যাগের মধ্যে পুরে বলল: এইবারে ইতিহাসের গল্প বলুন।

বালুরাম একবার স্বাতির মুখের দিকে তাকাল, আর একবার আমার দিকে। তারপরে বলল: ইতিহাসের গল্প কে বেশি ভালবাসেন, তা বুঝতে পারলাম না।

আমি বললুম: এইবারে বুঝতে পারবেন।

স্বাতি বলল: উনি বলতে ভালবাসেন বেশি। অথচ মুস্কিল হয়েছে এই যে টড সাহেবের বইখানা অনেক দিন আগে পড়েছিলেন বলে এখন সব গুলিয়ে ফেলেছেন। যশোবন্ত থারা দেখে যশোবন্ত সিংহের কথা ওঁর মনে পড়ল না; অজিত সিংহের সমাধি অমন বড় হল কেন, তাও বলতে পারলেন না।

বালুরাম বলল: আমাকেও বিপদে ফেললেন দেখছি।

কেন?

ইতিহাসে আমি রস পাই নি। তাই সন তারিখ মনে রাখবার জন্যে কসরৎ করতে হত।

স্বাতি বলল: সন তারিখের দরকার নেই। আপনার যা মনে আছে, তাই বলুন।

বালুরাম বলল: লোকে বলে রাও যোধার সময় থেকেই যোধপুরের ইতিহাস। যোধপুর শহর প্রতিষ্ঠার সনটা মনে

আছে—১৪৫৯ সাল। কনৌজে এই রাঠোর বংশের পরাজয়ের তারিখটাও বলতে পারি—১২১১। এর মাঝখানে আড়াইশো বছর আছে। কর্নেল টড কয়েকখানি পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করে এই সময়েরও একটা ইতিহাস রচনা করেছেন। একখানি কুলতালিকা গ্রন্থে আছে যে রাঠোর বংশের প্রথম পুরুষ যুবনাশ্বের জন্ম দেবরাজ ইন্দ্রের মেরুদণ্ড থেকে। পারলিপুরে ছিল যুবনাশ্বের রাজধানী।

এই পারলিপুর কোথায় ?

জানি নে।

তার পর ?

এই বংশের নয়নপাল নামে একজন রাজা কনৌজের অজপালকে বধ করে কনৌজ অধিকার করেন। ১৬৭৯ সালে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। এই সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার কথা দুখানি কুলতালিকা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিজয়বিলাস, রাজরূপকাখ্যান ও সূর্যপ্রকাশ নামে তিনখানি ভট্ট-গ্রন্থ আছে। মহারাজা অভয় সিংহের রাজত্বকালে ভট্টকবি বণিধন সূর্যপ্রকাশ রচনা করেছিলেন।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল: এ সব কথা তোমার মনে থাকবে ?

কী মনে রাখতে হবে, আর কী হবে না, সে বিচার মনের। আমার শুধু মন দিয়ে শুনে যাবার দায়িত্ব।

স্বাতির বাঙলা প্রশ্নের উত্তর আমি বাঙলায় দিয়েছিলুম। কিছু বুঝতে না পেরে বালুরাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাই দেখে বললুম: স্বাতি বলছে যে তোমার কথা আমি মনে রাখতে পারব না।

বালুরাম বলল: দরকার কী মনে রাখবার!

আমি হেসে বললুম: এ কথা মেনে নিলেই তুমি বলবে, বলবারও দরকার নেই, এই তো!

বালুরাম বলল : আমি খুব সামান্যই মনে রাখতে পেরেছি।

স্বাতি বলল : তাই বলুন।

বালুরাম বলল : যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধা মোগল আমলের পূর্বে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বংশধরেরা রাজস্থানে অনেকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল—যেমন বিকানের, কিশনগড়, ইদর, রতলাম, বাবুয়া, শৈলানা ও সীতামাউ। রাও যোধার মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই বাবর এসে রাজবাড়া অধিকার করেন। আপনাদের বোধহয় জানা আছে যে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজবাড়ার সমস্ত রাজারা সমবেত হয়ে বাবরকে রুখতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে রাও মালদেও যোধপুর রাজ্য উদ্ধার করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা তাঁকে রাজবাড়ার সমসাময়িক রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন।

বালুরাম একটু থেমে বলল : মালদেওএর পুত্র উদয় সিংহ হলেন যোধপুরের প্রথম রাজা।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : সে কী রকম ?

বালুরাম বলল : উদয় সিংহের পিতা ও পিতৃপুরুষেরা ছিলেন রাও। আকবর বাদশাহ উদয় সিংহকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন ; আর অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন বলে পরিহাস করে বলতেন মোটা রাজা। অনেকে মনে করেন যে আকবর তাঁর পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই উদয় সিংহকে তাঁর পিতা মালদেওএর জীবদ্দশাতেই তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন।

আমি বললুম : অপমানের কথাটা এইবারে বলুন।

বালুরাম বলল : শের শাহর কাছে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হয়ে হুমায়ুন মালদেওএর কাছে এসেছিলেন আশ্রয়ের জন্যে। মালদেও তখন প্রবল প্রতাপে এই মরুভূমিতে রাজত্ব করছিলেন। কিন্তু আশ্রয় না দিয়ে তিনি তাঁকে শের শাহর হাতে ধরিয়ে দেবার উদ্যোগ করলেন। ব্যাপারটা সন্দেহ করে হুমায়ুন আত্মরক্ষার জন্যে

পালিয়ে গেলেন। তাঁর রানী তখন সন্তানসম্ভবা এবং মরুভূমিতেই তিনি আকবরের জন্ম দেন। অনেকে মনে করেন, আকবরের মা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বলেছিলেন পুত্রকে।• আর এই জন্যে মারবাড় বিজয়ের পরে মালদেওএর জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর পুত্রকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: এ গল্প সত্যি নাকি?

বালুরাম বলল: টড সাহেবের লেখাতেই পড়েছি, আর এও পড়েছি যে নগর সুরক্ষার জন্যে এই মালদেওই যোধপুরের চারিদিক ঘিরে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন।

আমি বললুম: শের শাহর সঙ্গে মালদেওএর যুদ্ধের গল্পটা বলবেন না?

বালুরাম বলল: সে এক লজ্জার ব্যাপার।

কেন?

বলে স্বাতি আগ্রহ প্রকাশ করল।

মালদেওএর তখন বয়স অনেক, কিন্তু সাহস ছিল অপরিসীম। তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছেন জেনে শের শাহ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে এলেন। এই আক্রমণের ভয়ে তিনি যে হুমায়ুনকে আশ্রয় দেন নি তা নয়, কনৌজে তাঁর পূর্বপুরুষের পরাজয়ের পরে মুসলমানদের উপরে তাঁর জাতক্রোধ ছিল। তাই শের শাহ আশি হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছেন শুনে নিজে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। একবারও বললেন না যে হুমায়ুনকে তিনি আশ্রয় দেন নি, বা হুমায়ুন পালিয়ে গেছে। ভাবলেন যে এইবারে কনৌজে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, শের শাহ আর আক্রমণ করেন না।

স্বাতি প্রশ্ন করল: কেন?

মারবাড়ের দুর্ধর্ষ রাঠোর সেনার কথা শের শাহ জানতেন। ভাবলেন যে সম্মুখ সমরে জয়লাভ সম্ভব নয়। আবার ফিরে যাওয়াও যায় না।

কেন ?

সে তো পরাজয়েরই সামিল। একমুঠো গমের জন্যে দিল্লীর সিংহাসন খোয়াবেন, এই দুর্ভাবনায় শের শাহ অস্থির হয়ে উঠলেন।

একমুঠো গমের জন্যে কেন ?

এই মরুভূমি জয় করে তাঁর কী লাভ হবে! অতিকষ্টে তো একমুঠো গম ফলে!

তাহলে কী করলেন ?

ফন্দি! মুসলমানরা বারবার যা করেছে, সেই রকমের এক আজব ফন্দি! মালদেওএর সামন্ত রাজারা যেন তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, এমনি এক চিঠি লিখে এমন জায়গায় ফেলে দিলেন যে সহজেই তা মালদেওএর হাতে পৌঁছে গেল। তিনি তা যাচাই না করেই সামন্ত রাজাদের ওপরে বিশ্বাস হারালেন। শের শাহকে আক্রমণ করার হুকুম তিনি দিলেন না। সামন্ত রাজারা এই অবিশ্বাসের কথা জানতে পেরে বারো হাজার সৈন্য নিয়ে শের শাহকে আক্রমণ করে প্রাণ দিলেন, আর মালদেও আর সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এই পরাজয় দেখলেন। শুধু অবিশ্বাস! প্রভুভক্ত রাজপুত সামন্ত রাজাদের অবিশ্বাস করে তিনি পরাজয় মেনে নিলেন।

স্বাতি বলল: লড়াই করে যে দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পারতেন, সে কথা একবারও ভাবলেন না ?

বালুরাম বলল: ভাগ্য বিরূপ হলে এই রকমই হয়।

আমরা কি নিজেরাই ভাগ্যকে বিরূপ করি না ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমারই পুরনো ভাবনার কথা। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কোন আলোচনা করলুম না। বললুম: এই মালদেওএর পুত্র উদয় সিংহই তো বোনের বিবাহ দিয়েছিল আকবর বাদশাহর সঙ্গে!

বালুরাম বলল: ঠিকই বলেছেন। যোধাবাঈ ছিলেন

মালদেওএর কন্যা এবং উদয় সিংহের ভগিনী। আর এই শালা ভগিনীপতি সম্বন্ধের জন্যেই বাদশাহর দরবারে প্রচুর খাতির ছিল উদয় সিংহের। উদয় সিংহ প্রথমে নামে রাজা ছিলেন, আর মারবাড়ের প্রকৃত রাজা ছিলেন তাঁর ছোট ভাই চন্দ্রসেন। প্রজারা আকবরেব অধীন ও আশ্রিত রাজাকে নিজেদের বাজা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। উদয় সিংহেব সতেরো বছর সময় লেগেছিল চন্দ্রসেনকে তাড়িয়ে রাজ্য অধিকাব করতে। আকবরেব সেনাদলের সাহায্যেই তা সম্ভব হয়েছিল।

আমি বললুম: এই উদয সিংহেরই তো মৃত্যু হয়েছিল ভূতেব ভয়ে, তাই না?

বালুবাম হেসে বলল: সে গল্প শুনেছেন বুঝি?

কোথাও পড়েছিলুম মনে হচ্ছে।

বালুরাম এবারে বেশ লজ্জিত ভাবে বলল: সে এক কেলেঙ্কারির গল্প। রাজারাজড়াদের ব্যাপারই অন্য রকম।

গল্পটা বলুন না।

বলব?

বালুরাম তবু কিছুটা ইতস্তত করে বলল: উদয় সিংহ নাকি চরিত্রহীন ছিলেন। নিজের ষোলজন রানী থাকা সত্ত্বেও পরস্ত্রীর প্রতি নজর দিতেন। এই ভাবেই একবার তাঁর নজব পড়ল এক ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যার উপরে। তিনি সেই কন্যাকে হরণ করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেই কন্যার পিতা ছিলেন আর্যাদেবীর মন্দিরের উপাসক। মেয়েকে রক্ষার আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি তাকে হত্যা করে সেই মাংস যজ্ঞে আহুতি দিলেন। তার পরে নিজে সেই যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরলেন। মরবার আগে সেই ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, আজ থেকে রাজার শান্তি লোপ হল। আমার প্রতিহিংসা সফল হবে তিন প্রহর, তিন দিন বা তিন বৎসরের মধ্যে। এও বলেছিলেন, এখন থেকে প্রেত হয়ে আমি অন্তরীক্ষে বাস করব।

স্বাতি বলল : তার পর কী হল ?

বালুরাম বলল : ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি। এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞের কথা রাজা উদয় সিংহের কানে পৌছতেই তিনি ভয়ে আকুল হলেন, ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা দেখতে লাগলেন চারিদিকে এবং শেষ পর্যন্ত ভয়ে অনুতাপে দেহ মন ভেঙে গিয়ে মারা গেলেন।

একি সত্যি ঘটনা ?

স্বাতির এই প্রশ্নের উত্তরে বালুরাম হেসে বলল : সত্য ঘটনা কিনা, এখন তো বলা মুস্কিল। তবে কর্নেল টডের রাজস্থানেও এই ঘটনার উল্লেখ নাকি আছে। তিনি আরও লিখেছেন যে পরবর্তীকালেও কোন রাজা বা রাজকুমার চরিত্রহীন হলে সেই ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মাই দেখা দিত তাঁর চরিত্র সংশোধনের জন্যে। এই উক্তির একটি প্রমাণও আছে।

অলৌকিক কাহিনীর একটা আকর্ষণ আছে। সেই কাহিনী শোনবার জন্য আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। আর আমাদের কৌতূহল দেখে বালুরাম আর একটি গল্প শোনাল আমাদের : উদয় সিংহের নাতি যশোবন্ত সিংহ ছিলেন যোধপুরের একজন বিখ্যাত রাজা।

স্বাতি বলল : যশোবন্ত থারা যাঁর সমাধি ?

বালুরাম বলল : ঠিক ধরেছেন। উদয় সিংহ মারা গিয়েছিলেন ১৫৮১ সালে। তাঁর পুত্রের নাম সোয়াই রাজা সুরসিংহ। আকবর বাদশাহর জন্যে তিনি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। ১৫৯৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা হন যশোবন্ত সিংহ। তিনি শাহজাহান ও দারা শিকোর পক্ষে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ১৬৫৮ সালে। ১৬৭৮ সালে কাবুলে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানে বাদশাহর সেনাপতি রূপে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন।

বললুম : এ তো ঐতিহাসিক ঘটনা।

বালুরাম বলল : এঁকে নিয়েই একটি অলৌকিক ঘটনা আছে। কোন দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর এক মন্ত্রীব কুমারী কন্যাব প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। একদিন সেই মেয়েটিকে নিয়ে একান্তে আসতেই সেই ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা এসে সামনে উপস্থিত হয়। যশোবন্ত সিংহ নাকি প্রেতাত্মাব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে যান, কিন্তু পবে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। এর পবেও মাঝে মাঝে নাকি প্রেতাত্মা তাঁব শরীবে ভব করত, তখন তাঁব মুখ দিয়ে শোনা যেত, যশোবন্ত সিংহেব সমকক্ষ কেউ জীবন দিলে, আমি একে পবিত্যাগ করব। প্রজারা এ কথা বিশ্বাস কবেছিল এবং নাহব খাঁ নামে একজন সামন্ত বাজা নিজের প্রাণ দিয়েছিল প্রভুব জন্যে।

আমি হেসে ফেলেছিলুম। তাই দেখে বালুবাম লজ্জিত ভাবে বলল : আমি জানি, আপনাবা এ সব কথা বিশ্বাস করবেন না।

কিন্তু স্বাতি বলল : কী ভাবে প্রাণ দিয়েছিল, তা বলুন।

সে কথা আরও অবিশ্বাস্য।

তবু বলুন।

বালুরাম বলল : এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে এক পাত্র জলে সেই প্রেতাত্মাকে আনল। রাজা তখন অচেতন। ব্রাহ্মণ সেই জলের পাত্র তিনবার রাজার মাথার চারিদিকে ঘুরিয়ে নাহর খানকে দিল জল পান করতে। নাহর খান সেই জল পান কবতেই রাজাব চেতনা ফিরে এল, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু নাহব খান এব পবে বেশি দিন বাঁচেন নি।

স্বাতি আমাব মুখের দিকে তাকাল। সে বোধহয় আমার মন্তব্য শুনতে চায়। বালুরাম নিজেই সে কথা জিজ্ঞাসা কবে বসল : আপনার নিশ্চয়ই এ সব কথা বিশ্বাস হয় নি ?

আমি গম্ভীব ভাবে বললুম : হয়েছে।

হয়েছে !

হ্যাঁ। মধ্যযুগে ভূতপ্রেতে আমাদের বিশ্বাস ছিল গভীর। তাই এ সমস্ত ঘটনাই সত্য বলে মনে হয়। শুধু --

শুধু কী ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : প্রেতাত্মা একটি উপলক্ষ। ব্রাহ্মণের নৃশংস কাণ্ডে উদয় সিংহের প্রচণ্ড অনুতাপ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য। যশোবন্ত সিংহের পরিবর্তনও হয়েছে কোন গভীর অনুশোচনার জন্য। প্রেতাত্মার কাহিনী তাঁদের উপরে আরোপিত হয়েছে।

বালুরাম স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পরে বলল : ইংরেজ আসবার আগে যোধপুরের আর দুজন রাজার নাম আছে। যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহ, মাণ্ডোরে যাঁর সমাধি দেখেছেন। আজমীর থেকে মোগলদের তাড়িয়ে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তার পরে অভয় সিংহ নাম করেছিলেন আমেদাবাদ জয় করে।

স্বাতি বলল : উমেদ সিংহ ?

উমেদ সিংহ তো এ কালের রাজা। তিনি মারা গেছেন ১৯৪৭ সালে। এরোপ্লেনের ব্যাপারে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল এবং তাঁর চেষ্টাতেই এখানে একটি হাওয়াই ঘাঁটি তৈরি হয়েছে।

'হঠাৎ কী মনে হতেই বালুরাম লাফিয়ে উঠল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কী হল ?

লজ্জিত ভাবে বালুরাম বলল : কী কাণ্ড দেখুন! সুভদ্রা আমাকে বার বার বলে দিয়েছিল, তুমি চা খাও না। কিন্তু চায়ের সময়টা মনে রেখো।

বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

১৭

বালুরাম অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এল। বলল : যোধপুরের মিঠাই খুব ভাল। একেবারে নতুন ধরনের মিঠাই, দিল্লী আগ্রায় যা পাওয়া যায় না। কিন্তু স্টেশনে কিছুই নেই। শুধু চা দিতে বললাম। রোদ একটু পড়লে বাইরে আপনাদের একটা ভাল দোকানে নিয়ে যাব।

স্বাতি বলল : মিষ্টি আমার প্রিয় নয়।

বালুরাম বলল : বুঝেছি। আপনি নম্‌কিন ভালবাসেন।

আমি বললুম : নিম্‌কিও নয়।

তবে ?

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : ইতিহাসের কথা তো বললেন, এবারে সাহিত্যের কথাও কিছু বলুন।

আমি বুঝতে পারলুম যে তার পছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ স্বাতি আমাকে দিল না। কিন্তু বালুরাম তা বুঝতে না পেরে বলল : আপনি বোধহয় আমাকে একজন জ্ঞানী লোক বলে মনে করেন!

স্বাতি বলল : আপনাকে অজ্ঞান ভাবব কেন ?

তা ভাবলে আমার খুব সুবিধা হত।

আর তা সত্যি হলে আমাদের অসুবিধার কথা ভাবুন। আমরা কি আর এ সব কথা জানবার সুযোগ পাব! কলকাতায় ফিরে চারি-দিকে মাথা খুঁড়লেও কেউ আমাদের কিছু বলবে না।

বললুম : বলতে পারবে না বল।

বালুরাম একথা মেনে নিয়ে বলল : তা ঠিক। কিন্তু—

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। রিফ্রেশমেন্ট রুমের বেয়ারা

চায়ের ট্রে নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। ট্রেতে দুটি পেয়ালা। বালুরাম সেটা স্বাতির দিকে এগিয়ে দিল।

গতবারে রাজস্থান ভ্রমণের সময়ে আমি রাজস্থানের সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানতে পেরেছিলুম। কিশনগড়ের ডাক্তার সত্যকুমার বসু আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি অবশ্য চারণদের কথাই বেশি বলেছিলেন। তাতে রাজস্থানের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা হয় নি। তাই স্বাতি যখন চা ঢালছিল, আমি তখন বালুরামকে বললুম: নিন, এইবারে শুরু করুন।

বালুরাম স্বাতির দিকে চেয়ে চা তৈরির প্রক্রিয়া দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। এইবারে আমার দিকে চেয়ে বলল: আপনাদের বাঙলা ভাষা তো একটাই, কিন্তু আমাদের রাজস্থানে অনেকগুলি ভাষা।

কী রকম?

আর আশ্চর্যের কথা এই যে আমরা এ সব কথা জানতাম না। গ্রীয়ার্সন নামে একজন বিদেশী এসে বলেছিলেন যে এই অঞ্চলে অন্তত ষোলটি উপভাষা আছে, তার মধ্যে প্রধান হল চারটি।

কোন্ চারটি?

মালবী, মেওয়াতী, জয়পুরী ও মারবাড়ী। জয়পুরীকে ঢুণ্ঢারীও বলে।

আমি প্রশ্ন করলুম: ডিঙ্গল ভাষা কাকে বলে?

বালুরাম বলল: ডিঙ্গল কোন ভাষা নয়। মারবাড়ী ভাষাই রাজস্থানের সাহিত্যের ভাষা আর এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের নাম ডিঙ্গল সাহিত্য।

তার মানে রাজস্থানী সাহিত্যেরই অপর নাম ডিঙ্গল সাহিত্য।

ঠিক তাই। মোটামুটি ভাবে বলতে পারেন যে পূর্ব রাজস্থানের ভাষা জয়পুরী বা ঢুণ্ঢারী। এতে ব্রজভাষার প্রভাব যেমন আছে, তেমনি মারবাড়ী ও গুজরাতী ভাষার প্রভাবও আছে।

আমি বললুম : গুজরাতী ভাষাব প্রভাব এ দিকে কেন এল ?

বালুরাম বলল : তাহলে আমাদের আবও প্রাচীনকালে চলে যেতে হবে। সে সময়ে যে ভাষা বাজস্থানে প্রচলিত ছিল, তাব বর্তমান নাম প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী। ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাষা থেকে বাজস্থানী ও গুজবাতী ভাষাব জন্ম হয়েছে। এই রাজস্থানী হল মাববাড়ী বাজস্থানী, জয়পুবীতেও এর প্রভাব থেকে গেছে। পশ্চিম বাজস্থানে মাববাড়ী ভাষাব প্রচলন, যোধপুব হল তার প্রধান কেন্দ্র। মেবাব বিকানেব ও জয়সলমেবে মাববাড়ী ভাষাই চলে।

স্বাতি বলল : মাববাড়ী ভাষাব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে ?

বৈশিষ্ট্য !

বলে বালুবাম খানিকক্ষণ ভাবল, তাব পবে বলল : এ ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ নেই। সমস্ত শব্দ হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ।

স্বাতি হেসে বলল : ব্যাকবণ নয়, ব্যাকবণ আমি বুঝব না।

তবে ?

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য আমি চট্ করে বুঝব।

বালুরাম বলল : তাও আছে। আপনাদেব বাঙলা কথা শুনে বুঝতে পারছি যে আপনাদের ব একটি ও মূর্ধণ্য ণ নেই। ঠিক নয় ?

আমি বললুম : ঠিক।

আমাদের দুটি ব, বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এর আলাদা উচ্চাবণ। আপনারা মারোয়াড়ী বলেন, আমরা বলি মারবাড়ী। ব-টা অন্তঃস্থ, বর্গীয় নয়।

বললুম : আপনি যখন সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে আপনাদের ভাষায় ল ধ্বনিব ব্যবহার বেশি, আর আঁ দিয়ে শব্দের পরিবর্তন।

বালুরাম লজ্জিতভাবে বলল : আমরা তো নিজেদের ভাষায় বেশি কথা বলি নি!

তার মধ্যেও এটুকু লক্ষ্য করা সম্ভব হয়েছে।

স্বাতি বলল : এইবারে রাজস্থানী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বালুরাম বলল : গ্রীয়ার্সন সাহেবের নাম আবার করতে হয়।

কেন ?

'রাজস্থানী' এই নামকরণ তিনিই করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই এই ভাষার মর্যাদা বাড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে প্রাচীন গুজরাতীর সঙ্গে প্রাচীন রাজস্থানীর খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মিশ্রণে জৈন ধর্ম অবলম্বন করেই সাহিত্য সৃষ্টি হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি কল্লোল 'ঢোলা-মারূরা দুহা' নামে একটি প্রেম কাহিনী রচনা করলেন পশ্চিমা রাজস্থানী বা মারবাড়ী ভাষায়। এর পর থেকেই মারবাড়ী ভাষা ধীরে ধীরে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হতে থাকে।

বালুরাম একটু ভেবে বলল : বিকানের রাজভ্রাতা পৃথিরাজও ভিঙ্গল সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি বলে পরিচিত। 'বেলি ক্রমন রূকমনিরী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ নিয়ে এই কাব্য বচিত হয়েছে।

সহসা আমার মনে পড়ে গেল, উদয়পুর থেকে মারবাড় জংশনের পথে ট্রেনে শুক্লা নামের এক ভদ্রলোক আমাকে কয়েকখানি রাজস্থানী চিত্র দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি ছিল রাজস্থানের একটি কবি সম্মেলনের চিত্র। এই চারণ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছিলেন বিকানের রাজভ্রাতা পৃথিরাজ। শুক্লা বলেছিলেন, এঁকে আমরা অন্য কারণে ভুলব না। একদা তিনি তাঁর কলম দিয়ে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন, রাণা প্রতাপকে বাঁচিয়েছিলেন আত্মসমর্পণের হাত থেকে।

শুক্লার কাছ থেকে সেদিন আমি ইতিহাসের এই কাহিনী জেনে নেবার সুযোগ পাই নি। তাই আজ বালুরামকে জিজ্ঞাসা করলুম : ইনি তো আকবর বাদশাহর সমসাময়িক ছিলেন।

বালুরাম খুশি হয়ে বলল: রাণা প্রতাপের সঙ্গে এঁব পত্রালাপেব গল্প জানেন?

বললুম: না।

বালুবাম গর্বিত ভাবে বলল: অনেকে মনে করেন যে পৃথ্বিরাজ সে পত্র না লিখলে বাণা প্রতাপও আকবরেব পদানত হতেন।

স্বাতি চা তৈরি কবে প্রথম পেয়ালাটা বালুরামেব দিকেই এগিয়ে দিয়েছিল। সে সহাস্যে সেটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। আব দ্বিতীয় পেয়ালাটি দিয়েছিল স্বাতিকে। সে যে চা খায় না, আমরা তা জানতুম। তবু চায়ের পেয়ালা শেষ করে স্বাতি বলল: গল্পটা শুনতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনাব হয়তো গলা শুকিয়ে উঠেছে।

বালুরাম তৎপব ভাবে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাহিবেব বৌদ্র দেখে এসে বলল: আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবা ভাল। এই সময়ে পৃথ্বিরাজের গল্পটা আমি বলছি।

রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারা বোধহয় বাহিরেই অপেক্ষা করছিল। তার পিছনে এসে চায়ের পেয়ালা দুটি সংগ্রহ কবে ট্রে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। ডেকে বললুম: পয়সা নিয়ে যাও।

যেতে যেতেই সে বলল: মিল গিয়া।

যেন কিছুই জানে না এমনি ভাবে বালুরাম বলল: পৃথ্বিবাজ ছিলেন আকবরের দরবারে। বিকানেরের লোক একে গৌববের ব্যাপার বলে মনে করতেন, কিন্তু আমি শুনেছি যে পৃথ্বিরাজ নিজে এটাকে বন্দীজীবন বলে মনে করতেন।

কেন?

পৃথ্বিরাজ দুঃসাহসী বীর ছিলেন, আবার বিষ্ণুভক্ত কবি ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। কিন্তু তাঁর বড় ভাই বিকানের-রাজ রায়সিংহ ছিলেন আকবরের তাঁবেদার। গুজরাত কাবুল ও কান্দাহারে মোগল সেনা চালনা করে তিনি রাজা খেতাব

পেয়েছিলেন। আর পৃথ্বিরাজকে আকবর নিজের দরবারে রেখেছিলেন এবং তাঁর গুণের জন্য অনেক সম্মান করতেন।

দিল্লীর দরবারে একদিন সংবাদ পৌঁছল যে রাণা প্রতাপ আত্মসমর্পণ করবেন। এর আগে আকবরের বিপুল সেনা-বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রতাপ গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করেছেন, কিন্তু প্রচণ্ড দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নি। অনাহারে অনিদ্রায় সপরিবারে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজ্য উদ্ধারের পরিকল্পনা করে। তিনি আত্মসমর্পণ করছেন শুনে আকবর বিশ্বাস করলেন. উৎসবের আয়োজন হল প্রাসাদে। কিন্তু পৃথ্বিরাজ এ কথা শুনে বললেন, না, আমার এ কথা বিশ্বাস হয় না।

অনেকে বলে যে রাণা প্রতাপ নাকি তাঁর শিশু কন্যার দুঃখ নিজের চোখে দেখে সইতে না পেরে এই প্রস্তাব চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। আকবর সেই চিঠি দেখাতে পৃথ্বিরাজ মর্মাহত হয়ে বললেন, তবু আমার মনে হয় যে এ জাল চিঠি, এ চিঠি রাণার নিজের লেখা কিনা তা সঠিক ভাবে জেনে নেওয়া দরকার। যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি একখানা চিঠি লিখে সত্যি কথা জানবার চেষ্টা করতে পারি।

আকবরের অনুমতি পেয়ে পৃথ্বিরাজ রাণা প্রতাপকে লিখে পাঠালেন ঃ

পাতল জো পতসাহ বোলৈ মুখ হুঁতাঁ বয়ন।
মিহর পছম দিসমাহঁ, ঊগে কাসপ রাব উত॥
পটকূঁ মূছাঁ পাণ, কে পটকূঁ নিজতন করদ।
দী জে লিখ দীবাণ, ইণদো মহনী বাত এক॥

এই কবিতার সার মর্ম হল, রাণা প্রতাপ যদি নিজের মুখে আকবরকে বাদশাহ বলে তো সূর্যের উদয় হবে পশ্চিমে। হে দীবান, আমি আমার গোঁফে তা দেব, না নিজের তলোয়ার নিজের শরীরেই প্রহার করব ?

এই চিঠি পাবার পরে রাণা প্রতাপ নিজের কর্তব্য স্থির করতে আর দেরি করলেন না। নিজেও একটি দোহা রচনা করে দোহার উত্তব লিখে পাঠালেন ঃ

তুরক কহাসো মুখ পতৌ, ইণ তন সূ একলিঙ্গ।
ঔগে জানহী ঔগসী, প্রাচী বীচ পতঙ্গ ॥
খুসী হুঁত পীথল কমদ, পটকো মূছাঁ পাণ।
পদটন হৈ জে তৌ পতৌ, কলমা সিরকে বাণ ॥

একলিঙ্গজী তো এই মুখ থেকে বাদশাহকে তুর্ক বলেই সম্বোধন করাবে, আব সূর্য সেই পূর্ব দিকেই উদয় হবে। হে বীর পৃথ্বিরাজ, প্রতাপের তলোয়ার যত দিন যবনেব মাথাব উপবে ঝুলছে, ততদিন খুশিতে নিজের গোঁফে তা দিয়ে যাও।

দেশপ্রেমিক পৃথ্বিরাজ এই উত্তব পেয়েই খুশি হয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে বাজস্থানে এমন একজন রইলেন যিনি মোগল দরবারে নিজেকে বিক্রি করলেন না মিথ্যা মানেব লোভে। বাণা প্রতাপ তাই মানুষের মনে আজও বেঁচে আছেন শুকতারাব মতো।

বালুরাম একটু থেমে বলল ঃ পৃথ্বিরাজকেও আমরা ভুলতে পারি নি। আকবর বাদশাহব দরবারে থেকে রাণা প্রতাপকেই তিনি বেশি সম্মান করতেন। জয়পুরের মানসিংহের মতো, যোধপুরের উদয় সিংহের মতো বা বিকানেরের রায় সিংহের মতো তিনি বাদশাহর সম্মানে নিজেকে সম্মানিত ভাবতে পারতেন না। বাণা প্রতাপের মতো স্বাধীন ভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েও বোধহয় সুখী হতে পারতেন। এই পৃথ্বিরাজ সম্বন্ধে কর্নেল টড কী বলেছেন জানেন ?

না।

বলেছেন, Prithvi Raj was one of the most gallant chieftains of the age and like Troubadour prince

of the west, could grace a cause with the soul inspiring effusions of the muse as well as aid it with his sword. শুধু কবিতায় নয়, তরবারিতেও তিনি পশ্চিমের ট্রুবেডর রাজকুমারদের মতো তাঁর শৌর্য প্রকাশ করতে পারতেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এই পৃথিরাজ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না।

বালুরাম বলল: অনেকেই জানেন না। যত দূর মনে পড়ে, টডই বলেছিলেন যে ইতিহাসে পৃথিরাজ নামটি যেমন সম্মানের, উদয় সিংহ নাম তেমনি অপয়া। দিল্লীর পৃথিরাজ ও বিকানেরের পৃথিরাজ দুজনকেই আমরা সম্মানের চোখে দেখি। আর মেবারের রাণা উদয় সিংহের মতো মারবাড়ের রাজা উদয় সিংহও মোগলের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলেন।

বালুরামকে আমি মনে করিয়ে দিলুম যে আমরা রাজস্থানী সাহিত্যের আলোচনা করছিলুম, ইতিহাস নয়। বালুরাম তখনই লজ্জিত ভাবে বলল: কবি পৃথিরাজের কথাতেই ইতিহাসের কথা এসে পড়েছে।

তারপরে একটু ভেবে বলল: পৃথিরাজ কৃষ্ণকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। তারপরে ডিঙ্গল সাহিত্যে ভক্তিধারার প্রভাব গভীর হয়ে উঠতে দেখা যায়। প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সুরজমল। তিনি আধুনিক যুগের সূচনা করেন। তাঁর কাল ঊনবিংশ শতাব্দী। তিনি ছিলেন বীররসের প্রধান কবি। রামনিবাস হারীত কনহাইয়ালাল সেঠিয়া মেঘরাজ গণপতি স্বামী—এঁরা হলেন আধুনিক যুগের কবি।

বলে বালুরাম উঠে দাঁড়াল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আর কিছু বলবেন না?

বালুরামও হেসে বলল: জানলে বলতাম।

অগত্যা আমাদের শহর দেখতে বেরোতে হবে।

বলে আমিও উঠে পড়লুম।

১৮

স্টেশনের বাহিরে আসবার আগে বালুরাম আমাদেব জয়সলমেব যাত্রার ব্যবস্থা করে দিল। বলল: খুব ইচ্ছা ছিল আপনাদের সঙ্গে যাবার।

স্বাতি বলল: সে তো খুব ভাল হত।

অন্তত আমার খুব ভাল লাগত।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কেন বলুন তো ?

বালুরাম জবাব দিতে সময় নিল না, বলল: সাবা দিন আপনাব সঙ্গে থাকলে বুঝতে পারতাম, কী চোখে আপনি দেখেন— আপনাব দেখার চোখ—

হেসে বললুম: মনের চোখ খুলে বাখতে হয় সারাক্ষণ।

বালুরাম আশ্চর্য হয়ে আমার মুখেব দিকে তাকাল।

তাই দেখে বললুম: মনের চোখ আগে থেকেই বলে দেবে কী দেখতে হবে, আর কী ভাবে দেখলে সেই দেখা সম্পূর্ণ হবে।

বালুরাম চিন্তিত ভাবে বলল: আপনি বুঝি মনের কথা বলছেন ?

বললুম: মনের কাজ আরও বড়। সে শুধু নিজের কথা ভাবে না, ভাবে অপরেব কথাও। অপরে কী দেখতে চায়, কী ভাবে কেমন করে দেখতে হবে। কী দেখে কী জানবার ইচ্ছা হবে—এ সমস্ত বলে দেবে নিজের মন। মনের তাই বিশ্রাম নেই, দেহটা বিশ্রাম নিলেও মন তার কাজ করে চলে। ঘুমিয়েও অনেক সময় মন কাজ করে।

বালুরাম আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: এ আমার নিজের কথা নয়। পণ্ডিতরা বলেন যে

ঘুমের সময় স্বপ্ন তো আমরা দেখি না, স্বপ্ন দেখে আমাদের মন। প্রত্যেকটি স্বপ্নের পিছনে আমাদের মনের কাজ আছে। কোন স্বপ্ন দেখার পরে মনোবিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে সেই স্বপ্নের কথা বলবেন। সে আপনাকে একটা অন্ধকার ঘরে শুইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবার মতো করে বলবে, কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন চটপট করে। কোন ভাবনা চিন্তা করে নয়, যা মনে আসবে তাই। তার পরে স্বপ্নের কয়েকটা কথা নিয়ে প্রশ্ন করবে, আর উত্তরগুলো লিখে নেবে।

বালুরামের দু চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। তাই দেখে হেসে বললুম ঃ ভয় পাবার কিছু নেই। আপনার উত্তরগুলো সাজিয়ে সে নির্ভুল ভাবে বলে দেবে আপনার অবচেতন মন কী ভাবছিল।

স্বাতি বলল ঃ এ তো তোমার নিজের সাবজেক্ট নয়!

বললুম ঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' পড়।

আর বালুরামের দিকে চেয়ে বললুম ঃ ফ্রয়েডের ড্রিম্‌স্‌। নিজের মনটা জানাই সবচেয়ে বড় তপস্যা। গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজের মনটা দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পুরাকালে মুনি ঋষিরা ধ্যানে সব দেখতে পেতেন। এখনও তা সম্ভব।

আপনি—

বলে বালুরাম থেমে গেল।

বললুম ঃ বলুন।

আপনি নিজে এ সব কথা বিশ্বাস করেন?

বললুম ঃ আপনিও করবেন। কিন্তু এক দিনে আপনি ধ্যানস্থ হতে পারবেন না, তার জন্যে দীর্ঘ দিন আপনাকে তপস্যা করতে হবে।

তপস্যা কী?

অভ্যাস। একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনাকে স্থির হয়ে বসতে হবে,

ভুলে যেতে হবে নিজের কথা, পরিবাবেব কথা, সমাজের ও পৃথিবীব কথা। সব কথা ভুলে গিয়ে নিজেব মনটা একেবাবে শূন্য করে দেখতে পাবলেই আপনাব তৃতীয নেত্র খুলে যাবে—এইটাই মনেব চোখ, এই চোখে দেখতে পাওযা যায অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পুবাকালের মুনি ঋষিদেব এই চোখ ছিল, দেবতাদেব আছে। তপস্যা করে মানুষও দেবতা হতে পাবে।

বালুবামেব দৃষ্টিতে গভীব বিস্ময দেখে স্বাতি বলল: যেখানে-সেখানে ইনি এই বকম আজগুবি কথা বলতে পাবেন।

যোধপুবেব প্ল্যাটফর্মে তখন কোন ট্রেন ছিল না, যাত্রীব কোলাহলও ছিল না কোনখানে। তাই স্বাতিব কথা শুনে হেসে বললুম: কোন বাবাজী মহাবাজ তাঁব আশ্রমে বসে এই কথা বললে আজগুবি বলে মনে হত না।

জোর কবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: আমাব দুঃখ তো এই জন্যেই, জীবনে ভণ্ডামি করতে পাবলুম না।

তাব পবেই বললুম: চলে আসুন বালুবামবাবু, যোধপুবেব একটা মন্দিব দেখে আসা যাক।

স্বাতি হেসে বলল: এ তোমাব ভণ্ডামি নয়!

ভণ্ডামি কাকে বলছ?

যোধপুবে এত জাযগা থাকতে তুমি মন্দির দেখতে চাইছ!

মন্দিব, বাজাব আব—

বাধা দিযে স্বাতি বলল: থাক, আব বলতে হবে না।

স্বাতি কেন আমাকে থামিযে দিল তা বুঝতে পারি। এর আগেও একবাব আমি তাকে এই কথা বলেছিলুম। কে একজন বলেছিলেন যে কোন দেশ বা শহরকে জানতে হলে তিনটি জায়গায় যেতে হয়। সে তিনটি হল মন্দিব বাজার আর গণিকালয়। এ সব জায়গায় সব রকমেব মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। আর তাদেব দেখেই শহর বা দেশের সম্বন্ধে একটা ধাবণা করা সহজ হয়।

বললুম : দেবদর্শনের জন্যে তো যাচ্ছি না, যাচ্ছি মন্দির আর তার স্থাপত্য দেখতে, আর মন্দিরে যারা আসে তাদের দেখতে।

মাঝে মাঝেই আমরা বাঙলায় কথা বলছিলুম। তার জন্যে অসুবিধা হচ্ছিল বালুরামের। তাই স্টেশনের বাহিরে এসে বলল : তাহলে আমরা এখন—

স্বাতি বলে উঠল : কোন মিষ্টির দোকানে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিষ্টি খাব।

বালুরাম খুশি হয়ে বলল : যোধপুরের মিষ্টি খেয়ে বাঙালীরা খুব তারিফ করেন শুনেছি। ভারতবর্ষে বাঙালীরাই মিঠায়ের সব চেয়ে বড় সমঝদার, তাই না ?

বলে বালুরাম আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : আমরা মিষ্টির ভক্ত, কিন্তু বড় সমঝদার কিনা জানি নে।

বালুরাম বলল : কলকাতার রসগোল্লা আর সন্দেশের চেয়ে ভাল মিঠাই দুনিয়ার আর কোথাও তৈরি হয় না।

স্বাতি বলল : সংক্ষেপে, ছানার মিষ্টি।

বালুরাম বলল : বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত খোয়ার মিষ্টি।

বললুম : পশ্চিম ভারতে বেসনের লাড্ডু।

স্বাতি বলল : দক্ষিণ ভারতে গিয়ে কাঁদতে হবে। তেঁতুলের জলের পরে টোকো ঘোল।

হেসে বললুম : নিন্দে কোরো না, সেখানেও আমরা খেয়ে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি।

প্রথমেই চোখে পড়ল সেই চুড়ির দোকানগুলি। ঝকঝকে রঙীন শাড়ি পরে স্ত্রীলোকেরা মাটিতে চুড়ি বিছিয়ে বসেছে। বেশ ভিড় হয়েছে ক্রেতার। মেয়েরা চুড়ি পরছে, আর পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। আমরা তাদের সামনে দিয়ে ফলমূলের দোকান ছাড়িয়ে বাজারের পথে এসে উপস্থিত হলুম।

হাঁটতে আপনাদের কষ্ট হয় না তো ?

বলে বালুবাম স্বাতির দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল: অল্পস্বল্প হাঁটতে ভালই লাগে।

তবে হেঁটেই আমরা পৌঁছে যাব।

খানিকটা এগিয়েই বালুরাম একটা দোকানে ঢুকে পড়ল আমাদের নিয়ে। দোকানটি তাব পরিচিত। বলল: বাঙালীবাবুরা খেয়ে তারিফ করে গেছে, এই বকম মিঠাই দাও।

প্রথমেই এল লুচিব মতো প্লেট জোড়া একটি মিষ্টি। তাব আকার দেখেই স্বাতি বলে উঠল: আব কিছু নয়।

আমি বললুম: এ যে সিলাও-এব খাজার চেয়েও বড দেখছি।

বালুবামেব চোখে প্রশ্ন দেখে বললুম: নালন্দাব কাছে ছোট্ট একটি জায়গাব নাম সিলাও। যাতায়াতের পথে গাডি থামিয়ে আপনাকে খাজা কিনতে হবে। বাজগিবে বসে খাবেন, আবাব ফেরার পথে বাড়ি নিয়ে আসবেন।

স্বাতি খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়েছিল। বলল: উঁহু, এ তো খাজা নয়। এ দেখছি মেওয়া-মেলানো খোয়াব পুব দিয়ে ভাজা লুচি।

আমরাও খেয়ে দেখলুম, উপাদেয় মিষ্টি। নামটাও জেনে নিয়েছিলুম। আর যোধপুর ছাড়ার পরেই ভুলে গিয়েছিলুম সেই নাম। কিন্তু এই মিষ্টির কথা আজও মনে আছে, আর মনে আছে মিষ্টির দাম দেবার ব্যাপারে বালুরামেব সঙ্গে স্বাতির যুদ্ধের কথা। যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিল, তা মনে নেই।

যোধপুরের বাজাবে আরও একটি জিনিস দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম। উটের চামড়ার চটি। খুব নরম ও হাল্কা, তার উপরে কাশ্মীরী শালের মতো সূক্ষ্ম সূচীকার্য। কয়েকটি দোকানে ঘুবেও স্বাতির পায়ের মাপে একজোড়া চটি পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল তা পুরুষেব একজোড়া ড্রয়িংরুম স্লিপার। কেউ অর্ডার দিয়ে

তা নিয়ে যান নি বলে সস্তায় পাওয়া গেল। স্বাতি আমার জন্যেই তা কিনে নিয়ে নিজের শখ মেটালো।

সূর্যাস্তের পরে এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হবে, এ আমরা ভাবতে পারি নি। দেশ দেখতে বেরিয়ে অন্ধকার আমাদের ভাল লাগে না। মনে হয়, অন্ধকার যেন মস্ত একটা বাধা, চোখের সামনে একখানা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে, এবারে ঘরে ফিরে বিশ্রাম নাও, কাল সকালে আবার দেখা হবে। স্বাতি বলল: এখন আর কোথায় যাবেন ?

বালুরাম বলল: জয়সলমের থেকে ফেরার পথে যোধপুরে তো এক দিন থাকতে হবে, যা বাকি রইল সেদিন দেখতে পাবেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আরও এক দিন থাকতে হবে কেন ? এখান থেকে তো আপনারা কচ্ছে যাবেন ?

বললুম: হ্যাঁ।

বালুরাম বলল: যোধপুর থেকে রাতের গাড়িতে আপনাদের তুলে দেব। ভোরবেলায় নামবেন পালনপুরে। সেখান থেকে দুপুরে পাবেন গান্ধীধামের ট্রেন। রাতেই গান্ধীধামে পৌঁছে যাবেন।

স্বাতি বলল: একটা দিন তাহলে যোধপুরে নষ্ট হবে।

বললুম: নষ্ট হবে বলো না, বল এগিয়ে গেলে একটা দিন বাঁচানো সম্ভব হবে।

বালুরাম বলল: তাহলে গাড়ি বদল করতে হবে কয়েকবার। একবার যোধপুরে, মারবাড়ে একবার, তার পর তৃতীয়বার পালনপুরে।

বললুম: সবই তো দিনের বেলায়, তাতে আমাদের কষ্ট হবে না।

বালুরাম বলল: পালনপুরে বোধহয় রাত বারোটার পরে ট্রেন পাবেন, যে ট্রেন আমেদাবাদ থেকে আসে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: অত রাতে কষ্ট হবে না!

হেসে বললুম : কষ্ট মনে করলেই কষ্ট।

আর আনন্দ ভাবলে আনন্দ।

বলে স্বাতি হাসল। তার পরে বালুরামকে বলল : তাহলে একটা মন্দির ওকে দেখিয়ে দিন।

মন্দিব !

বলে বালুরাম ভাবতে লাগল। আব স্বাতি একখানা খালি টাঙ্গা ধরে ফেলে বলল : চলে আসুন।

আমি সামনে বসতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু বালুরাম আমাকে জোব করে পিছনে বসিয়ে দিয়ে নিজে সামনে উঠে বসল। টাঙ্গাওয়ালাকে বলল : কোনও মন্দিরে চল।

মহামন্দির !

মহামন্দির তো অনেক দূরে, শহবেব বাইরে। তাব চেয়ে কাছেব কোন মন্দিবে চল।

চলতে চলতেই জানতে পারলুম যে মহামন্দির শহবের বাহিবে প্রায় মাইল দুই দূরে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি ছোট শহর। একশোটি স্তম্ভের একটি বিরাট মন্দিরের জন্যে এই জায়গাব নাম হয়েছে মহামন্দির। নাথজীর মন্দিবের অভ্যন্তর নানা রঙে চিত্রিত। রাতে আমাদের ট্রেন যোধপুর ছেড়ে প্রথমে দাঁড়াবে বায় কি বাগ প্যালেস নামের একটি স্টেশনে. তার পরে মহামন্দির। মাণ্ডোর এই লাইনের তৃতীয় স্টেশন। আগে জানা থাকলে মাণ্ডোর যাবার পথে আমরা এই মন্দিরটি দেখে নিতে পারতুম।

এই লাইনেই ওসিয়ান নামে আর একটি স্টেশন আছে ছত্রিশ মাইল দূরে। এটি একটি প্রাচীন স্থান। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীতে এইখানে ষোলটি হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্য শৈলী ও কারুকার্যের জন্যে পুরনো মন্দিরগুলিই বেশি আকর্ষণীয়। বালুরাম বলল : আপনাদের হাতে সময় থাকলে

এই মন্দিরগুলি আপনাদের দেখে আসতে বলতাম। এত প্রাচীন মন্দির এই মরুভূমির দেশে বেশি নেই।

শহরের মধ্যে দুটি মন্দির উল্লেখযোগ্য—একটি কুঞ্জবিহারীর মন্দির, আর একটি মন্দির গঙ্গা শ্যামের। টাঙ্গাওয়ালা একটি মন্দিরের কাছে আমাদের নামিয়ে দিল।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বিস্ময় বোধ হল। মন্দিরের সূক্ষ্ম শিখর বিচিত্র কারুকার্যময়। দরজার সামনে একটি তোরণ। তার কারুকার্য জৈন মন্দিরেব মতো ত্রিভুজাকৃতি। দু পাশের দেওয়ালে দুখানি বিরাট তৈলচিত্র একই রকমের—একজন রাজপুত যোদ্ধার পিছনে বাঘ ও হাতী। এ মন্দির নিশ্চয়ই প্রাচীন নয়, খুব আধুনিকও নয়। ভিতরে কৃষ্ণের মূর্তি। স্বাতি প্রণাম করে ফিরে এল।

বালুরাম আমার সঙ্গে বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল: কিন্তু দেবদেবী সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট।

বালুরাম তার পদবী পরিত্যাগ করেছে বলে সে যে হিন্দু নয়, এ কথা আমাদের মনে ছিল না। তার এই মন্তব্য শুনেই মনে পড়ে গেল যে সে জৈন। তাই তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললুম: আমাদের ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়।

টাঙ্গায় উঠে বালুরাম বলল: এবারে কোথায় যাবেন?

আমি বললুম: স্টেশনে ফেরাই ভাল মনে হয়।

স্বাতি বলল: কোন বইএর দোকানে একবার দাঁড়াতে হবে।

কেন?

একখানা 'যোধপুর পরিচয়' কিনতে হবে, পাওয়া গেলে 'জয়সলমের পরিচয়'ও।

কিন্তু দু-তিনটি দোকানে চেষ্টা করেও কিছু পাওয়া গেল না। স্বাতি নিরুৎসাহ হয়ে বলল: এখানে যদি না পাওয়া যায় তো আর কোথাও আমরা পাব না।

বালুরাম তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল: কী জানতে চান বলুন, আমি যথাসাধ্য বলবার চেষ্টা করব।

স্বাতি বলল: যোধপুরে আমাদের কী দেখা হল না, আর আশপাশে কী দেখবার আছে

বালুবাম বলল: জয়সলমেব থেকে ফেরার পথে এক দিন এখানে থেকে গেলে আপনাদের দুটো সুন্দব লেক দেখাতে পারতাম—বাল-সমন্ধ আব কৈলানা লেক। ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বালকরাও পরিহার নির্মাণ করেছিলেন বালসমন্ধ লেক। তার তীরে একটি সুন্দব প্রাসাদ। বাগানটিও দেখবার মতো।

শহর থেকে কত দূরে?

স্বাতির এই প্রশ্নেব উত্তবে বালুরাম বলল: আমি সঙ্গে থাকলে মাণ্ডোর যাবার পথে দেখিয়ে দিতে পারতাম। এক নজরে দেখলেই মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যেত।

আর একটা লেক?

কৈলানা অন্য দিকে মাইল ছয়েক দূরে। তার নিকটেও একটি প্রাসাদ আছে। কিন্তু ভাববেন না যে যোধপুবে শুধু এই দুটোই জলাশয়। শহরে ও বাইরে আরও অনেকগুলি জলাশয় আছে, তার মধ্যে প্রধান হল পদম সাগর, রানী সাগর, গুলাব সাগর, আখেরাজীকি তালাও, উমেদ সাগর ও তখৎ সাগর।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: মরুভূমিতে এত সাগর!

বালুরাম বলল: এত সব সাগর আছে বলেই একে মরুভূমি বলে মনে হয় না। মরুভূমি এই এলাকার বাইরে।

বালুরাম একটু থেমে বলল: এ ছাড়াও যোধপুবে দেখবার জিনিস আছে।

কী?

চিড়িয়াখানা আর সর্দাব মিউজিয়ম।

স্বাতি মুখ টিপে হাসল। কিন্তু বালুরাম তা দেখতে না পেয়ে

বলল : কিন্তু যোধপুর রাজ্যের সব চেয়ে আকর্ষণীয় স্থান এখান থেকে অনেক দূরে। এক দিন সেখানে কাটিয়ে গেলে অপরিসীম আনন্দ পেতেন।

স্বাতি বলল : সে কি মরুভূমির মধ্যে ?

মাথা নেড়ে বালুরাম বলল : আরাবল্লা পাহাড়ের গায়ে। আপনারা আবু পাহাড়ে দিলওয়াড়া মন্দির নিশ্চয়ই দেখেছেন, কিন্তু রণকপুরের জৈন মন্দিরের নামই হয়তো শোনেন নি। দূর থেকে শোনবার কথা নয়। টুরিস্টরা যে পথে যাতায়াত করে, সে পথের উপরে নয় বলেই এ জায়গার নাম অনেকেই জানে না।

আমি বললাম : এখান থেকে কত দূরে ?

বালুরাম বলল : যোধপুর থেকে সড়ক পথে একশো মাইলের বেশি, আর উদয়পুর থেকে ষাট মাইল। যোধপুর থেকে উদয়পুরে যাবার পথে সদ্‌রি নামের একটা জায়গা থেকে মাইল ছয়েক ভেতরে যেতে হয়। কিন্তু আপনারা আরও সহজে যেতে পারবেন ট্রেনে।

রেলস্টেশন তো নেই !

মারবাড় জংশন আর আবুরোড স্টেশনের মাঝে ফল্‌না জংশনে নেমে পড়বেন। ফল্‌না থেকে সদ্‌রি চোদ্দ মাইল দূরে, বাসে সদ্‌রিতে নেমে পড়বেন, তার পরে বাস না পান, টাঙ্গা আছে।

একটু থেমে বালুরাম বলল : আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিমের ঢালে এক সুন্দর পরিবেশে এই মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। বিরাট এক এলাকা জুড়ে এই মন্দিরে চারশো কুড়িটি থামের উপরে উনত্রিশটি কক্ষ আছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে এতগুলি থামের কোন দুটির কারুকার্য এক রকম নয়। যেমন দিলওয়াড়ায়, তেমনি রণকপুরেও চোখ জুড়িয়ে যায়।

স্বাতি বলল : কোন্ দেবতার মন্দির ?

বালুরাম বলল : মন্দিরের মাঝখানে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেবারের রাণা কুম্ভের আমলে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। এখানকার পাহাড়েই রাণার কুম্ভনগড় দুর্গ।

টাঙ্গা এসে যে স্টেশনের সামনে থেমেছিল তা আমরা বুঝতে পারি নি। বালুরাম হঠাৎ তা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে নেমে পড়ল, আমরাও নামলুম।

১৭

স্টেশনের বাইরে থেকেই বালুরাম বিদায় নিতে চাইল, বলল : আমি আর আপনাদের বিরক্ত করব না।

স্বাতি সহাস্যে বলল : কিন্তু আমরা তো বিরক্ত হচ্ছি না। বরং আপনার কাছ থেকে আর একটি কথা শোনবার আগ্রহ আরও গভীর হয়েছে।

বালুরাম নিঃশব্দে তার দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল : আপনাদের বিয়ের ব্যাপারটা।

বালুরামের দৃষ্টি সহসা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে বলল : বলব, কিন্তু এখন নয়।

আমি বললুম : আবার কবে দেখা হবে ?

পরশু সকালেই তো দেখা হচ্ছে !

কিন্তু আমরা যদি যোধপুরে না নেমে এগিয়ে যাই ?

বালুরাম বলল : তাহলেও দেখা হবে। জয়সলমেরের ট্রেন সকাল পৌনে সাতটায় এখানে আসবে, আর মারবাড়ের ট্রেন এখান থেকে ছাড়বে আটটায়।

স্বাতি বলল : ট্রেন লেট হলেই তো বিপদ !

বালুরাম বলল : সে রকম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কিন্তু—

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : আমাদের ট্রেন ফেল হবার সম্ভাবনা না থাকলেও আপনি হয়তো কিছু বলবার সুযোগ পাবেন না।

কেন ?

ট্রেন এসে পৌঁছবার পরে আমরা এক গাড়ি থেকে নেমে

আর এক গাড়িতে উঠব। সম্ভব হলে একটু জলযোগ করব। তখন আমাদের নিয়ে আপনিই হয়তো এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে কিছু বলার মতো মনের অবস্থা থাকবে না। তার চেয়ে—

বালুরাম বলল: এখনও তো আপনারা ব্যস্ত।

স্বাতি বলল: মোটেই না।

এখন আপনাদের রাতের আহার সেরে নিতে হবে, মালপত্র সংগ্রহ করে ট্রেনে উঠতে হবে--

রাতের আহার!

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: এত মিষ্টি খাবার পরেও আবার আহার। তবে আপনার যদি—

বালুরাম বলল: অন্ধকার হবার পরে তো আমরা কিছু খাই না!

সে কি, আমাদের জন্যে আপনার আজ খাওয়া হল না।

আপনাদের খাওয়া হচ্ছে না কেন?

বললুম: খাবার দরকার নেই বলে।

বালুরাম বলল: আমারও তাই। আমি আপনাদের চেয়ে একটা জোরালো কারণ দেখিয়েছি মাত্র।

স্বাতি বলল: তবে আসুন, আপনাদের গল্পটা আজই শুনব।

বলে স্বাতি আমাদের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে টেনে আনল। বলল: ট্রেনের এখনও সময় আছে। তার আগে একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

বালুরাম বলল: আমি ওসব খাই না, আপনারা খান।

স্বাতি বলল: তাহলে আপনি দুধ খান।

বালুরাম বলল: এখানে তো খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। আমি বাড়ি গিয়ে খাব। শোবার আগে আমরা রোজই দুধ খাই।

স্বাতি বলল: আপনারই জয় হোক।

আমি বললুম : কিন্তু আমরাও হারতে চাই না। আপনাব গল্প আজ আমরা শুনবই।

বালুরামকে আবার বড় বিষণ্ণ দেখাল। খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে বলল : আপনাদেব যত দেখ'ছ ততই মনটা খারাপ হচ্ছে। পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে আপনাদের কাছ থেকে।

আমরা দুজনেই যেন চমকে উঠলুম। স্বাতি আর্তনাদ করে উঠল : সে কি!

বালুরাম গভীর স্বরে বলল : হ্যাঁ, সত্যি কথা। কিন্তু সে আপনাদের জন্যে নয়, সে আমার নিজের জন্যেই। নিজেকে বড দুঃখী বড অসহায় বড় ভীরু মনে হচ্ছে।

কেন?

আমাদের মতো সমস্যা হয়তো আপনাদের জীবনেও ছিল, অনেক বাধা—কিন্তু পবস্পরের প্রতি বিশ্বাসেব জোরে আপনারা সবই অতিক্রম করে এসেছেন। আপনাদের যত দেখছি, ততই এই কথা সত্য বলে মনে হচ্ছে।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ করল না, সমর্থনও করল না।

বালুরাম বলল : আপনারা কিছু না বললেও আমার বুঝতে যে একটুও ভুল হয় নি, তা আমি বুঝি। আর এই জন্যেই নিজেকে বড় দুঃখী, বড় অসহায় ও ভীরু বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললুম : আমিও খুব ভীরু ছিলুম, স্বাতি আমাকে সাহস জুগিয়েছে।

কিন্তু আমাকে সাহস জোগাবে কে?

স্বাতি বলল : সুভদ্রা কী বলে?

গোলমাল তো তার জন্যেই। তাদের সমাজের নিয়ম অনুসারে একেবারে শৈশব থেকেই সে বাগদত্তা হয়ে আছে।

স্বাতি বলে উঠল : এ কি একটা বড় বাধা!

বালুরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এ দেশের নিয়মকানুন

আপনারা জানেন না বলেই এ কথা বলছেন। বিবাহের বন্ধন যেমন, বাগদত্ত হওয়াও প্রায় তেমনি। মেয়েদের দু-তিন বছর হতে না হতেই তাদের বিবাহ স্থির করে বাগদান হয়ে যায়। তাব পবে আব নডচড হবাব উপায় নেই।

স্বাতি বলল: বড় হবাব পবে ছেলে-মেয়েদেব মতামত বলে কিছুই নেই?

নিজেদের মত থাকলেই বিপদ। এই মতেব জন্যেই সুভদ্রাব জীবনে এত বড একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

বিপর্যয় কিসেব?

বালুবাম বলল: যাব সঙ্গে সে বাগদত্ত, সে তার যোগ্য নয় বলে সুভদ্রাব ধাবণা।

কেন?

তাব বাপেব অনেক পয়সা। ছেলেকে লেখাপড়া না শিখিয়ে ব্যবসায় নামিয়েছে, সুভদ্রাব ধাবণা যে ব্যবসাদাব যাবা তাদেব কোন আদর্শ নেই, পয়সার জন্যে মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে পাবে। আর তারা সুভদ্রার মনোভাব পুরোপুরি জানা সত্ত্বেও বিয়ে করে তাকে ঘরে আনতে চাইছে।

কেন?

সুভদ্রার বাবারও অনেক পয়সা। নতুন আইনে সুভদ্রা যা পাবে, তার পরিমাণও অনেক।

স্বাতি বলল: আপনার দিক থেকে তো কোন বাধা নেই?

বালুরাম বলল: এখন নেই।

আগে কী রকমের বাধা ছিল?

আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল, সে এখন বেঁচে নেই। তার মৃত্যুর জন্যে লোকে অবশ্য আমাকেই দায়ী করে।

স্বাতি চমকে উঠে বলল: কেন?

বালুরাম সহজভাবে বলল: তাকে বিয়ে করতে আমারও

আপত্তি ছিল, কিন্তু সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। সুভদ্রা ছিল আমার প্রতিবেশী। স্কুলে কলেজে পড়বার সময়ে কেমন করে আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই, তা অল্প কথায় বলতে পারব না। বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে সুভদ্রাই প্রথমে বিদ্রোহ করল। বলল, বিয়ে করব না। পড়াশুনো শেষ করে এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাব। সুভদ্রার ধনুক-ভাঙা পণ। এখন সে বিকানেরে একটা মেয়ে-স্কুলে পড়াচ্ছে।

আর আপনি ?

আমি কেন বিয়ে করতে রাজী হই নি, তার কারণ বোধহয় একটিই। সুভদ্রার কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে যে সে তার নিজের পছন্দ মতো স্বামী নির্বাচন করতে চায় এবং আমাকে গ্রহণ করতে তার আপত্তি হবে না। আমিও তাই আমার বিবাহটা পিছিয়ে দিতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে যোধপুরে পালিয়ে এসে কলেজে পড়াচ্ছি। সবার ধারণা হয়েছে যে আমরা সমাজবন্ধন মানতে চাই না।

আমি বললুম : কিন্তু বাগদত্ত মেয়ের মৃত্যুর জন্যে আপনাকে দায়ী করছে কেন ?

বালুরাম হাসবার চেষ্টা করে বলল : না, খুন-টুন করি নি। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। লোকে বলে, সময় মতো বিয়ে হলে সে আত্মহত্যা করত না। তার মৃত্যুর জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে সবাই—বিশ্বাসভঙ্গের জন্যে আমি দায়ী।

বলে বালুরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনার মনে কি এই ঘটনার জন্যে কোন অনুশোচনা আছে ?

অনুশোচনা !

বললুম : হ্যাঁ।

বালুরাম বলল : আমার জন্যে কারও মৃত্যু হয়েছে, এ কথা

ভাবলে দুঃখ হয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হতে পারতাম না। সে আমার ধর্মপত্নী হত, কিন্তু সহধর্মিণী হতে পারত না। হয়তো সেও সুখী হতে পারত না।

স্বাতি বলল : সুভদ্রার মুক্তির কি কোন পথ নেই ?

না।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিবাহ করতে হবে ?

বালুরাম বলল : সমাজের এই নিয়ম। দুটি অপরিণত বয়সের শিশুকে যাঁরা বাগদত্ত করেছেন, তাঁরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেবেন না।

যদি সুভদ্রা আপনাকে বিয়ে করে ?

বিয়ে হতেই পারে না।

কেন ?

বিয়ে দেবে কে ?

স্বাতি বলল : যে কন্যার আত্মীয়স্বজন নেই, তার কি বিবাহ হয় না ? পুরোহিত কি বিবাহ দিতে পারেন না ?

বালুরাম বলল : আমাদের দুজনেরই বাপ-মা আমাদের ত্যাগ করবেন, সমাজ থেকে বিতাড়িত হব আমরা। এ দেশে আমাদের স্থান হবে না।

স্বাতি সহাস্যে বলল : ব্যস !

আপনি হাসছেন ?

বলে বালুরাম আমার দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল : (প্রেম অনেক বড় বালুরামবাবু, প্রেমের জন্যে প্রাণ দেওয়া যখন তুচ্ছ মনে হবে তখনই প্রেম সার্থক, তখন কোন বাধা আর বাধা মনে হবে না)। আপনারা অপেক্ষা করতে পারেন।

বালুরাম বোধহয় কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : স্বাতির কথা আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলেন না।

না।

স্বাতি বলছে, (দেখাশুনো ভাব-ভালবাসার নাম প্রেম নয়। প্রেম বীণার মতো একটি যন্ত্র। একজনের হৃদয়ে যখন বাজে, তখন আর কেউ তা জানতে পারে না। যদি সেই বাজনা আর একজনের হৃদয়ের বীণাকেও বাজাতে পারে, তবে তাকেই আমরা প্রেম বলব। দুজনের হৃদয়ে দুটি বীণা পরস্পরের সুখে দুঃখে এক সুরে বাজবে।)

স্বাতি বলল: বিয়ের কথাটাও বুঝিয়ে বল।

বললুম: (এক দিন এই দুটি হৃদয় পরস্পরের কাছে নীরবে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়ে যাবে, তারই নাম বিবাহ। লৌকিক বিবাহ তো দৈহিক মিলনের জন্যে সমাজের ছাড়পত্র। তার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

স্বাতি বলল: রাধাকৃষ্ণের কথা ভাবুন। বিবাহিত রাধা কি সমাজের রীতিনীতি মানতে পেরেছিল! প্রেম এমন জিনিস যে তার দুর্বার শক্তি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অনায়াসে।

সহসা বালুরামের দু চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বলল: ঠিক বলেছেন। আমাদের প্রেমের পরীক্ষা এখনও হয় নি।

স্বাতি হেসে বলল: পাস করবার পরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে চলে যাবেন, সমাজের নিয়মকানুন সেখানে মানতে হবে না।

২০

আমাদের ট্রেন ছাড়ল। বালুরামকে বিদায় দিয়ে আমরা ক্লোকরুম থেকে মালপত্র বার করে এনেছিলুম। ট্রেনে উঠে অপেক্ষা করছিলুম ট্রেন ছাড়বার। যোধপুর ছেড়ে পর পর কয়েকটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায়—রাইকা বাগ প্যালেস, মহামন্দির আর মাণ্ডোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই স্টেশনগুলো পেরিয়ে গেলুম। তার পরেই স্বাতি বলল : এইবারে শুয়ে পড়।

ট্রেনে ভিড় ছিল না। অনেক ফাঁকা জায়গা। মরুভূমির দেশে বোধহয় যাত্রীর ভিড় নেই। আমাদের দেশের মতো একটুখানি দাঁড়াবার জায়গা নিয়ে মারামারি হয় না। তাই গাড়িতে উঠেই বেঞ্চির ওপরে বিছানা বিছিয়ে নিয়েছিলুম। স্বাতির কথায় কোন আপত্তি না করে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু ঘুম এল না। অনেক আজগুবি অবান্তর কথা মনে আসতে লাগল। স্বাতি যদি সুভদ্রার মতো হত তাহলে আমার জীবন হত অন্য রকম। বালুরামের মতো আজও আমাকে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে হত। তার সংকল্পে যে দৃঢ়তা আছে, আমার তা নেই।

সেই দিনটির কথা আমার মনে পড়ছে। দার্জিলিঙের হাসপাতালে আমি শুয়ে আছি। কালিম্পঙ থেকে দার্জিলিঙে আসার পথে একটা দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিলুম। সন্ধ্যেবেলায় ডাক্তার আমার কাছে এসে উজ্জ্বল চোখে বলেছিলেন : কাল বোধহয় তিনি এসে পৌঁছবেন।

আমি মুখ তুলে বলেছিলুম : কে ?

ডাক্তারের মুখে স্বাতির নাম শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম।

বিস্ময়ের আমার অন্ত ছিল না। তাই দেখে ডাক্তার বলেছিলেনঃ দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছিলেন, কেমন আছেন জানতে চাইলেন, তার পর বললেন যে প্রথম প্লেনেই তিনি রওনা হচ্ছেন।

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে উঠেছিল। স্বাতি আমার কথা জানল কী করে, কে খবর দিল তাকে, সে কি একা আসছে, না তার বাবা-মাও সঙ্গে আসছেন! কিন্তু স্বাতির বাবা আসবেন কেমন করে! তিনি তো সুস্থ নন! আর তিনি না এলে তার মা-ই বা কেমন করে আসবেন তাঁকে ফেলে। তবে কি স্বাতি একা আসছে!

আমি জানতে চেয়েছিলুম, স্বাতি আমার খবর পেল কী করে!

তার উত্তরে ডাক্তার বলেছিলেনঃ আমরাই খবর দিয়েছি। আপনার পকেটে দুখানা চিঠি ছিল—একখানা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া, আর একখানা তাঁকে লেখা। আপনি বোধহয় পোস্ট করবার জন্য পকেটে রেখেছিলেন।

তার পরেই বলেছিলেনঃ ভালই হল, আমাদের আর ভাবনা রইল না।

বলে নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমার ওপরওয়ালা মিস্টার ইলিস জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ শি ইজ ইওর—

শি ইজ মাই-

কথাটা আমি শেষ করতে পারি নি, ভেবে পাই নি কী বলব। তার আগেই সাহেব বলেছিলেনঃ বুঝেছি।

তাঁর মুখে ছিল সরল প্রসন্ন হাসি, আর ডাক্তারও হাসছিলেন। আমি আরও বেশি লজ্জা পেয়েছিলুম।

সেদিন লোকের কাছে স্বাতির আমি কী পরিচয় দেব, সেটা একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু স্বাতির কাছে এটা বোধহয় কোন

সমস্যাই ছিল না। তার মন সংকল্পে কত দৃঢ় ছিল, সেদিন আমি গভীব ভাবে অনুভব কবেছিলুম।

ডাক্তাবেব সঙ্গে তাকে এগিযে আসতে দেখে আমাব মন পুলকে দুলে উঠেছিল। সে একা এসেছে, কত দূব থেকে এসেছে, কত কষ্ট পেযেছে পথে, কত উদ্বেগে উদ্বেল হযেছে তাব মন। স্বাতি এসেছে, আব কাবও কাছে নয, আব কোন কাজে নয, আমাব কাছে আমাকে দেখবাব জন্যেই দিল্লী থেকে দার্জিলিঙে ছুটে এসেছে। না এসে সে থাকতে পাবে নি, থাকতে পাবত না। খাট থেকে আমি লাফিযে নামতে চেযেছিলুম, অভ্যর্থনা কবতে চেযেছিলুম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। কিন্তু আমাব কী হল জানি নে, স্বাতি যখন আমাব কাছে এসে দাঁড়াল, আমি কোন কথা কইতে পাবলুম না, শুধু তাব মুখেব দিকে চেয়ে বইলুম অপলক দৃষ্টিতে।

স্বাতিও সহসা কোন কথা কইতে পাবল না, দু চোখ তাব ছলছল কবে উঠল।

ডাক্তাব একবাব আমাব মুখেব দিকে, আব একবাব স্বাতিব মুখের দিকে তাকালেন। কী বুঝলেন তিনিই জানেন, কোন কথা না বলে তিনি ফিবে গেলেন।

তার পবে স্বাতি আমার বিছানাব ধাবে বসে পড়েছিল, আমাব ডান হাতখানা টেনে নিয়েছিল নিজেব দু হাতের মধ্যে। আমাব ঠাণ্ডা হাতেব উপবে যে ফোটা ফোঁটা জল পডছিল, তা আমি অনুভব কবছিলুম। কিন্তু স্বাতিকে আব আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না।

এ তো বেশি দিন আগেব কথা নয়, এব পবে একটা বছবও কাটে নি। কিন্তু এরই মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটে গেল।

আমি কি নিজে কিছু করতে পাবতুম! সে দৃঢ়তা আমাব কোথায়! আমাকে কিছু কবতে হলে আজও আমাকে বালুবামেব মতো অসহায় ভাবে অপেক্ষা কবতে হত।

আমাদের মধ্যে বাধা ছিল সামাজিক ব্যবধানেব। আমার মনে প্রতিবাদ ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ করার মতো দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু স্বাতি মনে মনে বিদ্রোহ করেছিল প্রথম দিনই, কিংবা বিদ্রোহ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। তাই তাকে অনেক সময়েই আমার বেপরোয়া মনে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছিল। বিদ্রোহ করবার আগেই বিধাতা আমাকে সাহায্য কবেছিলেন।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ট্রেন এখন ছুটছে। অনেকক্ষণ পর পর দাঁড়াবে এক একটা স্টেশনে। যাত্রীরা ওঠা-নামা করবে। আর আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোব। এক সময়ে আমরা পোকারন ছাড়িয়ে যাব। আগে এইখানে নেমে বাস ধরতে হত। এখন নতুন লাইন হয়েছে জয়সলমের পর্যন্ত। ভারতের প্রায় শেষ প্রান্তে মরুভূমির মাঝখানে এই জয়সলমের। ঘুম থেকে উঠে আমরা মরুভূমি দেখতে পাব পথের দু ধারে। এখন আমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত। তা না হলে সময় মতো ঘুম ভাঙবে না।

ঘুম যে কারও আজ্ঞাবহ নয়, এ কথাটা সবাইকেই মানতে হয়। ঘুম রাজার আদেশ মানে না, প্রজার মিনতি মানে না। নীতির অনুশাসন সমাজের শাসন সবই সে অবজ্ঞা করে। ঘুমের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই, কোন দণ্ড নেই। তার মর্জি মেনে চলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তবু আমরা ঘুমের কাছে কৃতজ্ঞ। তার কৃপাকে দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করি। সে নিজেই কৃপা করে, পরিশ্রমী মানুষের প্রতিই তার বেশি দরদ। অলসকে বোধহয় কিছু ঘৃণা করে। কিন্তু তার কৃপা থেকে কেউই পুরোপুরি বঞ্চিত হয় না। সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণই তার কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। ঘুমকে আমি সেই কথাই জানিয়ে দিলুম—সারা দিন আমরা অনেক ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি ও শুনেছি। এখন বিশ্রাম চাই, ভুলে যেতে চাই সবকিছু। নতুন জীবন শুরু করতে চাই কাল সকালে।

কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ঘুম ভাঙার পরে বুঝতে পারছিলুম না সকাল হয়েছে কিনা। আমি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই স্বাতি বলল: আর একটু শুয়ে থাকো।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: তুমি জেগে আছ?

বোধহয় এক সঙ্গেই জেগেছি।

তার মানে এই মাত্র।

ওধার থেকে স্বাতি বলল: সকাল হয়েছে কিনা তুমি যে দেখতে চাইছ, আর আমি তা জেনে ফেলেছি। কলকাতায় সূর্যোদয় হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু এখানে তার সময় এখনও হয় নি।

আমি বললুম: সূর্যোদয়েব আগেও তো অনেক কিছু দেখা যায়!

দেখবার জন্যে মন অনেক আগে থেকেই ছটফট করে।

বললুম: মরুভূমিতে সূর্যোদয় বোধহয় সমুদ্রের মতো কিংবা টাইগার হিলের মতো রোমাঞ্চকর।

সহসা স্বাতি সোজা হয়ে বসল। বলল: আমি এখনই তৈরি হয়ে আসছি।

বলে তার বড় ব্যাগের ভেতর থেকে তোয়ালে আর মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম বার করে বেরিয়ে গেল। আমিও আব শুয়ে না থেকে জানলার ধারে গিয়ে বসলুম।

অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু সূর্যোদয়ের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে না পূর্বের আকাশে। রেল লাইনের ধারে কোন লোকালয় নেই, নেই কোন শ্যামল বৃক্ষলতা। শুধু বালি বিস্তীর্ণ জলরাশিব মতো দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে।

হ্যাঁ, বালিই বটে। কিন্তু জলের ঢেউএর মতো অসমতল। কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে টিলার মতো। আবার নেমে গেছে। মাঝে মাঝে কালো ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো বোধহয় কোন গুল্ম, কাঁটাগাছের ঝোপ। কোথায় যেন পড়েছিলুম যে

মরুভূমির এই পরিবর্তনশীল বালিয়াড়িকে স্থানীয় ভাষায় ধ্রিয়াল্‌স্‌ বলে। এক এক জায়গায় এই দৃশ্য অতি বিচিত্র।

দেখতে দেখতেই অন্ধকারের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে গেল. আলোকিত হয়ে উঠল পূর্বের আকাশ। এ যেন শয্যা ত্যাগের পরে পৃথিবীর প্রতি দিনের প্রসাধন। সর্বত্র একই দৃশ্য। অনেক দূরে দূরে এক একটি গাছ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পত্রবহুল গাছ নয়, মরা গাছ বলেই মনে হয়।

স্বাতি এক সময়ে ফিরে এসে আমার সামনে বসল। বলল : কী দেখছ ?

বললুম : এ অঞ্চলে যে গাছপালা হয়, তার নাম মনে করবার চেষ্টা করছি।

স্বাতি বাহিরের দিকে চেয়ে বলল : ও সব তো বাবুল কাঁটার ঝোপ মনে হচ্ছে !

হেসে বললুম : তার নাম বোধহয় অ্যাকেসিয়া অ্যারাবিকা। অ্যাকেসিয়া জাতের সেনেগানও মরুভূমিতে জন্মায়।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি বিস্ময় দেখতে পেলুম। আমার মুখে গাছ-গাছালির বটানিকাল নাম শুনেই বোধহয় সে বিস্মিত হয়েছে। তাই এ সব নাম কোথায় জানলুম তা বলবার আগে নিজের বিদ্যা আরও একটু প্রকাশ করবার চেষ্টা করলুম : প্রোসোপিস জাতের স্পিসিজেরা গাছও এ অঞ্চলে ভাল বাঁচে। শুধু বালির উপরে নয়. শুকনো পাহাড়েও দেখতে পাওয়া যায়। খুব ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু এ গাছের কাঠ বেশ ভাল। অন্যখান থেকে আসা প্রোসোপিস জাতের জুলি ফ্লোরা এ অঞ্চলে আরও ভাল হচ্ছে। যে কোন জায়গায় বাড়ে, বালিয়াড়ি শক্ত করে। ছায়া দেয় আর পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

স্বাতি এবারে সরাসরি প্রশ্ন করল : এ সব কথা আবার কোথায় জানলে ?

হেসে বললুম ঃ বালুবামের কাছে নয়।

তা জানি।

কোন ভূগোলের বইএ পড়েছি বলে মনে হচ্ছে, কিংবা কোন প্রবন্ধে।

স্বাতি বলল ঃ এ সব গাছের সাধারণ নাম কি ঝাউ গাছ ?

বললুম ঃ ঝাউ গাছের ইংরেজী তো ট্যামারিস্ক্ বলে জানি।

সমুদ্রের ধারে যে ক্যাজুবিনা গাছ দেখা যায়, সে কোন জাতের ?

ও রকম নাম ইংবেজী অভিধানে দেখি নি।

স্বাতি হেসে বলল ঃ তবে যা জানো, তাই বল।

বালির উপরে স্থানে স্থানে ছায়াব মতো দেখতে পাচ্ছিলুম। সেই দিকে স্বাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম ঃ দেখ তো, মাঝে মাঝে ছায়া দেখতে পাচ্ছি, না ঘাস গজিয়েছে জায়গায় জায়গায় ?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ বালিব উপরে ঘাস গজাবে কেন ?

হেসে বললুম ঃ সেই প্রবন্ধে আরও জেনেছিলুম যে পোকারন আর জয়সলমেরের মাঝে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘাস জন্মায়। দু জাতের ঘাস একেবারে শুকনো মরুভূমির মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘাস খেয়েই বাঁচে গরু ভেড়া। আর পণ্ডিতরা মনে করেন যে বালির কাছাকাছি আছে জল এবং চেষ্টা করলেই এখানে ভাল গোচারণ ভূমি তৈরি করা যেতে পারে। এখানে ডেয়ারি গড়ে তোলা নাকি খুব কঠিন কাজ হবে না।

একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াল। তাব পরে আবার চলতে লাগল। রেল লাইনের দু ধারেই বালি। স্টেশনের ঘরটি ছোট। প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু নেই, সবই বালি।

স্বাতি বলল ঃ ধনুস্কোডির কথা তোমার মনে আছে ?

যে ধনুস্কোডি এখন সমুদ্রের গর্ভে চলে গেছে !

স্বাতি বলল ঃ আমরা যেখানে রেল লাইনের উপর থেকে

বালি সরাতে দেখেছিলাম। অনেক কুলি মজুর নাকি সারা দিন বালি সরিয়ে রেল লাইনটা পরিষ্কার রাখে। তা না হলে লোহার লাইন বালির নিচে চাপা পড়ে যাবে। আর হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

বললুম: এখানেও হয়তো সে রকম ব্যবস্থা আছে।

হঠাৎ কয়েকটি উটের দিকে আমাদের নজর পড়ল। অনেক দূরে বালির মাঝে কোন পথ দিয়ে চলেছে তিন-চারটে উট। মনে হচ্ছে একটি উটের পিঠে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছে কোন রাজস্থানী নারী। তার পিছনে পাগড়ি মাথায় পুরুষ। সামনের একটি উটে একজন পুরুষ আরোহী। পিছনের উট দুটিতে একাধিক লোক বসেছে, জিনিসপত্রও আছে কিছু। স্বাতি বলল: তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে?

বললুম: ওরা গ্রামান্তরে যাচ্ছে।

স্বাতি বলল: বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরছে কোন রাজস্থানী যুবা।

আমি হেসে বললুম: হয়তো তাই।

তার পরেই বললুম: ঐ যে উট দেখছ, ঐ উটেরও দুটি জাত আছে। জয়সলমেরী উটে চড়ে মানুষেরা যাতায়াত করে। আর বিকানেরী উট বোঝা বইবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। জয়সলমেরের ভারবাহী উটও দেখতে বিকানেরী জাতের মতো। মরুভূমিতে ভেড়াও আছে দু জাতের—জয়সলমেরী আর মারবাড়ী। এ অঞ্চলের সমস্ত ভেড়ার লোম বম্বে চলে যায় বিদেশে রপ্তানির জন্যে।

স্বাতি বলল: কোন স্টেশনে আমি একখানা সুন্দর ছবি দেখেছিলাম। একটি রাজস্থানী মেয়ে মরুভূমির বালি খুঁড়ছে জলের জন্যে। কলসি শূন্য, চোখে অসহায় দৃষ্টি। দূরে উট চলেছে, তার পিঠেও জলের কলসি, দু ধারে ঝুলছে।

বললুম : জল আনবার জন্য গাধার ব্যবহারও আছে। তার পিঠে কাঠের ফ্রেমে জলের কলসি বা চামড়ার মশক। পাশে পাশে চলে গ্রামের মানুষ। নদীর বুক শুকিয়ে গেলেও বালি খুঁড়ে জল পাওয়া যায়। আর যেখানে জল পাওয়া যায় তারই ধারে-কাছে মানুষের বস্তি ওঠে গজিয়ে।

স্বাতি বলল : এ অঞ্চলের বাড়ি দেখেছ ?

পথের ধারে এখনও দেখতে পাই নি, দেখেছি ছবিতে। আর দু রকমের বাড়ি দেখেছি বলে তা স্পষ্ট মনে আছে।

স্বাতি বলল : বিকানের স্টেশনে ঢোকবার আগে এক রকমের ঘর বাড়ি দেখেছিলাম। কিন্তু ভাল করে দেখবার আগেই সে জায়গাটা পেরিয়ে এসেছিলাম।

আমি বললুম : দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। দুখানা ছবি আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখেও অনেক কথা বুঝতে পারি নি।

স্বাতি বলল : যতটুকু বুঝেছ ততটুকুই বল।

বললুম : দু জাতের বাড়িকেই কুঁড়ে ঘর বলতে হয়। বাড়ির সামনে ও আশেপাশে বালি দেখে মরুভূমির ঘরবাড়ি বলেই মনে হয়। যেটিকে বিকানেরের গ্রামে বলা হয়েছে, তার তিন চালা ছাদ গোল আকৃতির। প্রথম ও দ্বিতীয় চালের উপরে তৃতীয় চাল—সবই খড়ের। কুঁড়ের দেওয়ালও মনে হয়েছে বাঁশ আর খড়ের। বাড়ির চারি দিক ঘিরে কাঁটা ঝোপের বেড়া, পিছনে একটি বিরল পত্রের গাছও আছে, আর অন্য ধারে একটি খড়ের গাদা।

স্বাতি বলল : দ্বিতীয় ছবিটি কি অন্য এলাকার ?

বললুম : তার নিচে লেখা বিকানের ও বার্মের মরু অঞ্চলের বাড়ি। সেখানে খড়ের চাল নেই, কাঁটা ঝোপের বেড়া নেই। পাথর বা কাদার দেওয়াল, সমতল ছাদও বোধহয় পাথরের। তার চারি দিক ঘিরে নিচু পাঁচিল। পাথরের হলেও তার উপরে মাটি লেপা আছে, আর সেখান থেকে ছাদে ওঠবার জন্যে সিঁড়ির মতো ধাপ

আছে। অঙ্গনের এক ধারে ছোট ছোট দুটি ঘরের মতো। বড়-লোকের বাড়ির গেটের পাশে যেমন বন্দুকধারী সেপাইয়ের দাঁড়াবার জন্যে ঘর থাকে, কতকটা তেমনি। কিন্তু দরজা নেই, আছে একটি করে চৌকো জানলা।

গাছপালা নেই?

বাড়ির পিছনে একটি গাছ আছে, আর খানিকটা দূরে বালিয়াড়ি টিলার উপরে নানা জাতের গাছ ও ঝোপঝাড়।

স্বাতি বলল: তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে যে প্রথম কুঁড়েটি এমন কোন গ্রামের যেখানে চাষবাস আছে, আর দ্বিতীয়টি মরুভূমি অঞ্চলের।

বললুম: বোধহয় তাই। ধানের চাষ তো নেই, খড় পায় গম বা বাজরা থেকে। ওদের চাষের ছবিও দেখেছি। আমাদের বাঙলার মতো সহজে ফসল হয় না বলে খুবই যত্নে চাষ হয়। আব চাষীরাও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মতো পোশাক পরে চাষবাস করে—সাদা ধুতি পরে মালকোঁচা দিয়ে, গায়ে সার্ট বা পাঞ্জাবি, আর মাথায় সাদা কাপড়ের মস্ত পাগড়ি।

স্বাতি বলল: আমাদের বাঙলার চাষী ভাবতে তো একেবারে ভিন্ন ধরনের চেহারা মনে আসে—কোমরে এক টুকরো কাপড় ছাড়া গায়ে বা মাথায় আর কিছু নেই। যাদের কাপড় জামা আছে, তারা নিজেরা চাষ করে না, চাষ করায় মজুর রেখে।

ট্রেনের গতি এই সময়ে মন্থর হয়ে আসছিল। স্বাতি তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বড় ব্যাগের ভিতর থেকে তার ক্যামেরা বার করে বলল: এইবারে ট্রেন থামলে খান কয়েক ছবি তুলে নেব—স্টেশনের ছবি আর মরুভূমির ছবি।

গাড়ি থামতেই স্বাতি নেমে পড়ল, আর আমি দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম।

২১

সকাল সাড়ে আটটায় আমরা জয়সলমেরে পৌঁছলুম। একতলা ছোট স্টেশন নতুন তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমে কুলি দেখতে পেলুম না। তার বদলে দু-তিনটি বালক এগিয়ে এল। কুলি দেখতে না পেয়ে স্বাতি আমাদের মালপত্র এগিয়ে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু তার আগেই সেই ছেলেরা গাড়িতে ঢুকে পড়ল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাতি নেমে পড়ল।

আমি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলুম। রিটায়ারিং রুম নেই, একটা ওয়েটিং রুম আছে। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে একটি চায়ের স্টল আছে বলে মনে হল। তার সামনে দাঁড়িয়ে দু-একজন চা খাচ্ছে।

স্টেশনের বাইরেটাও দেখতে পাচ্ছি। কোন যানবাহন নেই। চারি দিকে ধুধু করছে শুষ্ক প্রান্তর। মরুভূমি বলেই মনে হচ্ছে। আর অনেকটা দূরে একটা নিচু পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে একটি দুর্গ। ওইটিই যে জয়সলমেরের দুর্গ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেমন করে ওখানে পৌঁছনো যাবে তাই ভাবনার কথা।

ছেলেরা টানাটানি করে তখন আমাদের জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলেছিল। এগুলো কোথায় নিয়ে যেতে হবে জানতে চাইল। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: রাতের গাড়িতেই ফিরব তো, কাজেই স্টেশনেই কোথাও রাখা যাক।

ছেলেদের একজন ছুটে গিয়ে ওয়েটিং রুমের তালার চাবি নিয়ে এল। অন্যেরা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখল দরজার সামনে। দরজা খোলা হলে আমরা ভিতরে ঢুকলুম। জিনিসপত্রও সাজিয়ে রাখা হল।

ওয়েটিং রুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম আছে, জলও আছে। স্টেশনে জল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ছিল বলে গাড়িতেই আমরা কাক-স্নান করে নিয়েছিলুম। এইবারে স্টেশনে চা খেয়ে দুর্গ দেখতে যেতে হবে। কিন্তু প্রথম সমস্যা আমাদের মালপত্র কে দেখবে। আর দ্বিতীয় সমস্যা যানবাহনেব।

স্বাতি বলল: তোমার গাইড বইএ তো টাঙ্গাব কথা আছে। স্টেশনের বাইরে হয়তো টাঙ্গা পেয়ে যাব।

আমি বললুম: মালপত্রের কথা তাহলে স্টেশন মাস্টারকেই জিজ্ঞাসা কবা যাক।

বলে আমবা পাশের ঘরে এসে উপস্থিত হলুম। ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়ে বললেন: এই ছেলেরাই দেখবে, কিছু হারাবার ভয় নেই। এরা সব স্টেশন স্টাফের ছেলে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: শহরে যাবার জন্যে গাড়িঘোড়া পাওয়া যাবে না ?

ভদ্রলোক বললেন: পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। আর কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

আমি বললুম: উটের গাড়ি !

ভদ্রলোক বললেন: এ দিকে কিছুই পাওয়া যায় না।

বাহিরে এসে স্বাতি বলল: হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আমি বললুম: ভাগ্য প্রসন্ন হলে—

আকাশ থেকে হেলিকপ্টার নামবে।

বলে স্বাতি হাসল।

কিন্তু ভাগ্যের কথা আমি বলেছিলুম একজন মিলিটারি অফিসারকে দেখে। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি চা খাচ্ছিলেন।

আমরাও চায়ের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। গরম চা

পাওয়া যাবে, কিন্তু কাচের বাক্সের ভেতরে যে খাবার আছে, তা খেতে প্রবৃত্তি হল না। লাড্ডু জাতীয় জিনিস, কিন্তু কত দিনের বাসি তা বলা যায় না। স্বাতি এক প্যাকেট বিস্কুট কিনল, আর চা করতে বলল আমাদের জন্যে।

এই সুযোগে আমি মিলিটারি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে ফেললুম। চা শেষ করে ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তাঁর জিনিসপত্র ছিল পায়ের কাছে রাখা। সেই দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলুম: যাবেন কী করে?

ভদ্রলোক বললেন: জীপের অপেক্ষা করছি।

তার পরেই প্রশ্ন করলেন: আপনারা কোথায় যাবেন?

বললুম: শহর দেখতে এসেছিলুম। এখন দেখছি স্টেশন থেকেই ফিরে যেতে হবে।

কেন?

চোখের সামনেই দুর্গ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে ঐ পাহাড়ের নিচে পৌঁছনো যাবে, তার পরে উঠতে হবে পাহাড়ে। তাই উত্তর দিলুম: পায়ে হেঁটে অত দূর পৌঁছতে আমরা পারব না।

একজন বললেন: দূর বেশি নয়, রাস্তা ধরে না গিয়ে এই দিকে সোজা চলে যাবেন।

আর একজন বললেন: পাহাড়ও বেশি উঁচু নয়। হেঁটে উপরে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু মিলিটারি অফিসারটি স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন: আমি আপনাদের পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু ফিরবেন কী করে?

স্বাতি বলল: ফেরার ভাবনা ভাবি না, পৌঁছতে পারলেই আমরা খুশি হব।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন: তবে চা খেয়ে আপনারা ওয়েটিং রুমে বসুন। আমার গাড়ি এলেই আমি আপনাদের ডেকে নেব।

কিন্তু আমাদের চা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোকের জীপ এসে পড়ল হুড়মুড় করে। ড্রাইভার এসে একটা সেলাম ঠুকে তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক বললেন: কোন তাড়া নেই, আপনারা ধীরে ধীবে চা খান।

ভদ্রলোক আমাদের জীপের সামনে বসতে দিলেন, বললেন: আপনারা দুজনেই সামনে বসুন, আমি পিছনে বসছি।

বলে এক লাফে ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

মোটরের পথ অনেকটা ঘুরে শহরে এসেছে। পথে আমরা কয়েকটা উট দেখতে পেলুম। মিলিটারি পোশাক পরিহিত জন-কয়েক লোক সেই উটের পিঠে চেপে চলেছে।

ভদ্রলোক পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের নামিয়ে দিলেন না। ড্রাইভারকে বললেন উপরে উঠতে। আর আমাদের বললেন: দুর্গের দরজায় আপনাদের নামিয়ে দেব। তাতে আপনাদের পরিশ্রম কম হবে।

বলে এমন এক জায়গায় আমাদেব নামিয়ে দিলেন, সেখান থেকে বাঁধানো পথ ক্রমাগত উঁচু হয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদের ভিতরে ঢুকেছে। ভদ্রলোককে আমরা অনেক ধন্যবাদ দিলুম।

ভদ্রলোক নিজেও নেমেছিলেন। দু হাত জুড়ে আমাদের নমস্কার করলেন। তার পরে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে পাহাড়ের নিচে নেমে গেলেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম: দেখলে তো, ভাগ্য প্রসন্ন হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার নামে কিনা!

স্বাতি বলল: তুমি যে আগেই এ সব লক্ষ্য করেছিলে, তা বুঝতে পেরেছি।

এই পাহাড়টাই একটা শহর মনে হচ্ছিল। নিচের দিকে অনেক ঘরবাড়ি দোকানপাট দেখেছি। এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে বুঝতে পারছি যে আর আমাদের বেশি উপরে উঠতে হবে না।

স্বাতি বলল : এই পাহাড়টা কত উঁচু বলতে পার ?

বললুম : পাহাড়ের উচ্চতা বলতে পারব না, তবে এই শহরটা যে সমুদ্রতল থেকে হাজার আড়াই ফুট উঁচুতে তা তোমার বইএ দেখেছি।

আর যোধপুর ?

যোধপুরের উচ্চতা সাতশো ফুটের মতো।

স্বাতি বলল : তাহলে এই পাহাড়টা হাজার দেড়েক ফুট উঁচু।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম : দেখে কিন্তু চার-পাঁচশো ফুটের বেশি মনে হয় না।

উঠবার সময়ে পথ চলতে চলতে স্বাতি মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল। আমিও দাঁড়িয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নিচ্ছিলুম। আমার দিকে চেয়ে স্বাতি হঠাৎ হেসে ফেলল, বলল : এত তাড়াতাড়ি আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম !

সহসা এই রকমের একটা মন্তব্য শোনবাব জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। তাই দেখে স্বাতি বলল : ত্রিচির রক ফোর্টে ওঠবাব কথা তোমার মনে আছে ?

সেসব কথা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে বলছ ?

স্বাতি বলল : সে পাহাড়ে তো আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছি!

বললুম : লাফিয়ে লাফিয়ে উঠি নি। উঠেছিলুম ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে।

কিন্তু এমন করে টেনে টেনে উঠি নি।

আমি বললুম : কটা সিঁড়ি উঠেছিলে মনে আছে ?

না।

তুমি বলেছিলে শ পাঁচেক সিঁড়ি, কিন্তু পাহাড়টা ছিল দুশো তিয়াত্তর ফুট উঁচু।

মাত্র !

বলে স্বাতি আবার উঠতে লাগল।

আমি তার পাশে চলতে চলতে বললুম: সেখানেও তুমি আমাকে জিরিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলে।

কিন্তু আমাদের আর বেশি উঠতে হল না। পথের শেষেই একটা খোলা প্রাঙ্গণ দেখতে পেলুম। আর এগিয়ে গিয়ে দেখলুম যে পাহাড় এখানে শেষ হয়ে গেছে। পাথর দিয়ে বাঁধানো এই প্রাঙ্গণে অনেক ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকজনও আছে অনেক। আর যে দিক থেকে আমরা এলুম সেই দিকেই একটা বিরাট প্রাসাদ। পথের অন্য ধারেও আছে প্রাসাদতুল্য বিরাট অট্টালিকা। মনে হল জয়সলমের শহরটাই বুঝি এই পাহাড়ের উপরে। কিন্তু পরে জেনেছিলুম, তা নয়। পাহাড়ের পাদদেশে শহর, আর দুর্গ আর মহারাওনের প্রাসাদ এই পাহাড়ের উপরে। মহারাওন ছিলেন জয়সলমের রাজ্যের রাজা। দুর্গের মধ্যে জৈন মন্দিরও আছে, আর তারই সংলগ্ন জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডার।

সামনের প্রাসাদের দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: এ এক নতুন রঙের পাথর, তাই না?

বললুম: তোমার বইএ একে হলদে বালি-পাথর বলেছে।

সবই তো হলদে রঙের দেখছি।

বোধহয় এ অঞ্চলে শুধু এই রঙের পাথরই পাওয়া যায়।

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আমরা মহারাওনের প্রাসাদটা ভালো করে দেখলুম। নিচে থেকে অনেক উঁচু ভিত। বাঁ ধারে উঁচু উঁচু ধাপ উঠেছে অনেকগুলো। তার পরে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশের পথ। সামনের দিকে টানা রেলিং দেওয়া বারান্দা আছে, আর মাঝে মাঝে থামের উপরে ছোট ছোট গম্বুজ দেওয়া ছাদ। সব কিছুর গায়েই সুন্দর কারুকার্য। এর উপরের তলায় কারুকার্য আরও বেশি। বারান্দার সবটাই ছাদে ঢাকা। আর এ ছাদ সমতল নয়, সামনের দিকে বৃত্তাকার খিলান একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত, আর উপরটা নানা আকার ও আকৃতির। এর

উপরেও আরও তলা আছে, আর তার কারুকার্যও ভিন্ন ধরনের।

রাজপ্রাসাদের পাশে যে সব অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি, তার সৌন্দর্যও দেখবার মতো। ছাদের উপরে যেন একটি নহবৎখানা।

স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা কি ভিতরে গিয়ে দেখব?

স্বাতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। বরং তার ভাব দেখে মনে হল যে সে এমন কাউকে খুঁজছে, যার কাছে এখানকার কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে রকম কাউকে দেখতে না পেয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল: রাজবাড়ির ভেতর দেখে করব কী!

এ তার পুরনো অভিমত। আর এই উত্তর আমার জানাই ছিল। তাই বললুম: চল, এই ধারে একটু এগিয়ে যাই। তোমার বইএ পড়েছি যে জৈন মন্দির আর জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডার এই দুর্গের ভিতরেই। কাজেই কাছাকাছি কোন জায়গায় হওয়াই স্বাভাবিক।

চল।

বলে স্বাতি এগিয়ে গেল। তার পরে পাহাড় থেকে নিচে নামবার পথ না ধরে বাঁ হাতের পথ ধরল। একটুখানি এগিয়েই একটা সুন্দর গেট দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

এই রকমের গেট আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু এমন অপরূপ কারুকার্য বোধহয় আগে দেখি নি। মনে হল, আবু পাহাড়ের দিলওয়াড়া মন্দির তৈরি করবার সেই শিল্পীরাই বোধহয় এখানে এসে এই গেট তৈরি করেছে। পাথরের থামের উপরে একই রকম সূক্ষ্ম কারুকার্য। মাঝে মাঝে বড় মূর্তি আছে ব্র্যাকেটের মতো। সে সব দেখে খাজুরাহোর কথা মনে পড়ে যায়।

আমরা আমাদের চটিজুতো বাহিরে খুলে রেখে ভিতরটা দেখে

এলুম। এটাই যে জৈন মন্দির তা বুঝতে অসুবিধা হল না। মন্দিরের গায়ে পুরাণের নানা কাহিনী ক্ষোদাই করা আছে।

এক ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম যে একটি নয়, একাধিক মন্দির আছে এই দুর্গের মধ্যে। আর একটি লাইব্রেরি এই মন্দিরেরই অংশ। এই লাইব্রেরির নামই জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডার।

ভদ্রলোককে দেখে ব্যস্ত মনে হচ্ছিল। তবু প্রশ্ন করলুম: সেখানে দেখবার কী আছে?

চলে যেতে যেতেই ভদ্রলোক বললেন: জাদুঘর তো নয়, কাজেই দেখবার কিছু নেই।

কথাটা রূঢ় হলেও সত্য। আমার চেয়ে স্বাতি আহত হয়েছিল বেশি। তাই বলল: চল, আমরা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে সব দেখি।

বললুম: সেই ভাল।

বলে আমরা নিজেরাই পথ খুঁজে জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডারে এসে প্রবেশ করলুম। কিন্তু একটা লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে কতটুকুই বা জানা সম্ভব! কেউ বুঝিয়ে না দিলে শুধু বাড়ি ঘর আলমারি বই সাজানো আর পড়ার টেবিল দেখেই ফিরতে হয়। কোন লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য জানতে হলে কারও সাহায্য নিতেই হবে।

হঠাৎ আমার সরকারী পুস্তিকার কথা মনে পড়ে গেল। বললুম: তোমার ব্যাগে কোন কাগজপত্র নেই?

স্বাতি বলল: আছে বৈকি।

বলে ভারত সরকারের টুরিস্ট লিটারেচার বার করে দিল।

আমি তাড়াতাড়ি জয়সলমেরের পাতা খুলে লাইব্রেরির কথা স্বাতিকে পড়ে শোনালুম: Established as part of the Jain temple, it contains some of the oldest manuscripts known in India.

আমি থামতেই স্বাতি বলল: ব্যস!

বললুম : লাইব্রেরির নামটিও এতে নেই, আর সব চেয়ে পুরনো পাণ্ডুলিপি কী তারও কোন উল্লেখ নেই।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর সেই সঙ্গেই আমরা একজনের ডাক শুনে চমকে উঠলুম।

একটু আগে যে ভদ্রলোকের রূঢ় কথায় আমরা আহত হয়েছিলুম তাঁকেই দেখতে পেলুম একটু তফাতে। তিনি কিছু পড়ছিলেন, বই থেকে মুখ তুলে তিনিই আমাদের ডাকলেন।

কাছে আসতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেন : কোথা থেকে আসছেন ?

কলকাতা থেকে।

কী করেন ?

পড়াশুনো।

নিজেরা পড়েন ? না পড়ান অন্যদের ?

বললুম : দুই-ই করি।

ভদ্রলোক বললেন : কতক্ষণ আপনাদের সময় আছে ?

স্বাতি বলল : রাতের ট্রেনে ফিরব।

ভদ্রলোক নিজের হাতের ঘড়ি দেখলেন, তার পরে বললেন : খাওয়াদাওয়া নিশ্চয়ই হয় নি ?

না।

তবে সংক্ষেপেই বলি। এই জিনভদ্র জ্ঞানভাণ্ডারে এক হাজার একশো ছাব্বিশটি তালপাতার পুঁথি আর দু হাজার দুশো সাতান্নটি কাগজে লেখা পুঁথি আছে। তার মধ্যে অনেকগুলির বয়স হাজার বছর। আপনারা যদি শিল্পের অনুরাগী হন, তাহলে এই সব পুঁথির কাঠের মলাটগুলো দেখবেন। নানা রঙে চিত্রিত এই সব মলাট। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় পুঁথিটি চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা তালপাতার ওপরে পাকা কালো কালি দিয়ে লেখা। এই তালপাতা এদেশের নয়, মধ্য যুগে এই পাতা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছিল।

স্বাতি বলল : চওড়া কত ?

এক এক পাতায় চার থেকে আট লাইন পর্যন্ত লেখা আছে।

লিপি ?

একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর নাগরী।

স্বাতি বলল : এই সমস্ত পুঁথিই কি জৈন ধর্ম নিয়ে লেখা ?

ভদ্রলোক নিতান্ত মোলায়েম সুরে বললেন : সাধারণ লোকের এই রকমই ধারণা। কিন্তু আসলে তা নয়। জৈন শাস্ত্রের উপরে নিশ্চয়ই অনেক পুঁথি আছে। আবার এখান থেকেই প্রথম জানা যায় যে বৌদ্ধ দর্শনও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত। আর একটি মূল্যবান পুঁথি হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপরে একখানি টীকার অংশ। সেটি চতুর্দশ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। ভারতীয় দর্শন কাব্য নাটক ছন্দ—এ সবের উপরেও অনেক মূল্যবান পুঁথি আছে।

এইবারে আমি ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে চাইলুম। ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন : আমিও আপনাদের মতো পড়াশুনো করতে এসেছি এখানে।

কিন্তু এর বেশি কিছু বললেন না।

বিদায় নেবার জন্যে স্বাতি দু হাত জুড়ে নমস্কার করল।

ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করে বললেন : আমার ধৃষ্টতার জন্যে কিছু মনে করবেন না। আপনাদের মতো টুরিস্ট মাঝেমাঝেই আসেন, কিন্তু লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য জানবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখতে পাই নে।

আমি হেসে বললুম : আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে বেনা বনে মুক্তো ছড়াতে আপনি চান না।

লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন।

২২

পথে নেমে স্বাতি বলল: এখানে আর কী দেখবার আছে দেখে নাও।

আমি আবার বই খুলে বললুম: বাদাবাগ, অমর সাগর, মূল সাগর। বাদাবাগে রাজাদেব সমাধি আছে। অমর সাগব আব মূল সাগর বোধহয় ফুলেব বাগানেব মধ্যে জলাশয়।

আর?

পাটবন-কি-হাভেলি।

সে আবার কী?

তা লেখা নেই। উনিশ কিলোমিটার দূবে লোদুর্বায় ছিল পুরনো রাজধানী। তার পরে গদ্দি সাগর আর রামদেওবা।

স্বাতি বলল: গদ্দি সাগর কোন লেক হবে, কিন্তু বামদেওরা কী?

বললুম: তাও লেখা নেই।

রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে স্বাতি বলল: এখানে হোটেল রেস্তোরাঁ কিছু আছে কিনা দেখ তো?

বইএর উপরের দিকে চোখ বুলিয়ে বললুম: আছে বৈকি। হোটেলের নাম জওহর নিবাস প্যালেস—রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কালেক্টারের অফিসের সামনে। ঘর ভাড়া একজনের চল্লিশ ও দুজনের ষাট। আগে থেকে খবর দিলে খেতেও পাওয়া যায়। রিজার্ভেসনের জন্যে যোধপুরে ময়ূর ট্রাভেল্‌স্‌কে বলতে হয়।

আর কিছু?

বললুম: ডাকবাংলো আছে, আছে জৈন ধর্মশালা। আর একটা সুখবর আছে।

কী ?

রেস্টহাউস আর টুরিস্ট বাংলো তৈরি হচ্ছে।

এটা কবেকার খবর ?

পাতা উল্টে ছাপার তারিখ দেখে বললুম : নভেম্বর, উনিশশো চুয়াত্তর।

তার মানে এখনও চালু হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

বইখানা মুড়ে আমি স্বাতির হাতে ফিরিয়ে দিলুম। স্বাতি তা নিজের ব্যাগে পুরে বলল : নিচে নামবার সময়ে পথের দু ধারে একটু নজর রেখো। স্টার দেওয়া হোটেল না থাকলেও ডাল ভাত খাবার জায়গা পাওয়া যাবে।

আমি বললুম : নোংরামি ?

স্বাতি বলল : খাবারটা নোংরা না হলেই হল।

অনেকটা নেমে আসবার পরে এক জায়গায় এসে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। না, হোটেল রেস্তোরাঁ নয়। কিন্তু সেখানে খাবার পাওয়া যাবে বলে মনে হল। নিরামিষ ভোজনালয়। একজন আহার করছেন, আর দু-তিনজন অপেক্ষা করছেন দেখে আমরাও ঢুকে পড়লুম।

ছোট একটি ঘর, পুরনো স্যাতসেঁতে এবং অন্ধকারও বটে। যে ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন তাঁর পাতে ডাল ভাত রুটি তরকারি দেখতে পাচ্ছিলুম। আমাদেরও ক্ষিধে পেয়েছিল। কাজেই আমরাও খাবার অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

অপেক্ষমান এক ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?

হিন্দীতে প্রশ্ন, জবাবটাও আমি হিন্দীতে দিলুম : কলকাতা থেকে।

টুরিস্ট ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উপরে সব দেখে এসেছেন ?

বললুম ঃ দেখেছি।

ভদ্রলোক এবারে আমার পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মহারাওনের প্যালেসের উপরে বিরাট ছাতাটা দেখেছেন ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি অকপটে স্বীকার করলুম ঃ দেখি নি।

ধাতুর তৈরি অমন বিরাট ছাতাটা দেখেন নি।

না তো !

আশ্চর্য ! ঐ ছাতাই তো মহারাওনদের সব চেয়ে গৌরবের বস্তু !

স্বাতি বলল ঃ টুরিস্ট প্যাম্ফলেটে থাকলে নিশ্চয়ই খুঁজে দেখতাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ ফেলে দিন টুরিস্ট প্যাম্ফলেট। আপনার মতো লোকেই তো ওসব লেখে। না নিজেরা ভাল করে দেখে, না আমাদের কাছে জেনে কিছু লেখে !

ভদ্রলোককে খুশি করবার জন্য বললুম ঃ আমাদের দোষ দেবেন না। আপনার মতো অভিজ্ঞ লোকের দেখা তো সব সময় পাওয়া যায় না !

নিমেষে খুশি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক, বললেন ঃ তা বটে।

তার পরেই প্রশ্ন করলেন ঃ কিন্তু একটা ছাতার জন্যে এঁদের কেন এত গৌরব তা জানেন ?

বললুম ঃ না।

ভদ্রলোক একবার ভিতরের দরজার দিকে দেখলেন। তিনিও আমাদের মতো খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কেউ আসছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন ঃ কর্নেল টডের রাজস্থান পড়েছেন ?

বললুম : অনেকদিন আগে পড়েছিলুম, এখন সব কথা মনে নেই।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার প্রশ্নের উত্তর তাতেই আছে। দ্বারকায় যদুবংশ যখন ধ্বংস হয় তখন কৃষ্ণের পুত্র বজ্র ছিলেন মথুরায়।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : বজ্র তো কৃষ্ণেব প্রপৌত্র!

এক ধমক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন : আপনি বললেই হল! টড সাহেব ইতিহাসের নাড়ি-নক্ষত্র খুঁজে বার করে বলেছেন যে বজ্র হলেন কৃষ্ণের পুত্র।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চাইল। কিন্তু তখন আমি ভদ্রলোকের কথাই মেনে নিলুম। পরে তাকে বলেছিলুম যে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের নাতি হল বজ্র। প্রদ্যুম্নের মা রুক্মিণী, আর প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অসুররাজ বাণের কন্যা উষাকে যে হরণ করে বিয়ে করেছিল। এই অনিরুদ্ধর ছোট ছেলের নাম বজ্র, বড ছেলে সানু। বজ্রের ছেলের নাম প্রতিরথ এবং সুচারু হল নাতি।

আমি তাঁর কথা মেনে নিতেই বিবাদ হল না। ভদ্রলোক বললেন : মথুরা থেকে বেরিয়ে দ্বারকার পথে এই যদুবংশ ধ্বংসের খবর পেয়েই বজ্রের মৃত্যু হল। তাঁর এক ছেলে নব মথুরায় ফিরে গিয়ে রাজা হলেন, আর এক ছেলে ক্ষীর দ্বারকায় চলে গেলেন।

পুরাণে এ সব নাম আমি পাই নি। তবু আগ্রহ প্রকাশ করে বললুম : তার পর?

ভদ্রলোক বললেন : নব মথুরায় রাজত্ব করতে পারলেন না। তিনি এসে এই মরুস্থলীতে রাজ্য স্থাপন করলেন। তাঁরই পুত্র পৃথ্বিবাহু পেয়েছিলেন কৃষ্ণের রাজচ্ছত্র। এই জন্যেই এই রাজচ্ছত্র ভট্টি রাজপুতদের এমন গৌরবের বস্তু।

আমি বললুম ঃ কৃষ্ণের রাজচ্ছত্রের অধিকারী বলে গর্ব করবেনই তো !

এর পরে ভদ্রলোক একটি আশ্চর্য কথা বললেন ঃ চাগ্‌তাই মোগলদের কথা জানেন তো ? যে বংশে বাবরের জন্ম ?

জানি।

ভদ্রলোক বললেন ঃ আসলে এঁদেরও যদুবংশে জন্ম।

সবিস্ময়ে স্বাতি বলল ঃ সত্যি নাকি !

ভদ্রলোক বললেন ঃ সত্যি নয় মানে ! টড সাহেব নিজে এব প্রমাণ লিখে রেখে গেছেন। শুনবেন সেই ইতিহাস ?

বললুম ঃ শুনব বৈকি।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন ঃ পৃথিবাহুর পবে চতুর্থ পুরুষ হলেন গজ। তার মা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বপ্নে শ্বেত গজ দেখেছিলেন বলে নবজাতকেব নাম রাখা হয়েছিল গজ। এই গজ খোরাসানেব রাজাকে দুবার পরাস্ত করেছিলেন, আর নিজের নামে গজনি দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর দূত এসে সংবাদ দিল—

রুমিপৎ খুরাসানপৎ হয় গয় পুখুব পায়।
চিন্তা তেরা চিৎলেগি শুন যদুপৎ রায়॥

তার মানে খোরাসানের রাজা বোমের রাজার সঙ্গে এক জোটে আক্রমণ করতে আসছে। হে যদুপতি, এখন তুমি নিজের বাজ্য সামলাও।

তার পর ?

গজেরই জয় হল।

কেমন করে ?

ভদ্রলোক বললেন ঃ খোরাসানের রাজার মৃত্যু হল অজীর্ণ রোগে। আর শিকান্দার শাহ একা যুদ্ধ করে হেরে গেলেন। এই-বারে যদুপতি গজ বসলেন গজনির সিংহাসনে। কাশ্মীর রাজকে পরাস্ত করে রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন। তাঁদের পুত্রের নাম

হল শালিবাহন। শালিবাহনের বয়স যখন বারো বছর, তখন খোরাসানের যবনেরা আবার এসে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল। যুদ্ধে যাবার আগে রাজা গজ কুলদেবীর মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিলেন। চতুর্থ দিনে দেবী তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধে গজনি তোমার হাতছাড়া হবে ঠিকই, কিন্তু তোমার বংশধররাই ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করে এইখানেই আবার আধিপত্য করবে।

তার পর?

ভদ্রলোক ভিতরের দরজার দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বললেন: রাজা গজ শালিবাহনকে পাঠিয়ে দিলেন পূর্ব দেশের হিন্দু রাজ্যে, আর গজনির ভার এক কাকার হাতে দিয়ে নিজে গেলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হল, শত্রুপক্ষের আরও এক মাস সময় লাগল গজনি অধিকার করতে। এই যুদ্ধে ন হাজার যাদব সেনার মৃত্যু হয়েছিল।

ঠিক এই সময়েই একজন দুখানা থালা হাতে ঘরে ঢুকল। সে দুখানা আগের ভদ্রলোকদের দিয়ে আবার ভিতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক থালাখানা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন: এই-বারে তাহলে সংক্ষেপে বলি।

বললুম: তাই বলুন।

ভদ্রলোক ভাতে হাত দিয়েই বুঝতে পারলেন যে তা খুবই গরম। তাই একটু অপেক্ষা করেই খেতে হবে। বললেন: শালিবাহনের বড় নাতির নাম ভট্টি আর ভূপতি মেজ নাতি। শালিবাহনরা মরুস্থলীতে রাজত্ব করতে লাগলেন। ভট্টির বংশধররা এখানে যদু ভট্টি রাজপুত নামে এখনও পরিচিত। ও দিকে ভূপতির পুত্র চাকিত আবার গজনিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই যবনেরা গজনি অধিকার করে চাকিতকে বলে, তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তোমাকে আমরা বালুচ বোখারার রাজা বলে মানব।

কী করলেন চাকিত ?

কী আর করবেন ! রাজ্যের লোভে ধর্ম ত্যাগ করলেন। তাঁর বংশধরবাই চাকৃতাই বা চাগ্‌তাই মোগল।

স্বাতি বড় বড় চোখে আমার মুখেব দিকে তাকাল। আমাদেরও খাবার এসে গিয়েছিল। তাই কোন কথা বললুম না।

ভদ্রলোক বললেন: বিশ্বাস হচ্ছে না, না ? কিন্তু কৃষ্ণেব বংশধর না হলে কি মোগলরা অমন পরাক্রান্ত হতে পাবত। না আকবর হতে পারত অমন আদর্শ বাদশাহ !

খাবার থালা টেনে নিয়ে আমি বললুম: ঠিকই তো !

খেতে খেতে স্বাতি আমাকে বলল: এখানে কী দেখবাব আছে তা এই ভদ্রলোকের কাছেই জেনে নিতে হবে।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে নজর রেখেছিলেন। বাঙলা কথা কী বুঝলেন জানি না। বললেন: জয়সলমেরের রাওলরা অভিষেকের সময়ে যোগীব ভেক ধারণ করেন কেন, তা জানেন তো ?

বললুম: না।

তাহলে আপনাদের জয়সালের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ দেবরাজেব গল্প বলতে হয়।

স্বাতি বলল: বলুন না।

ভদ্রলোক বললেন: বিজয় রায়ের পুত্রের নাম দেবরাজ। একদিন তাঁর কাছে বরাহপতির কাছ থেকে নারকেল এল—তিনি দেবরাজের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিতে চান। এদের সঙ্গে বিজয় রায়ের অনেক দিনের শত্রুতা, তিনি ভাবলেন যে এই বিবাহ হলে বিবাদ মিটে যাবে। কাজেই দলবল নিয়ে ছেলের বিবাহ দিতে এলেন। কিন্তু যা ভাবতে পারেন নি তাই হল, বরাহপতি কৌশলে বিজয় রায় ও তাঁর আটশো জ্ঞাতি কুটুম্বকে বধ করল। কিন্তু দেবরাজ পালিয়ে গিয়ে বরাহপতির পুরোহিতের কাছে আশ্রয়

নিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁর গলায় পৈতে দিয়ে কিছু দিন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার পরে দেবরাজ ছদ্মবেশে এক যোগীর আশ্রমে এসে বাস করতে লাগলেন।

ভদ্রলোক থেমে থেমে গল্প বলছিলেন। আহারের চেয়ে গল্পে তাঁর মন ছিল বেশি। বলতে লাগলেন: এক দিন যোগীর রসকুম্ভের এক ফোঁটা রস লেগে দেবরাজের লোহার তরোয়াল সোনা হয়ে গেল। দেবরাজ ভাবলেন, ভারি মজা তো! তার পরে সেই রসকুম্ভটি সংগ্রহ করে তার সাহায্যে অনেক ধন রত্ন সংগ্রহ করলেন। মামার কাছে চেয়ে এই মরুভূমির মধ্যে একখানি গ্রাম পেয়েছিলেন। সেখানে দেওগড় বা দেওরাবল নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করলেন। মামা এই সংবাদ পেয়ে এক সেনাবাহিনী পাঠালেন ভাগনের বিরুদ্ধে। আর ভাগনে কৌশলে তাদের দুর্গের মধ্যে এনে বধ করলেন।

এক দিন সেই যোগী এসে উপস্থিত। দেবরাজকে তিনি বললেন, তুমি আমার যোগসাধনার ধন চুরি করে এনেছ, আমার চেলা না হলে তোমার নিস্তার নেই। এক কথায় দেবরাজ রাজী। গেরুয়া কৌপীন পরে দেবরাজ যোগীর শিষ্য হয়ে গেলেন, গুরুর আদেশে হাতে একটি কুমড়োর খোল নিয়ে। 'আলখ্ আলখ্' বলে জ্ঞাতি কুটুম্বের বাড়ি ভিক্ষে করতে লাগলেন। তাঁর হাতের কুমড়োর খোল মুক্তো ও সোনায় ভরে গেল।

তার পর?

দেবরাজ রাও উপাধি ছেড়ে রাবল উপাধি নিলেন। আর যোগীর আদেশে তাঁর বংশধরেরা চিরকাল এই ভেক ধারণ করতেন অভিষেকের সময়।

এর পরের ইতিহাস আমার জানা আছে। এই ভট্টি রাজপুত বংশের রাবল জয়সাল ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই জয়সলমেরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এর আগে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল দশ মাইল

দূরে লুধ্রবা পাটন নামে এক জায়গায়। এখন সেখানে কী দেখবার আছে জানি নে।

ভদ্রলোক এক মনে খানিকক্ষণ আহার করে বললেন: রাবল জয়সালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

বললুম: তাঁর নামেই তো এই শহরের নাম।

ভদ্রলোক বললেন: মরুভূমির মধ্যে এই পাহাড়ী অঞ্চলটি তিনি রাজধানীব উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। দেড় হাজার ফুট লম্বা, আর সাড়ে সাতশো ফুট চওড়া—তারই উপরে শহর। আর আড়াইশো ফুট উঁচু এই পাহাড়ের উপরে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ কবেছিলেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পাবলুম যে এই শহব যে আমরা দেখতে পাই নি, সেই কথাই সে তার দৃষ্টি দিয়ে মনে করিয়ে দিল। বাদাবাগে রাবলদেব ছত্রি, অমর সাগর মূল সাগর—এ সব বোধহয় শহরে। বিকানেরে যেমন দেখেছিলুম, পটবন-কি-হাভেলি বোধহয় সেই রকম কোন ধনীর গৃহ। কিন্তু সে সব আমরা দেখব কী করে! যানবাহন না পেলে পায়ে হেঁটে কি নতুন কোন শহর দেখা সম্ভব!

ভদ্রলোক বললেন: রাবল জয়সালের সময় থেকেই এই রাজ্যের নাম হয়েছে জয়সলমের। তখন এই রাজ্যের অনেক বেশি বিস্তার ছিল। এঁর বংশধরেরা শুধু যুদ্ধবিগ্রহ নয়, ডাকাতের মতো প্রতিবেশী রাজ্যে লুটপাট করতেন। বিরক্ত হয়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন জয়সলমের দুর্গ অধিকার করে রাওলদের তাড়িয়ে দেন। সে বোধহয় ১২৯৪ সালের কথা। তখন থেকেই এই রাজ্যের দুর্দশার আরম্ভ। অনেক দিন পরে রাবল সবল সিংহ শাজাহানের বশ্যতা স্বীকার কবে একজন সামন্ত রাজা বলে স্বীকৃত হন। জয়সলমেরের অনেক জায়গা যোধপুর ও বিকানেরের অধীন হয়ে যায়।

খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। যিনি একা খাচ্ছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ আগেই হাত ধুয়ে পয়সা মিটিয়ে চলে গেছেন। আমরা খাচ্ছিলুম ধীরে ধীরে। এইবারে আমরাও উঠে পড়লুম। ভদ্রলোক নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: অনেক দেরি হয়ে গেল। আমাকে এখন পা চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বললেন না। আমাদেরও হাঁটতে হবে। হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। কিন্তু খাবার পয়সা দিয়ে রাস্তায় নেমে আনন্দে মনটা দুলে উঠল। খানিকটা তফাতে একটা জীপ দেখতে পেয়েছি।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম, কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশ হলুম ড্রাইভারের কথায়। সরকারী জীপ, কাজেই ভাড়া খাটবে না।

স্বাতি বলল: আমি ব্যবস্থা করছি।

বলে জীপের মালিককে খুঁজে বার করে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা বোঝাল।

ভদ্রলোক বললেন: স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে?

স্বাতি বলল: আমরা বেঁচে যাই তা হলে।

এ এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

বলে তিনি ড্রাইভারকে বললেন আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জীপে উঠে বসলুম।

২৩

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বালি উড়িয়ে ঝড়ের বেগে ড্রাইভার আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল। জীপ থেকে নেমে স্বাতি তাকেও ধন্যবাদ দিল, আর কিছু দিল না। স্টেশনেব ভিতবে এসে বলল: ওকে কিছু বকশিশ দেবার ইচ্ছা ছিল।

বললুম: দিলে না কেন?

জীপের মালিক আমাকে বারণ কবেছিলেন। ওব কান বাঁচিয়ে বলেছিলেন, কিছু দেবেন না ড্রাইভারকে। ওতে ওদেব চবিত্র নষ্ট হয়।

আমি বললুম: পদ্মনাভপুরমের কথা তোমার মনে আছে?

স্বাতি বলল: কন্যাকুমারীর পথে পদ্মনাভপুবম তো।

বললুম: হ্যাঁ। সেখানকার সরকারী গাইড বকশিশ নিতে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল, আমি তো আমার কর্তব্য করছি।

স্বাতি বলল: সবার মধ্যে যখন এই ভাব আসবে, তখনই আমরা দেশের জন্যে গর্ব করতে পারব।

ওয়েটিং রুমের দিকে যেতে যেতে স্বাতি বলল: এ দেশের সবাই সবার কাছে কিছু না কিছু প্রত্যাশা কবে। ছোট বড়র প্রশ্ন নেই, মান অপমানের প্রশ্নও নেই, আছে শুধু ভিখিবিব মতো মন—কিছু দাও, কিছু দিয়ে যাও।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলুম। আর আমার হাসি দেখে স্বাতি রেগে গেল। বলল: তুমি হাসছ!

ওয়েটিং রুমের সামনে একটি বালক বসে ছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই সে উধাও হয়ে গেল। ওয়েটিং রুমের দরজায় তালা ঝুলছে দেখেই বুঝতে পারলুম যে ছেলেটা চাবি আনতে গেছে কারও

কাছ থেকে। তাই নিশ্চিন্ত মনে বললুম: তোমার অভিজ্ঞতার বহর দেখে হাসছি।

ভাবছ আমি শুনে বলছি, কিংবা কাগজে পড়ে। তা মোটেই নয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। সরকারী লোকের কথা বলব, না ব্যবসাদারের কথা! না দু দলের যোগসাজসে জনসাধারণের দুদশার কথা!

তার পরেই বলল: আজকের এই ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন। সবকারী লোকদের বকশিশ আর মামুলি দিয়ে দিয়ে আমরা তাদের চরিত্র নষ্ট করেছি, লোভী করেছি তাদের। পয়সা না পেলে তার এখন কর্তব্য করতেও চায় না, ডাকপিওন পূজো-পার্বণে বকশিশ চায়, একটা মনিঅর্ডার দিয়েই হাত পাতে। রেলের রিজার্ভেসন অফিসে টাকার খেলা। কোথাও মাল পাঠাতে যাও কিংবা আনতে, পয়সা না দিলে কেউ কথাই কইবে না। ইনকাম ট্যাক্সের অত্যাচারে বাবার ঘুম হত না, এখন উকিল রেখেছেন—তাঁরা দুপক্ষই খাচ্ছেন। বাবা বলেন, সরকারী দপ্তরে টাকা না ফেললে কোথাও কাজ পাওয়া যায় না—রেশন অফিস থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারেও। দক্ষিণা না দিলে ঠিক কাগজটি ঠিক জায়গায় পৌছবে না। এর নাম পেপার ওয়েট।

হেসে বললুম: একটু উত্তেজিত হয়ে গেছ।

স্বাতি বলল: তাহলে ব্যবসাদারের কথা বলি। একজনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কেন? সে ভদ্রলোক বললেন, না বাড়িয়ে তো উপায় নেই। যত জায়গায় প্রণামী দিতে হয়, তার সংখ্যা বাড়ছে, প্রণামীর পরিমাণ বাড়ছে। এ টাকা তো জিনিসের দাম বাড়িয়েই তুলতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নেতারা কী করছেন? সে ভদ্রলোক বললেন, তাঁদের জন্যেই তো দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পার্টিতে চাঁদা দিতে

হবে গুণ্ডা পোষবার জন্যে, আর ভোটের সময়ে যা চাইবেন তাই দিতে হবে। ভোটে জিতলে সাতখুন মাপ, আর হারলে নতুন পার্টিকে খুশি করে সুদে-আসলে আদায় করতে হবে। এই তো রাজনীতি!

আমি হাসছিলুম। তাই দেখে স্বাতি আরও রেগে গেল। বলল: ভাবছ তোমার স্কুল-কলেজে দুর্নীতি নেই, দুর্নীতি নেই সাহিত্যের বাজারে! এই তো সবে শুরু। কিছু দিন গেলে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। দলে যোগ না দিলে বসিয়ে দেবে দুদিন পরেই। ভালো লিখেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। যেমনটি বলবে, ঠিক তেমনটি লিখতে হবে। লিখতে না চাও, তোমার আদর্শ ধুয়ে জল খাও।

আমাদের পরিচিত বালকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। 'সাবাস' বলে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। স্বাতি আমার পরে ভিতরে এসে বলল: আমি জানি, আজ আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু এক দিন যে হবে, তাও আমি বিশ্বাস করি। সমাজটা দিনে দিনে নগ্ন হয়ে যাচ্ছে, আর এই নগ্নতা সবাই দেখতে চাইছে। লজ্জা! নতুন অভিধানে ও শব্দটা আর থাকবে না।

একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমি বললুম: আজ তোমার এই রাগ কিসের জন্যে বল তো?

স্বাতি আমার কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটিকে বলল: এখানে খাবার জল পাওয়া যায়?

হিন্দীতে প্রশ্ন করেছিল বলে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল: এই তো, এইখানেই আছে।

বলে বাথরুমের জল দেখিয়ে দিল।

দেখলুম যে তার ভাষাটা ঠিক হিন্দী নয়, অথচ বোঝা যাচ্ছিল তার কথা। স্বাতি খানিকটা অসহায় ভাবে আমার মুখের দিকে

তাকাল। তার পরে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল: বাইরে কল নেই?

আছে বৈকি।

বলে ছেলেটি স্বাতির হাত থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে বাইরে গেল জল আনতে। আর স্বাতি আমার সামনের বেঞ্চে বসে বলল: টুরিস্টদের সুবিধার জন্যে সরকার কত টাকা খরচ করছে বল!

বললুম: সে তো বিদেশী টুরিস্টদের জন্যে। তারা মুঠো মুঠো ডলার দিয়ে যাবে। আমাদের মতো নয়া পয়সার কারবার তারা করে না।

কিন্তু আমাদের মতো জয়সলমেরে এসে তারা কী করত?

এ ভাবে তারা আসত না। তাদের ট্রাভেল এজেণ্ট মোটরে চড়িয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আসত। পথে উট দেখতে পেলে সিনে ক্যামেরায় তারা ছবি তুলত। বলত, গাঁয়ের মেয়েরা যেখানে বালি খুঁড়ে জল বার করছে সেইখানে নিয়ে চল। ওদের ঘরবাড়ি দেখব, চাষবাস দেখব, আর আজব ব্যাপার যদি কিছু থাকে তাও জেনে নেব। এ দেশের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য আর কুসংস্কারের ছবি নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে অনেক বেশি ডলার তারা রোজগার করতে পারবে। তারা আমাদের মতো কোন যানবাহনের ব্যবস্থা না করে এখানে আসবে কেন!

ছেলেটা জল নিয়ে ফিরে এসেছিল। তার হাত থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে স্বাতি বলল: জল খাবে?

বললুম: দাও।

স্বাতি আমাকে জল খাইয়ে নিজে খেল খানিকটা। তার পরে ফ্লাস্কটা বন্ধ করে রেখে বলল: জয়সলমেরে এসে শহরটাই দেখতে পেলাম না!

বললুম: দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে এটা সম্ভব ছিল।

কেমন করে?

জীপে করে স্টেশনে ফিরে না এসে যদি শহরে যেতুম তো সেখানে একখানা টাঙ্গা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

স্বাতি সোজা হয়ে বসে বলল: সে কথা আগে বল নি কেন?

আগে মনে হয় নি। তাব জন্যে দুঃখ কববার কিছু নেই। বাদাবাগের ছত্রি দেখি নি, জয়পুরেও তো দেখি নি। যোধপুরেব পুবনো রাজধানী মাণ্ডাব বাগান আব ছত্রি দেখেছি, এখানকাব পুরনো রাজধানী লুদ্রবায় গিয়ে হয়তো কিছুই দেখবাব নেই দেখতুম। তাব চেয়ে এই ছেলেটাব সঙ্গেই একটু গল্প কবা যাক, কী বল?

বালুবামেব কথা আমাব মনে পডে গিয়েছিল। এই মরুভূমিব দেশের অনেক ছেলেমেয়ে নাকি বৃষ্টি পডতে দেখে নি, অনেক ছেলেমেয়েই আকাশ থেকে জল পড়তে দেখে আশ্চয হয়। অন্তত প্রথমবাব এই বৃষ্টি দেখে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহলেব অন্ত থাকে না। এই ছেলেটিব বয়স এগাবো-বাবো বছব হবে। তাই একে আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম: তোমাদের দেশে কি আকাশ থেকে জল পড়ে?

পরম উৎসাহে ছেলেটি বলল: তুমি জানো না? তোমাদেব দেশে বুঝি জল পডে না?

আমি তার প্রশ্নেব উত্তর না দিয়ে বললুম: ব্যাপাবটা কী রকম বল তো।

ছেলেটি বলল: দু বছর আগে কয়েক দিন আকাশ থেকে জল পড়েছিল। আমি তখন এখানে ছিলাম না, ছিলাম আমাদেব গাঁয়ে। এক দিন আকাশটা ধোয়ায় কালো হয়ে গেল। সবাই বলল, আজ জল পড়বে আকাশ থেকে। আট বছর আগেও নাকি জল পড়েছিল। কী মজা জানো! কোথাও কিছু নেই, টপ টপ করে আকাশ থেকে জল পড়তে লাগল। তার পর ঝর ঝর কবে। একটু থামে, আবার পড়ে। কি যে মজা হয়েছিল!

আমি বললুম : এখানে তুমি কত দিন এসেছ ?

এই তো কিছু দিন আগে। বাবা বলছে, লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া না শিখলে নাকি আমরা খেতে পাব না!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি তাকালুম বাহিরের দিকে। কে একজন ছেলেটিকে ডাকতে এসেছিল, কতকটা জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গেল।

বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল স্বাতিকে। আমি তার বিষণ্ণতার কারণ বুঝতে পারি। এই দেশের মানুষ এখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসায় তাদের জুড়ি নেই, ব্যবসায়-বুদ্ধিতে তারা অদ্বিতীয়। ভারতের অর্থনীতি তারা প্রভাবিত করছে, প্রভুত্ব করছে টাকার বাজারে। যত টাকার কারবার করছে, তার চেয়ে বেশি টাকা তারা লুকিয়ে রেখেছে। আর—

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে কিছু শুনতে চাইছিল। তাই বললুম : এরা ময়রার জাত। সন্দেশ তৈরি করে বলে সন্দেশ খায় না।

কী রকম ?

দেখতে পাচ্ছ না! আকাশের জলের অভাবে যে এ দেশে এমন অভাব, গাঁয়ের সরল ছেলে আজও তা জানে না। এত দিন দেশীয় রাজার রাজত্ব ছিল, তাঁরা কৃষ্ণের সোনার ছাতার তলায় সোনার থালায় পরমান্ন খেয়েছেন। দেশের প্রজা খেতে পেল কি পেল না তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। যে প্রজারা রাজ্যের বাইরে গিয়ে কোটি কোটি টাকা করছে, তারাও শুধু নিজের কথাই ভাবছে, আর ভাবছে সরকারকে কত ভাবে ঠকাবে। সরকার নিরুপায়, ঘুন ধরেছে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঘুন পোকার ওষুধ যদি কেউ বার করতে পারে, তবেই এ দেশ বাঁচবে।

স্বাতি বলল : তাহলে তুমি আমার সঙ্গে একমত ?

মত তো একটা, পথও একটাই।

কী পথ ?

বললুম : দেশকে ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে দেশের মানুষকে। তার জন্যে সব রকম স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে—নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, নিজের সমাজ ও দলের স্বার্থ। একজন সুখী মানুষ যদি একজন চিরদুঃখীর মুখে হাসি ফোটাতে পারে তো সেই হবে সব চেয়ে বড় কাজ। পিঁপড়েকে চিনি খাইয়ে জীবের সেবা নয়, ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাইয়েও নয়। মানুষ মানুষ হবে মানুষকে মানুষ করে, সকল মানুষকে মানুষের সমান অধিকার দিয়ে বাঁচবার সুযোগ দিয়ে।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললুম : টাকা লুকিয়ে রেখে লাভ কী! নিজেকে বঞ্চিত করা হল, বঞ্চিত হল দেশের মানুষও। বড় বড় শহরে মন্দির নির্মাণ করে আর তীর্থস্থানে ধর্মশালা তৈরি করে দিয়েই কি কর্তব্য শেষ হয়ে যায়! জীবন্ত মানুষ কি কল্পিত দেবতার চেয়ে বড় নয়!

স্বাতি বলল : তারা কি সত্যিই দেবতার জন্যে কিছু করে! আমি তো শুনেছি, ট্যাক্স ফাঁকি দেবার এও একটা উপায়।

তিরুপতির কথা আমার মনে পড়ে গেল। মন্দিরের ঐশ্বর্য দেখে আমার দুঃখের শেষ ছিল না। অগণিত মানুষ দেবতার নামে যা উৎসর্গ করে যাচ্ছে, দেশের দরিদ্র মানুষ কি তার কোন ফল পাবে না! দেবতাকে যারা রক্ষা করছেন তাঁরা কি মানুষকে বঞ্চিত করে দেবতার প্রসাদ পাবেন ?

বললুম : এ আলোচনার শেষ নেই। তার চেয়ে জয়সলমেরের কথাতেই আমরা ফিরে আসি।

স্বাতি বলল : এখানে এসে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। যানবাহনের অভাবে যে শহর দেখতে পাব না, এ কথা আমি ভাবতে পারি নি।

আমি বললুম: যদি দুঃখ থাকে তো বিকেলের দিকে আবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তার চেয়ে আর যদি কিছু জানা থাকে তাই বল।

এই মরুভূমির কথা কোন প্রবন্ধে পড়েছিলুম। এই মরুভূমির পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় বছরে দশ ইঞ্চি, আর এই পশ্চিমের দিকে মাত্র চার ইঞ্চি। গ্রীষ্মের সময় তাপমাত্রা হয় বত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মানে ১১৮.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সে তো আগুনের মতো উত্তাপ!

বললুম: আগুনের হল্কার মতো।

এই উত্তাপে মানুষ বাঁচে কী করে?

মানুষ তো সব জায়গায় নেই! এ রাজ্যে দু বর্গ মাইলে তিনজন লোকের বাস। এদের মধ্যে যাযাবরও আছে। শুধু বালিয়াড়ি—নানা রকমের, আর মাঝে মাঝে পাহাড় বালির উপরে জেগে আছে। অনেক দূরে দূরে এক একটি গ্রাম। তার শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশজন চাষী। বাজরাই প্রধান শস্য, বিকানের রাজ্যে কিছু ডাল হয়। পশুপালনও অনেকের জীবিকা। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে জিপসাম পাওয়া যায় প্রচুর, তাই খনিতেও অনেক লোক কাজ করে।

কলকারখানা নেই?

বললুম: যত দূর জানি, এ দেশে উটের কম্বল আর কার্পেট তৈরি হয়। ল্যাকার ও কাঠের কাজও হয় শুনেছি।

স্বাতি বলল: এ অঞ্চলের উন্নতি হচ্ছে না কেন?

বললুম: এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় সহজ নয়। মনে হয় যাতায়াতের অসুবিধাই প্রধান কারণ। রেলপথ তো দূরের কথা, ভাল সড়কও নেই। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে সব পথ তৈরি হয়েছে, তাতে গ্রামের উন্নতি সম্ভব হয় নি।

স্বাতি বলল : মরুভূমি দেখা কি আমাদের এইখানেই শেষ হয়ে গেল ?

বললুম : মরুভূমিতে আর একটি বড় শহর ছিল। সেখানে প্রায় হাজার ত্রিশেক লোকের বাস।

কোন্ শহর বল তো ?

বললুম : বার্মের। এখান থেকে একশো মাইল দক্ষিণে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে যাওয়া যায়। আবার যোধপুর থেকে ট্রেনেও যাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : কিছু দেখবার আছে ?

বললুম : ঐ অঞ্চলের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্র বলে শুনেছি। তবে ষোল মাইল দূরে কিরাড়ু নামে একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। সেখানে একাদশ শতাব্দীর পাঁচটি মন্দির আছে এক জায়গায়। কাথিয়াবাড় শৈলীতে নির্মিত সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত শহর। কিন্তু এখন তার ভগ্ন দশা। কে কেন করে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা জানতে পারি নি।

ঠিক এই সময়ে ফিরে এল সেই ছেলেটি। তার সঙ্গে আরও একটি বড় ছেলে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করল : রাজবাড়ি দেখেছেন ?

বললুম : দেখেছি।

রাবলকে দেখেছেন ?

না।

ছোট ছেলেটি বলল : দেখবেন কী করে! এখনও বোধহয় ঘরের মধ্যে শুয়ে কু-কু করছেন।

বলে হাত তুলে বোতল থেকে মদ্যপানের ভঙ্গি করল।

আমি বললুম : তুমি দেখেছ ?

মহা উৎসাহে ছেলেটি বলল : এক দিন গিয়েছিলাম যে !

বড় ছেলেটি বলল : এখন তো আর কাজকর্ম নেই !

আগে কী কাজ ছিল ?

ছেলেটি বলল : লুটপাট ডাকাতি—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : ছি ছি ! রাজার সম্বন্ধে এ সব কথা বলতে নেই !

ছেলেরা কী বুঝল জানি না। আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

স্বাতি বলল : কী রকম অশ্রদ্ধা দেখেছ ?

বললুম : এরা তো ছেলেমানুষ, এ সব এদের কথা নয়। এ কথা এরা বড়দের কাছে শুনেছে। খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে যে রাজা এখানে থাকেন না, থাকেন বিলেতে কিংবা দিল্লীতে।

স্বাতি বলল : প্রজাদের জন্যে যদি চিন্তা করতেন, উন্নয়নের কাজ করতেন কিছু, তাহলে হয়তো এমন অশ্রদ্ধার পাত্র হতেন না।

বললুম : কিছু করেছেন কিনা, তাও তো আমরা জানি না।

ঘড়ির দিকে চেয়ে স্বাতি উঠে দাঁড়াল। বলল : চল, চা খেয়ে আসি।

২৫

যোধপুর জয়সলমেরের মধ্যে সারা দিনে একখানি মাত্র ট্রেন যাতায়াত করে। যোধপুর থেকে রাত দশটায় যে ট্রেন ছাড়ে, জয়সলমেরে সে ট্রেন আসে সকাল সাড়ে আটটায়। সারা দিন সেই খালি গাড়ি জয়সলমের স্টেশনেই পড়ে থাকে। তার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ছেড়ে যোধপুবে পৌঁছয় সকাল ছটা বেজে চল্লিশ মিনিটে। যোধপুর থেকে পোকারন পর্যন্ত আর একখানি ট্রেন যাতায়াত কবে। সে ট্রেন যোধপুর থেকে ছাড়ে সকাল দশটায়, বিকেল চারটে চল্লিশ মিনিটে পৌঁছয় পোকারনে। এই ট্রেনখানাই পবদিন পোকারন থেকে সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটে ছেড়ে যোধপুরে পৌঁছয় দুপুর পৌনে দুটোয়। যোধপুর থেকে পোকারনের দূরত্ব একশো বাইশ মাইল। আর পোকারন থেকে জয়সলমের ছেষট্টি মাইল দূরে। কিছু দিন আগেও জয়সলমেরে ট্রেন যেত না। পোকারনে নেমে বাসে আসতে হত এখানে, কিংবা বার্মের থেকে। বাসে চেপে মরুভূমির মাঝখান দিয়ে আসা কিছু কষ্টকর ছিল বটে, কিন্তু মরুভূমির নগ্ন রূপ ভাল দেখা যেত। আমরা যা দেখতে পেলুম, তা মরুভূমির একটা খণ্ড রূপ।

স্টেশনের চায়ের স্টলে চা খেয়ে আমরা অনেকক্ষণ পায়চারি করলুম। স্টেশনে কোন যানবাহন এল না। কোন উটের গাড়িও দেখতে পেলুম না। সামনের পথে কোন লোক চলাচল নেই। জনকয়েক লোক দুর্গের দিক থেকে মাঠের উপর দিয়ে স্টেশনে এল।

খালি ট্রেনখানি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ছাড়বে। এরই মধ্যে জনকয়েক যাত্রী এসে গাড়িতে উঠে পড়েছে।

ঘড়ি দেখে স্বাতি বলল: অন্ধকার হবার আগেই বোধহয় ট্রেন ছাড়বে।

বললুম: আমরা এখন অনেক পশ্চিমে এসে গেছি। তাই দেরিতে অন্ধকার নামছে।

স্বাতি বলল: রাতের আহাব কোথায় হবে?

বললুম: এর পরে তো একটি বড় স্টেশন, তার নাম পোকারন। সেখানে এ ট্রেন পৌছবে অনেক বাতে। আর কিছু পাওয়া যায় কিনা—

কাজেই—

বলে স্বাতি চায়েব দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই যা পাওয়া গেল তাই আমরা খেয়ে নিলুম। তার পরে মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লুম। সকালের সেই ছেলেরাই উপস্থিত ছিল। তারাই সব গুছিয়ে দিল। স্বাতি তাদের হাতে যা দিল, তাতে ওরা ভারি খুশি হল। জিজ্ঞাসা করল: আবার কবে আসবে?

আর একটি ছেলে বলল: শ্রাবণ মাসে এসো, তাহলে আকাশ থেকে জল পড়া দেখতে পাবে।

স্বাতি বলতে পারল না যে আবার আমরা আসব।

দরজার সামনে ছেলেরা দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেন ছাড়বার পরে খানিকটা এগিয়ে এল ট্রেনের সঙ্গে। তার পরে আর তাদের দেখতে পেলুম না।

গাড়িতে যাত্রীর ভিড় নেই। জানলার দিকে চেয়ে স্বাতি নিঃশব্দে বসে রইল। আমি জানি, সে এখনও ঐ ছেলেদের কথাই ভাবছে। ভাবছে তাদের দুর্দশার কথা। এদের জন্যে কেউ ভাবছে না কেন, তাই ভেবেই সে নিজে দুঃখ পাচ্ছে।

আজ আমরা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে চলেছি। কিছু দিন আগেও এর নাম ছিল থার্ড ক্লাস। এক সময়ে ভারতীয় রেলপথে পাঁচটি

শ্রেণী ছিল। এয়ার কণ্ডিসণ্ড ক্লাস ছেড়ে দিলে চারটি। তাদের নাম ছিল ফার্স্ট সেকেণ্ড ইণ্টার ও থার্ড। ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের আরাম প্রায় সমানই ছিল। দেশের বড়লোকেরা চড়ত সেকেণ্ড ক্লাসে, আর সাহেবরা ফার্স্ট ক্লাসে চড়ত কালা আদ্‌মির সংস্রব এড়াবার জন্যে। স্বাতিব বাবা মা এই রকম সেকেণ্ড ক্লাসে দেশ ভ্রমণ করতেন। তার পরে এই ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস মিলে এক হয়ে গেল, তার নাম হল ফার্স্ট ক্লাস, আর ইণ্টার হল সেকেণ্ড ক্লাস। এখন ইণ্টার উঠে গিয়ে থার্ড ক্লাস হয়েছে সেকেণ্ড ক্লাস। এয়ার কণ্ডিসণ্ডও হয়েছে। দেশেব ধনীরা আর রেলের ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে না, যাতায়াত কবে এবোপ্লেনে। সরকাবী ও বেসরকারী কর্মচারীবা এরোপ্লেনের ভাড়া না পেলেই রেলেব ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে। নিজেব পয়সায় ফার্স্ট ক্লাসে চডে এমন লোক এখন বিরল।

আমাদেব প্রথম যাত্রার কথা আমাব মনে পড়ল। স্বাতির বাবা মা ফার্স্ট ক্লাসেই যাচ্ছিলেন স্বাতিকে নিয়ে। হাওড়া স্টেশনে বাম খেলাওন হারিয়ে গিয়েছিল। তার জন্যে যে থার্ড ক্লাসেব টিকিট কেনা হয়েছিল, তাব গায়ে একটা ইংরেজী 'এস' অক্ষব ছাপা ছিল। 'এস' মানে সার্ভেণ্ট। পরে এই কথাটা হয়েছিল 'অ্যাটেণ্ডাণ্ট'। এখন আর এ সব নেই, এখন সবাই সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী। আমরাও দুজনেই চলেছি সেকেণ্ড ক্লাসে।

এই সেকেণ্ড ক্লাসের সুবিধা সুযোগ এখন অনেক বেড়েছে। সাধারণ সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া টু টায়ার ও থ্রি টায়ার সেকেণ্ড ক্লাস হয়েছে। একখানা বেঞ্চির উপরে এক বা দুটো করে থাক। একজনের উপরে আর একজন বা দুজন শুতে পারে। এই সব গাড়িতে নানা রকমের নিয়মকানুন। ফার্স্ট ক্লাসের মতো এই সব বার্থও রিজার্ভ করা চলে। কম পয়সায় দূরের যাত্রা তাই অনেক আরামপ্রদ হয়েছে। তা না হলে এবারে এমন দূরের পথে বেরিয়ে পড়া আমাদের সম্ভব হত না।

স্বাতি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল: তুমি কি যোধপুরে সারা দিন কাটিয়ে রাতের ট্রেন ধরতে চাও?

যোধপুরে কি আমাদের আরও কিছু দেখবার আছে?

স্বাতি বলল: অযথা সময় নষ্ট করে লাভ কী!

বললুম: সেই ভাল। সময় মতো পৌঁছতে পারলে আমরা মারবাড়ের দিকেই এগিয়ে যাব।

তুমি কি রণকপুরের মন্দির দেখার কথা ভাবছ?

বললুম: এক দিনে দেখা সম্ভব বলে মনে হয় না।

কেন সম্ভব হবে না?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের সঙ্গে কোন টাইম টেবল ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ করে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছিল আমার। সেই ধারণা থেকেই বললুম: যোধপুর থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়বে সকাল আটটায়। সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছবে মারবাড়ে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা দিল্লী আমেদাবাদ মেল পেয়ে যাব।

স্বাতি বলল: মারবাড় থেকে ফল্‌সা ঘণ্টা খানেকের পথ। তার মানে দুপুর বেলায় পৌঁছব, আর উদয়পুরের দিকের বাস পেতেও বোধহয় দেরি হবে না।

বললুম: প্রশ্নটা রাত্রিবাসের। যেখানে সেখানে রাত কাটানো কি উচিত?

স্বাতি বলল: ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে।

হেসে বললুম: একা হলে এ সব কথা ভাবতুম না।

এর পরে স্বাতি আর কোন কথা বলল না।

আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটছিল। কোন গ্রাম নেই, কোন গাছপালা নেই, শুধু বালি। এই বালির সমুদ্র দূরের দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। চিল্কার কথা আমার মনে পড়ে গেল। যেবারে আমরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলুম, সেবারে

আমি একা ছিলুম তৃতীয় শ্রেণীতে। আর অন্ধকার রাতে ট্রেন থেকে চিল্কা হ্রদ দেখতে পেয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, সমুদ্রের জল রেল লাইনের ধার থেকে আকাশে গিয়ে মিশেছে, কিংবা আকাশটাই নেমে এসে রেল লাইনটা ছুঁয়ে আছে। এখানেও কতকটা এই রকমই মনে হচ্ছে। মরুভূমির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি বলেই ভুল হচ্ছে না।

রাত প্রায় সোয়া আটটার সময়ে ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আসার পথে স্বাতি এখানে নেমেই খান কয়েক ছবি তুলেছিল। প্ল্যাটফর্মের উপরে সেই ছোট গাছটিও দেখতে পেলুম। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল।

এর পরের স্টেশন আসবে ঘণ্টা খানেক পরে। তাই ট্রেন ছাড়তেই স্বাতি বলল: এইবারে কি শুয়ে পড়বে?

বললুম: আর কিছু তো ভেবে পাচ্ছি না।

স্বাতি বলল: ভোর বেলায় উঠতে হবে। ছটা চল্লিশে পৌঁছব যোধপুরে। তার আগেই আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে।

বললুম: ঘণ্টা খানেক আগে জাগলে কয়েকটা স্টেশন দেখা যেত।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: মাণ্ডোর মহামন্দির আর রাইকা-বাগ প্যালেস। এ দিকে আসার পথে অন্ধকারে দেখতে পাই নি।

স্বাতি বলল: ফেরার পথেও বোধহয় অন্ধকার থাকবে।

তার পরেই প্রশ্ন করল: বালুরামবাবু কি স্টেশনে আসবেন?

এই প্রশ্নে আমি কিছু আশ্চর্য হলুম। বললুম: হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

স্বাতি বলল: আমার মনে হয়, ভদ্রলোক আর আমাদের কাছে আসবেন না।

কেন?

আমাদের পরামর্শ তাঁর ভাল লাগে নি।

আমরা তো অন্যায় কিছু বলি নি!

স্বাতি বলল: তাদের প্রেম তো আমরা সত্য বলে স্বীকার করি নি! এ কি আমাদের অন্যায় হয় নি!

আমরা কি তাদের প্রেম অস্বীকার করেছি!

করেছি বৈকি। বলেছি, প্রেম সত্য হলে কোন বাধাই আর বাধা মনে হবে না। তার মানে, একটা সামান্য সামাজিক বাধা অতিক্রম করতে পারছে না বলেই আমরা তাদের প্রেম সত্য নয় বলে সন্দেহ করেছি।

বললুম: ঐ সামাজিক বাধা তারা সামান্য বলে ভাবতে পারছে না। তাদের দীর্ঘ দিনের সংস্কারে এই বাধাকে তারা মস্ত বলে মনে করছে।

স্বাতি বলল: এ কালের ছেলেমেয়েরা তা মনে করবে কেন! সমাজটা কি পিছিয়ে যাচ্ছে!

আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলুম না। স্বাতি বিছানা বিছিয়ে দিতেই শুয়ে পড়লুম। কিন্তু গাড়ির বাতি নেবানো গেল না বলে চট করে ঘুম এল না।

স্বাতির কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়ে স্বাতির মা আমাকে বলেছিলেন যে অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়ে হবে, পাত্র ঠিক হয়েই আছে। পরে কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় বসে স্বাতি আমাকে বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে সব মেয়েই করে, আমিও ভয় পাই নে বিয়ে করতে। বিয়ে তো মানুষের সঙ্গেই হয়। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে হবে যে লোককে, তাকে আমি মানুষ ভাবি নে।

আমি দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রশ্ন জানিয়েছিলুম। আর স্বাতি বলেছিল, লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে

সাহেবিয়ানা এনেছে সেখান থেকে। তাব সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে বান্ধবীব। আব সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব। এক দিন মনে হয়েছিল, তার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে রাম খেলাওনের সঙ্গে ইলোপ কবাও সহজ হবে আমার কাছে।

মানুষের মনের উপর জোব খাটে মনেরই। তাই মুখে তর্ক করবার প্রবৃত্তি সেদিন হয় নি। কিন্তু এ বিয়ে হয় নি। বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কেন এমন হয়েছিল তা জানি নে, জানতে পারি নি, জানবার জন্যে কোন কৌতূহল প্রকাশ কবতেও পাবি নি। আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতিই আপত্তি কবেছিল। বেঁকে বসেছিল একজন অপছন্দের পুরুষকে গ্রহণ কবতে। অন্য কোন কারণও থাকতে পাবে। কিন্তু সে কাবণ আমাব কাছে বড নয়। আমার কাছে যা চিবকাল বড় মনে হয়েছে, তা স্বাতিব সংকল্প। সে যা ভাল মনে করেছে, সে নিঃশব্দে সেই দিকেই এগিয়ে গিয়েছে। কারও সঙ্গে কলহ কবে নি, সংঘর্ষ হয় নি কারও সঙ্গে। ঘটনাব স্রোতকে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছে কৌশলে। কাউকে ছলনা করে নি, বঞ্চিত হয় নি নিজেও। তার সংকল্পকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবেছে পূর্ণ মর্যাদায়। স্বাতিকে আমি আজও তাই শ্রদ্ধা কবি।

ভোর বেলায় স্বাতি আমাকে ডেকে দিল। বলল: আমি তৈরি হয়ে নিয়েছি। এইবারে উঠে পড।

স্বাতিব হাতের স্পর্শে আমাব ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমি চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করেই শুয়েছিলুম। কিন্তু আমি জেগে গিয়েছি বুঝতে পেরেই স্বাতি এই কথা বলল।

উঠে বসে বললুম: কত দূর এসেছি?

সময় দেখে মনে হচ্ছে, যোধপুর পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসে দেখলুম যে আমরা রাই-কা বাগ

প্যালেস জংশন ছেড়ে যাচ্ছি। এর পরেই যোধপুরে পৌঁছব। বিছানাপত্র স্বাতি গুছিয়ে নিয়েছিল। বলল: সময় মতোই পৌঁছচ্ছি। যোধপুরে একটা দিন আমাদের নষ্ট করতে হবে না।

যোধপুরের প্ল্যাটফর্মে বালুরামকে আমরা দেখতে পেলুম না। স্বাতি বলল: দেখলে তো! বালুরামবাবু আসেন নি।

বললুম: তাঁর আসবার সময় এখনও আছে।

স্বাতি দৃঢ়স্বরে বলল: আমি জানি, ভদ্রলোক আসবেন না।

মারবাড় মেল দাঁড়িয়ে ছিল অন্য প্ল্যাটফর্মে। আমরা একটা পছন্দ মতো কামরায় উঠে বসলুম। তার পরে আমি গেলুম জলযোগের ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। স্বাতি একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে ফিরতে দেখে বলল: বালুরাম-বাবুর এই ছাত্রটি এসেছে একখানা চিঠি নিয়ে।

বলে চিঠিখানি আমার দিকে এগিয়ে দিল।

খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। ইংরেজীতে যা লিখেছে তার মর্মার্থ হল: আপনারা ঠিকই বলেছেন। তাই বিকানেরে যাচ্ছি। একটা ফয়সালা করেই ফিরব। স্টেশনে দেখা করব বলে কথা দিয়েছিলাম। তা পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনাদের ঠিকানা দেবেন। ফলাফল জানাব। সফল হলে আশীর্বাদ করবেন। বালুরাম।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই স্বাতি বলল: দুটো ঠিকানাই দিই, কী বল?

বললুম: আমাদের ঠিকানা তো একটাই!

আর একটা রাণাবাবুর ঠিকানা।

বলে সে তার ব্যাগ থেকে চাওলার দেওয়া ঠিকানা বার করল।

এত তাড়াতাড়ি কি চিঠি পৌঁছবে?

বলে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: বালুরামবাবু কবে ফিরবেন?

ছেলেটি বলল: কাল বাসে গেছেন, আজ রাতে ফিরতে না পারলে কাল সকালে নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

বললুম: তাহলে রাণার ঠিকানা দিয়ে লাভ নেই।

স্বাতি খস খস করে ছুটো ঠিকানা লিখে ছেলেটির হাতে দিল। আর আমি তাকে বললুম: গান্ধীধামে আমবা এক দিন মাত্র থাকব।

ছেলেটি আমাদেব নমস্কাব কবে বিদায নিল।

২৫

মিনিট চল্লিশ পরে আমরা একটা বড় স্টেশনে এসে পৌছলুম। তার নাম লুনি জংশন। যাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এখান থেকেই বার্মেরগামী ট্রেন লুনি নদীর উত্তর তীর ধরে সোজা পশ্চিমে যাবে, আর আমরা এই নদী পার হয়ে দক্ষিণে মারবাড় জংশনে যাচ্ছি। যোধপুর থেকে বার্মের এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত দশটা চল্লিশ মিনিটে, আর ভোর সোয়া চারটেয় পৌছে যায় বার্মের। প্যাসেঞ্জার ট্রেন সকাল নটায় ছেড়ে বিকেল চারটেয় পৌছয়। রেল লাইন বার্মেরেই শেষ হয়ে যায় নি, আরও পঁচাত্তর মাইল পশ্চিমে পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত গেছে। শেষ স্টেশনের নাম মুলাবাও। সেখান থেকে পাকিস্তান রেলপথ হায়দ্রাবাদে গেছে। বার্মের থেকে মুলাবাও একখানা ট্রেন যাতায়াত করে। ছ ঘণ্টার পথ। সকাল সাতটায় গিয়ে রাত আটটায় ফিরে আসে। মুলাবাওএ দাঁড়ায় ঘণ্টা খানেক।

লুনি জংশনে ট্রেন মিনিট পাঁচেক দাঁড়াল। তার পরে খানিকটা এগিয়েই লুনি নদীর পুলের উপরে এসে উঠল।

স্বাতি বলল: নদীর নামটা আমার শোনা মনে হচ্ছে।

বললুম: লুনি হল মরুস্থলীর বিখ্যাত নদী। মহাভারতে আমরা যে মরুস্থলী নাম পাই, অনেকে তাকেই বলেন মারবাড়। ভারত স্বাধীন হবার আগে এটি একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। তারই রাজধানী যোধপুর। পরে রাজধানীর নামেই রাজ্যের নাম হয়েছিল।

স্বাতি বলল: লুনি নাম কি মহাভারতে ছিল?

বললুম: ঠিক মনে পড়ছে না। তবে লুনি তো এর বর্তমান নাম। এক সময়ে নাকি এর নাম ছিল লবণবারি।

লবণ মানে তো নুন। জলের স্বাদ কি নোন্‌তা ?

বললুম ঃ শুনেছি, প্রথম দিকে এর জল মিষ্টি, কিন্তু পরে লবণাক্ত হয়েছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ সে কেমন করে সম্ভব ?

কিছুই অসম্ভব নয়। সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়েই হয়তো এই পরিবর্তন হয়েছে। তবে শুনেছি যে এই নদীর তীরে বালি খুঁড়ে যে জল পাওয়া যায়, তা সর্বত্রই মিষ্টি।

ভূগোলে এই লুনি নদীর কথা পড়েছিলুম। আজমীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরাবল্লী পাহাড়ে এই নদীর জন্ম। পাহাড়ের উত্তর থেকে আরও অনেক ছোট ছোট নদীর জন্ম হয়েছে। তার সবগুলোই নিচে নেমে লুনির সঙ্গে এসে মিলেছে। যোধপুর রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলকে এই সব নদীই সুজলা সুফলা করেছে। উৎসমুখে এই নদীর নাম নাকি লুনি বা লবণবারি ছিল না, নাম ছিল সাগরমতী।

স্বাতি বলল ঃ শবরমতী নদী তো আমরা দেখেছি।

হেসে বললুম ঃ সে তো শবরমতী। এ হল সাগরমতী। আজমীরের কাছে নাকি বিশাল নামে একটি হ্রদ আছে, সেইখান থেকেই সাগরমতীর জন্ম। পাহাড়ের নিচে এসে সরস্বতীর সঙ্গে মিলনের পর থেকেই সাগরমতীর নাম হয়েছে লবণবারি বা লুনি। সরস্বতীর উৎস পুষ্করে।

এখানেও সরস্বতী নদী আছে ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ সরস্বতী আমাদের দেশের এক বিচিত্র নদী। ঋগ্বেদের ঋষিরা এই নদীর স্তব করতেন দেবতার মতো। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই ছিল আর্যদের প্রথম বসতি। সে জায়গার নাম ব্রহ্মাবর্ত। হিমালয়ের শিবালিক পাহাড়ে জন্ম নিয়ে এই সরস্বতী প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হত সমুদ্রের দিকে। গঙ্গার মতো

বঙ্গোপসাগরে নয়, সিন্ধুর মতো আরব সাগরে এসে শেষ হত এই নদী।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: প্রয়াগে যে ত্রিবেণী সঙ্গম, তাতেও তো সরস্বতীর নাম শুনেছি।

বললুম: শুধু প্রয়াগে কেন, বাঙলার ত্রিবেণীতেও তো সরস্বতী ছিল। এখন আর নেই বলে লোকে বলে সরস্বতী গুপ্ত ভাবে প্রবাহিত। কিন্তু ঋগ্বেদের সবস্বতী ওদিকে প্রবাহিত হয় নি। এই সরস্বতী মরুস্থলীর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

কেন?

তাহলে একটা অনুমানের কথা বলতে হয়।

বল।

এই অঞ্চলে একটা ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মেনে নিতে হয়। হিমালয়ের গায়ে সামুদ্রিক জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখে যেমন মনে করা হয় যে এই পর্বতমালা সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছিল, তেমনি এখানকার জলরাশি শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সে যুগে আরব সাগর এখনকার মতো দূরে ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমুদ্র অনেক পশ্চিমে সরে গেছে বলেই সরস্বতী হারিয়ে গেছে মরুভূমির মধ্যে।

স্বাতি বলল: এই অনুমান কি তোমার নিজের?

বললুম: এ কথা কোথাও পড়েছি কিনা এখন মনে পড়ছে না। তবে সরস্বতীকে আমরা এখন নাকি তিন জায়গায় দেখতে পাই। এর উৎস হল হিমালয়ে শিবালিক পর্বত শ্রেণীর শিরমুর পাহাড়ের এক প্লক্ষবৃক্ষে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: প্লক্ষবৃক্ষ আবাব কী?

হেসে বললুম: পাকুড় গাছ।

গাছ থেকে নদী বেরোয় নাকি!

গাছ থেকে বেরিয়েছে, না গাছের কাছ থেকে বেরিয়েছে তা

বলতে পারব না। তবে পুরাণের মতে এই প্লক্ষ প্রস্রবণ গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রীর মতোই পবিত্র।

স্বাতি বলল : জায়গাটা কোথায় বুঝতে পেরেছ ?

বললুম : বোঝবার দরকার নেই।

কেন ?

এ নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। কেউ বলেন বদরীকাশ্রমে এই নদীর জন্ম। আবার কেউ বলেন, না, এ নদীর জন্ম হয়েছে ব্রহ্মসরসে। এই সব মতান্তর থেকেই আমার ধারণা হয়েছে যে ঋগ্বেদের সরস্বতীকে আমরা আজও খুঁজে পাই নি। কোথায় কোথায় এই নদীকে দেখা গেছে, এবং হারিয়ে গেছে কোথায় কোথায়, সে সব জায়গার নাম শুনলেও মাথা গুলিয়ে যাবে। তবে দু-একটি নাম মেনে নেওয়া দরকার। তা হল ব্রহ্মাবর্তের কুরুক্ষেত্র ও পৃথুদক। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর তীরে পুরাকালে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিলাশন নামে এক জায়গায় সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেছে বালির মধ্যে।

বিলাশন কোথায় ?

জানি নে। তবে বালির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে বলে মনে হয় যে সে জায়গা এই মরুভূমির দেশেই ছিল। বিলাশনের আধুনিক নাম কী, পণ্ডিতরা হয়তো তা বলতে পারবেন।

তার পর ?

আরও দু জায়গায় সরস্বতীর নাম পাওয়া যায়। রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে আবার তাকে পাওয়া যায় আবু পাহাড়ের নিকটে। এই ধারাও অদৃশ্য হয়ে যায় কচ্ছের মরুভূমিতে। তৃতীয়বার তাকে আমরা সৌরাষ্ট্রের বনময় অঞ্চল গির ফরেস্টে প্রকাশিত হতে দেখি। এই ধারা প্রভাসের নিকটে সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। ঋগ্বেদের সরস্বতী নাকি এই পথেই প্রবাহিত হত।

স্বাতি বলল : তোমার কি বিশ্বাস হয় যে এই ভাবে লুকোচুরি

করে কোন নদী হিমালয় থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে ?

বললুম ঃ বিশ্বাস হয় না বলে এই লুকোচুরির ব্যাপারে একটি পৌরাণিক গল্পও আছে। কিন্তু এ গল্প আমি কোন পুরাণে পড়ি নি। পড়েছি কোন পুরাণবেত্তা অবাঙালীর ইংরেজী লেখায়।

তোমার তো সব পুরাণ পড়া আছে ?

সে অহংকার আমার নেই। হাতের কাছে যা পেয়েছি, তাই পড়েছি। কাজেই অন্যের লেখা ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে।

স্বাতি বলল ঃ গল্পটা সংক্ষেপে বল।

বললুম ঃ দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেছিলেন চন্দ্র। এই নিয়ে দেবাসুরে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। তার কারণ চন্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শরণ নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করায় যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল।

স্বাতি বলল ঃ যে গল্প জানি সে তো কতকটা এই রকমই। এর পরের ঘটনা জানো না। যুদ্ধের পরে দেবতারা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র দধীচি মুনির আশ্রমে জমা রেখেছিলেন। তার পরে হিমালয়ে তপস্যা করতে যাবার সময় দধীচি সেই সব অস্ত্র জলে ধুয়ে সেই জল পান করে চলে গেলেন। সমস্ত অস্ত্রশক্তি তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। পরে দেবতারা যখন সেই অস্ত্র ফেরত চাইলেন, তখন দধীচি নিজের দেহটা দিলেন দেবতাদের। তাঁর দেহের হাড়ে বজ্র ও নানা রকমের অস্ত্র তৈরি হল।

স্বাতি বলল ঃ দধীচির হাড়ে যে বজ্র তৈরি হয়েছিল সে গল্পও তো জানি।

কিন্তু তার পরের কথা জানো না। দধীচির নাকি পিপ্পলাদ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি এই কথা জেনে দেবতাদের স্বার্থপরতায় ভীষণ রেগে গেলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদরীকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। সেই তপস্যায় তাঁর উরু থেকে বাড়বানল

জন্মাল। এই বাড়বানল প্রতি দিন একজন দেবতাকে ধ্বংস করতে লাগল। দেবতাদের বিপদ দেখে বিষ্ণু এলেন মধ্যস্থতা করতে। বাড়বানল রাজী হল, সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রের জল পান করেই সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবে। কিন্তু কে এই বাড়বানল সমুদ্রে নিয়ে যাবে ?

স্বাতি হেসে বলল : সরস্বতী নদী।

তার হাসিতে যোগ দিয়ে আমি বললুম : ঠিক বলেছ। বাড়বানল বলেছিল যে কোন কুমারী কন্যা তাকে নিয়ে সমুদ্রে যাবে। আর এ কথা শুনেই ব্রহ্মা তাঁর কন্যা সরস্বতীকে এই ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু সরস্বতী বললেন, এত দূরের পথে পাপীদের সংস্পর্শে যে বাড়বানল অপবিত্র হয়ে যাবে, তার উপায় !

স্বাতি হাসতে হাসতে বলল : মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি নে !

ব্রহ্মা তাকে সেই উপদেশই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, খুব পরিশ্রান্ত বোধ করলে যেন মাটির উপরে চলে আসে। সরস্বতী তাই কোথাও অদৃশ্য হয়েছে, কোথাও প্রবাহিত হয়েছে মাটির উপরে।

লুনি নদীর পুল আমরা অনেকক্ষণ আগে পেরিয়ে এসেছিলুম। পুল খুব অপ্রশস্ত নয়। ক্ষীণ জলধারা অগভীর। বর্ষায় এই নদীর স্রোত গভীর খাতে প্রবাহিত হয় না। কূল ছাপিয়ে দুধারে প্রসারিত হয় বন্যার মতো। তাতে গম ও বার্লির চাষ ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে শুকনো বালির উপরে তরমুজ খরমুজ জাতীয় ফল পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। এই নদীর উত্তর থেকেই মরুভূমির বিস্তার। বিলারা নামে এক জায়গায় এই নদীতে বাঁধ দিয়ে একটা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়েছে। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের নামে তার নাম হয়েছে যশোবন্ত সাগর।

পুষ্করে যে সরস্বতীর উৎপত্তি, তা লুনি নদীতে এসে মিশেছে। আর লুনি পড়েছে কচ্ছের রণে। রণে পড়বার অনেক আগে থেকেই লুনির জল লবণাক্ত। কিন্তু তার দু তীরে বালি খুঁড়ে যে

জল পাওয়া যায় তা মিষ্টি। নিকটের কূপেও মিষ্টি জল পাওয়া যায়।

এর পরে আরও দুটো ছোট ছোট স্টেশনে আমাদের ট্রেন থামল। তার পরে পৌঁছল মারবাড় জংশনে। আমাদের ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

রাত আটটার পরে বিকানের থেকে এই মারবাড় মেল ছেড়েছিল। এইখানে এসেই তার যাত্রা শেষ হল। আমরা নেমে পড়লুম। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে দিল্লী-আমেদাবাদ মেল এখানে আসে এগারোটা সাতান্ন মিনিটে। দাঁড়ায় দশ মিনিট। আজ কয়েক মিনিট মাত্র লেট আছে।

প্ল্যাটফর্মেই রিফ্রেশমেণ্ট রুম দেখতে পেলুম। আমিষ ও নিরামিষ দুরকম খাবারই পাওয়া যায়। কাল রাতে আমাদের খাওয়া হয় নি। সকালেব ব্রেকফাস্টও গাড়ির ঝাঁকানিতে হজম হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া যাক।

বললুম : একটু আগে খাওয়া হবে। তা হোক। কিন্তু আমাদের মালপত্র সামলাবে কে ?

একজন একজন করে খেয়ে আসা চলত, কিন্তু স্বাতি বলল : চল, রিফ্রেশমেণ্ট রুমের দরজায় এ সব রেখে এই দিকে মুখ করেই খেতে বসব।

আমরা সেই ব্যবস্থাই করলুম।

প্ল্যাটফর্মে আর একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। এই ট্রেন এখান থেকে দিল্লীর দিকের যাত্রী নিয়ে উদয়পুরে যাবে। আরও একটি নতুন কথা এখানে জানতে পারলুম। চিতোরগড় থেকে এখন আমেদাবাদের ট্রেন যাচ্ছে উদয়পুরের উপর দিয়ে। ভোর চারটে কুড়ি মিনিটে এই ট্রেন চিতোরগড় থেকে ছাড়ে, উদয়পুরে আসে সকাল সোয়া আটটায়। তার পর সাড়ে নটায় উদয়পুর ছেড়ে

আমেদাবাদ পৌঁছয় রাত নটার পরে। আমেদাবাদ থেকে এই ট্রেন সকাল সাড়ে ছটায় ছেড়ে বিকেল সাড়ে চারটেয় পৌঁছয় উদয়পুরে।

এই খবর পেয়ে স্বাতি বলল: যাত্রীদের তাহলে ভারি সুবিধা হয়েছে।

কেন?

যাত্রীদের পথ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গেল। আজমীর থেকে চিতোরগড় উদয়পুর দেখে আবু রোডে না গিয়ে সোজা আবু রোডে যেতে পারবে, সেখান থেকে আমেদাবাদ দ্বারকা সোমনাথ। ফেরার পথে অতটা পথ ঘুরে না এসে আমেদাবাদ থেকেই চলে আসতে পারবে উদয়পুর আর চিতোরগড়ে।

বললুম: তার পরে মধ্যপ্রদেশ বেড়াবার ইচ্ছা থাকলে চিতোরগড় থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রাতলামের ওপর দিয়ে ইন্দোর উজ্জয়িনী।

স্বাতি বলল: অত ভাবতে পারছি নে। কিন্তু কতটা পথ সংক্ষেপ হবে বলতে পার?

অত হিসেব করতে পারব না। তবে উদয়পুর থেকে আমেদাবাদের দূরত্ব একশো তিরিশ মাইলের মতো হবে।

খাবার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল। স্বাতি ঘড়ি দেখল দু-একবার। কিন্তু দুর্ভাবনা হবার আগেই খাবার এসে গেল। মালপত্রের উপরে চোখ রেখে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলুম।

প্ল্যাটফর্মে খুব বেশি যাত্রী ছিল না। দূরের যাত্রী না হলে বোধহয় মেল ট্রেনে ওঠা যায় না। এ সব আইনকানুন টাইম টেবলের পিছনে লেখা থাকে, কিন্তু আমরা পড়ে দেখি না। ঠেকেই শিখি। আমরা ভুজের টিকিট কেটেছি। ভুজ হল কচ্ছের রাজধানী। জয়সলমের থেকে যোধপুর পর্যন্ত ভাড়া কম, তার পরে পালনপুর পর্যন্ত ভাড়া বেশি। সেখান থেকে ভুজ

পর্যন্ত আবার ভাড়া কম। এ সব হিসেবনিকেশ আমরা বুঝি না, বোঝবার চেষ্টাও করি না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিয়েছিলুম যে আমরা বিকেল পাঁচটা নাগাদ পালনপুরে পৌঁছব। আর ভুজের ট্রেন পাব রাত সাড়ে বারোটায়। সকাল সাড়ে নটায় গান্ধীধাম ও ভুজ সাড়ে বারোটায়। তার পরের কথা ভুজে পৌঁছেই ভেবে দেখব।

দিল্লী-আমেদাবাদ মেল স্টেশনে ঢুকছিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একটা খালি কামরা আমাদের বেছে নিয়ে উঠে পড়তে হবে। খালি কামরা মানে একেবারে খালি নয়, বসবার জায়গা পাওয়া যায় এমন একটি কামরা। আর এ কাজটি তৎপর ভাবে সারতে হবে।

স্বাতির আরও একটু উদ্দেশ্য থাকে। এমন কোন সহযাত্রী পাওয়া যায় কিনা যার কাছে কিছু জানা যেতে পারে। এ যাত্রায় সর্বত্র আমরা হতাশ হয়েছি।

২৬

এই যে দাদা, আমরা এই গাড়িতে।

হঠাৎ এই চিৎকার শুনে চমকে চেয়ে দেখলুম যে একজন চেনা-চেনা ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন। ভদ্রলোক কে, তা মনে করবার চেষ্টা না করে আমি স্বাতিকে বললুম এগিয়ে আসতে।

গাড়ি থামতে না থামতেই ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন: কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

এতক্ষণে ভদ্রলোককে আমি চিনতে পেরেছি। নাগপুরের দত্তবাবু। বললুম: কচ্ছে যাচ্ছি।

স্বাতি এগিয়ে এসেছিল। তার দিকে একবার চেয়েই দত্তবাবু আমার দিকে তাকালেন অনেক কৌতূহল নিয়ে। আমি শুধু হেসে আমার মাথা নাড়লুম। মানে, দুজনের সম্পর্কটা আপনি ঠিকই বুঝেছেন।

ভদ্রলোক গদগদ ভাবে স্বাতিকে নমস্কার করে বললেন: আসুন আসুন, আমাদের গাড়িতে আসুন। এই কুলি, কী করছিস দাঁড়িয়ে, উঠে পড়্ না এই গাড়িতে।

ঝরঝরে হিন্দীতে কুলিকে তাড়া দিয়ে তার সঙ্গে নিজেও উঠে পড়লেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি মৃদুস্বরে বললুম: পথের পরিচয়। একবার ট্রেনে আর একবার ওয়েটিং রুমে দেখা হয়েছিল। বাকি সব কথা নিজেই বলবেন।

বলে আমরাও উঠে পড়লুম।

দত্তবাবু আমাদের জিনিসপত্র তাঁদের নিজের কাছে সাজিয়ে ফেলেছিলেন। স্বাতি কুলির পয়সা দিয়ে দিল।

শতরঞ্জির উপরে শুয়ে যে ভদ্রমহিলা বিরক্তভাবে তাকাচ্ছিলেন আমাদের দিকে, তাঁকে আমি চিনতে পারলুম, তিনি দত্তবাবুর স্ত্রী। দক্ষিণ ভারতের ট্রেনে তাঁকে আমি ঠিক এই ভাবেই শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম। এই রকমেরই বিরক্তির ভাব ছিল চোখে মুখে, আর স্বামীর দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। কঠিন দৃষ্টিতেই নানা বিষয়ে বোধহয় সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। আজও তাঁর দৃষ্টিতে সেই রকমেরই একটা ভাব দেখতে পেলুম।

কিন্তু দত্তবাবু খুব বেশি বিচলিত হলেন না। বললেন: দাদাকে চিনতে পারলে না?

বলে আমার দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলুম যে আমার নাম তাঁর মনে নেই। সেবারে ঝান্সির ওয়েটিং রুমে যখন দেখা হয়, তখন আমার পরিচয় তিনি জানতেন না। আমি নিজেই আমাব পরিচয় দিয়েছিলুম। এটা বোধহয় তাঁর চাকরির গুণ। নাগপুর রেলস্টেশনের টিকিট কালেক্টর তিনি। গেটে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষের যাতায়াত দেখেন। অনেক নিয়মিত যাত্রীরই মুখ চেনেন, কিন্তু পরিচয় হয়তো জানেন না। সবাইকেই দাদা ভাই বলে খুশি রাখেন। ভদ্রমহিলাও দেখলুম আমাকে ভুলে গেছেন। তাই বললুম: আমার নাম গোপাল। আর ইনি স্বাতি।

নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে ভদ্রমহিলা পা দুটো গুটিয়ে নিলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন উঠে বসলেন। কিন্তু স্বাতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জানবার জন্যে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

দত্তবাবু বললেন: এরই মধ্যে ভুলে গেলে গোপালদাকে! এই তো সেদিন—

বলে থেমে গেলেন।

বললুম: ঝাঁসির ওয়েটিং রুমে—

বাধা দিয়ে দত্তবাবু বলে উঠলেন: কত গল্প হল ওয়েটিং রূমে বসে।

তবু তাঁর স্ত্রী কিছু মনে করতে পারলেন না। মনে পড়ে থাকলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তাঁর কাছে এ সংবাদ মোটেই মূল্যবান বলে মনে হল না।

দত্তবাবু তাঁর স্ত্রীর পায়ের দিকে বসলেন। আর আমরা বসলুম সামনে। স্বাতি দত্তবাবুর সামনে বসে জিজ্ঞাসা কবল: আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

আমরা !

বলে দত্তবাবু হাসলেন। পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে সকৌতুকে প্রশ্ন কবলেন: সিগারেটের গন্ধ আপনার ভালো লাগে তো ?

স্বাতি বলল: খারাপ লাগে না।

তাহলে দাদার একটা চলবে নাকি ?

এই সিগারেট খাওয়ার গল্প আমার মনে পড়ে গেল। যেবারে প্রথম তাঁকে ট্রেনের কামরায় দেখেছিলুম, তিনি তখন সিগারেট খাওয়া মক্স করছিলেন। সিগারেটের গন্ধ তাঁর স্ত্রীর ভাল লাগে বলে তিনি এক রকমের ছোট সিগারেট ধরিয়ে আনাড়ির মতো টেনেছিলেন। তার পরে সেটা ফেলে দিয়ে সুস্থ বোধ করেছিলেন। পরের বারে তাঁকে কড়া চারমিনার খেতে দেখেছি। এবারেও চারমিনার বার করেছিলেন। আমি সংক্ষেপে বললুম: না।

দত্তবাবু স্বাতির মুখের দিকে তাকাতেই স্বাতি বলল: পুরুষরা নেশা আর মেয়েরা শৌখিনতা বর্জন করতে পারলে জীবনে সুখী হবার বাধা কমে যায়।

দত্তবাবু একটা সিগারেট টেনে বার করছিলেন। থমকে গেলেন। স্বাতি তাই দেখে হেসে বলল: শুধু বিলাসিতা নয়, আলস্যও এক রকমের শৌখিনতা।

দত্তবাবু বললেন : খুব খাঁটি কথা বলেছেন।

খাঁটি কথা কিনা জানি না, এ আমার বিশ্বাসের কথা। মুহূর্তকে অপচয় করলে জীবনকেই অপচয় করা হয়। জীবন তো মুহূর্তেরই সমষ্টি।

আমার মনে হল যে স্বাতি এই ভদ্রলোকের স্ত্রীর আলস্যকে সহ্য করতে পারছিল না। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে ও স্থূল দেহে আলস্যে দিন যাপনের চিহ্ন খুবই স্পষ্ট। কিন্তু স্বাতির মন্তব্য তিনি বোঝবার কোন চেষ্টা করলেন না। বরং তাঁর স্বামীর সঙ্গে স্বাতির এই কথোপকথন সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন বলে মনে হল না। আমার এ কথা মনে হতেই আমি বললুম : এবারে কি আবু পাহাড়ে যাচ্ছেন ?

পাহাড়ে বেড়ানো তাঁর স্ত্রীর শখ। এ কথা তিনি আমাকে প্রথম বারেই বলেছিলেন। পরের বারে অবশ্য বলেছিলেন যে এখন তাঁর স্ত্রীর পায়া ভারী হয়েছে বলে সে শখ বর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু এইবারে বললেন : প্রায় ধরে ফেলেছেন !

মানে ?

আবু রোডেই আমরা নামছি। কিন্তু আবু পাহাড়ে উঠছি না।

তবে ?

আবু রোড থেকে অম্বাজী নামের এক তীর্থে যাচ্ছি।

তীর্থে !

দত্তবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিরস্ত হলেন।

স্বাতি বলল : আবু রোডের কাছে কোন তীর্থ আছে বুঝি ?

দত্তবাবু সোৎসাহে বললেন : অম্বাজীর নাম শোনেন নি ! অরাসুর পাহাড়ে খুব জাগ্রত দেবতা এই অম্বাজী। মনে মনে যা চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন।

আমি তাঁকে আরও উৎসাহ দেবার জন্যে বললুম : সত্যি নাকি !

দত্তবাবু বললেন: আমাদের নাগপুরে এক গুজরাতী ভদ্রলোক আছেন, তাঁর কাছেই সব শুনেছি। আবু রোডে নেমে আপনারা সোজা আবু পাহাড়ে চলে যান তো, তাই অন্য দিকে যে এত বড় একটা তীর্থস্থান আছে তা জানতেও পারেন না। বেশি দূরে তো নয়, স্টেশন থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে—রাজস্থানের সীমানা পেরিয়ে গুজরাত রাজ্যে এই তীর্থ। এ যে একটা পীঠস্থান তাও বোধহয় জানেন না!

স্বাতি বলল: পীঠস্থান!

দত্তবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন: সতীর বাম স্তন পড়েছিল, আর জলন্ধরে ডান স্তন।

আমি বললুম না যে কালিকাপুরাণে আছে 'জালন্ধরে স্তনযুগম্'। অন্যত্র নাকি আছে—

আরাসনেঽর্বুদাঙ্গে তু ক্ষেত্রে জালন্ধরে তথা।
ক্রমশঃ পতিতৌ তস্যাঃ কুচৌ তু বামদক্ষিণৌ॥

দত্তবাবু এবারে জোরে জোরে বললেন: শাস্ত্রবাক্যে তো আপনাদের বিশ্বাস নেই, থাকলে অনেক কথা বলতে পারতাম।

স্বাতি বলল: বলুন না।

দত্তবাবু তাঁর পা দুখানা বেঞ্চের উপরে তুলে বললেন: আবু পাহাড়ের সঠিক নাম হল অর্বুদ পাহাড়, আর অম্বাজী হলেন অরাসুর পাহাড়ে। অম্বিকা থেকে অম্বাজী। অনেকে দেবী অরাসুরীও বলেন।

আমি বললুম: পাহাড় তো দুটো নয়, পাহাড় একটাই। তার নাম আরাবল্লী। এক জায়গায় তার নাম অর্বুদ, অন্য জায়গায় অরাসুর।

দত্তবাবু বলে উঠলেন: কিন্তু ভিদে তো এ কথা আমাকে বলে নি!

বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : ভিদে কে ?

ভিদের কথাতেই তো এখানে এলাম নাগপুরে আমরা ওর কাছেই সব কথা শুনেছি।

স্বাতি বলল : তার পরে বলুন।

দত্তবাবু বললেন : জানেন, কৃষ্ণের চূড়াকরণ হয়েছিল এইখানে। তার পরে তিনি এইখানে তণ্ড মুনির কাছে পুত্রলাভের বিষয়ে জানতে এসেছিলেন।

তণ্ড মুনির নাম আমি শুনি নি। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু জানি নে বলে আমি কোন কথা বললুম না।

দত্তবাবু বলতে লাগলেন : রুক্মিণী হরণের পরে রুক্মিণী এখানে অম্বিকার পূজো করেছিলেন। গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ এই অম্বিকাবনে এসেছিলেন তীর্থ যাত্রায়। সরস্বতী নদীতে স্নান করে দেবী অম্বিকা ও শিবের পূজো করেছিলেন।

স্বাতি বলল : সরস্বতী নদী আর শিবও এখানে আছেন নাকি ?

দত্তবাবু সগর্বে বললেন : না থাকলে এই তীর্থ এত বড় হল কী করে !

তার পরে নিজেই বলতে লাগলেন : অর্বুদ পাহাড়ে যে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল সে কথা জানেন তো ! এক দিন তাঁর কামধেনু নন্দিনী একটা গর্তে পড়ে যায়, আর উঠতে পারছে না দেখে বশিষ্ঠ সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। সরস্বতী এসে জলে ভাসিয়ে দিলেন গর্তটি, আর নন্দিনী জলে ভেসে উঠে এল বাইরে।

স্বাতি বলল : আবু পাহাড়ে তো এ গল্প শুনি নি !

শুনবেন কী করে ! আবু পাহাড়ে তো সরস্বতী নেই, সরস্বতী আছেন অরাসুর পাহাড়ে। অম্বাজী থেকে মাইল দুই দূরে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির, তারই সন্নিকটে সরস্বতীর উৎস। এই স্থানটি নাকি ভারি রমণীয়। আর এখান থেকে খানিকটা

দূরে কুণ্ডারিয় নামে এক গ্রামে আছে কয়েকটি সুন্দর জৈন মন্দির।

স্বাতি বলল: আবু পাহাড়ে তো বশিষ্ঠের আশ্রম। নন্দিনী তাহলে আর এক পাহাড়ে গিয়েছিল চরতে!

দত্তবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। করুণভাবে তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমি বললুম: নন্দিনী তো সামান্য গাভী ছিল না, তার দৈবশক্তি ছিল অসামান্য। রাজা বিশ্বামিত্রর সৈন্যরা যখন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিজের দেহ থেকে সৈন্য উৎপন্ন করে রাজার সেনাদলকে প্রচণ্ড যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল।

তবে এখানে কিছু করল না কেন?

প্রভুর আদেশ না পেলে কিছু করতে পারে না যে! তার পরে আর কী দেখবার আছে বলুন দত্তবাবু।

দত্তবাবু বললেন: কী আশ্চর্য! আপনি তো অনেক জানেন দেখছি!

বললুম: জানি আর কোথায়! একজনের কাছে শোনা গল্প আপনাকে বললুম, আবার আপনার কাছে শোনা গল্প আর একজনকে বলব। বলুন বলুন, নতুন কথা শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগে।

দত্তবাবু খুশি হয়ে বললেন: অম্বাজীর কথা বলছিলাম, তাই না?

স্বাতি বলল: হ্যাঁ।

কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হল যে মন্দিরের মধ্যে অম্বাজীর কোন মূর্তি নেই।

তবে?

দেওয়ালের গায়ে একটা যন্ত্র আছে। যন্ত্র মানে বোঝেন?

স্বাতি বলল: কী যন্ত্র?

দত্তবাবু সহাস্যে বললেন: না না, কোন ইনস্ট্রুমেণ্ট্ নয়। একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন হল তন্ত্রমন্ত্রের যন্ত্র। তাতেই শাড়ি গয়না পরিয়ে দেবীর মূর্তি করা হয়েছে। দেবী এমন জাগ্রত যে শুধু হিন্দু আর জৈন নয়, পার্সি আর মুসলমানেরাও নাকি আসে মানত করতে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: হিন্দুর মন্দিরে মুসলমানরাও মানত করতে আসে!

কেন আসবে না? পীরের দরগায় আমরা যাই নে!

কিন্তু কাফের বলে যে ওরা আমাদের ঘেন্না করে!

সবাই করে না।

আমি বললুম: আমরাও তো অনেক মন্দিরে অহিন্দুদের ঢুকতে দিই না।

হরিজনদেরই কি সব মন্দিরে ঢুকতে দিই!

স্বাতি বলল: চেহারা দেখে কি মানুষকে বেধর্মী বলে চেনা যায়!

দত্তবাবু বললেন: ধরা না পড়লে কোন নিয়মই মানতে হয় না। তার পরে শুনুন। এই দেবী কী রকমের জাগ্রত, তা একটা গল্প শুনলেই বুঝতে পারবেন। রাণা প্রতাপের গল্প।

তার পরে ভদ্রলোক সেই গল্পটি আমাদের বললেন। রাজ্যচ্যুত রাণা প্রতাপ তখন বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হল যে ইদরগড়ে তাঁর ইদর রানীর সঙ্গে একবার দেখা করবেন। এই খবর আকবর বাদশাহর কানে পৌঁছতেই তাঁর সেনাদল ইদরগড় ঘিরে ফেলল, রাণা প্রতাপকে তারা বন্দী করে ফেলবেই। এ দিকে রাণা প্রতাপও তাঁর সংকল্পে অটল—ইচ্ছা যখন হয়েছে, তখন রানীর সঙ্গে দেখা করবেনই। রাণা যাত্রা করলেন এক দুর্যোগের রাতে। হঠাৎ তাঁর চৈতক ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। সামনে নদী, বৃষ্টিতে বান ডেকেছে নদীতে।

গল্পের মাঝখানেই স্বাতি প্রশ্ন করল: কী করলেন তিনি?

দত্তবাবু বললেন : মানত করলেন এই অম্বাজীর কাছে। তাঁর সংকল্প পূর্ণ হলে নিজের তরবারি দেবীর পায়ে উৎসর্গ করবেন।

লোহার তরোয়াল!

বলে স্বাতি দত্তবাবুর দিকে তাকাল।

দত্তবাবু করুণভাবে তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাই আমি বললুম : তরোয়াল লোহার হলে হবে কী! ভারতবর্ষের একমাত্র স্বাধীন রাজার তরোয়াল তো। আকবর বাদশাহর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর তরোয়াল! যার জন্যে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। কত সম্মানের তরোয়াল বুঝুন!

ঠিক বলেছেন।

বলে দত্তবাবু আবার গল্প বলতে শুরু করলেন : সেই দুর্যোগের রাতেই রাণা প্রতাপ ইদরগড়ে ঢুকে দেখা করলেন রানীর সঙ্গে। তার পরে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন নিরাপদে। কেউ তাঁকে বন্দী করতে পারল না।

স্বাতি বলল : সত্যি!

দত্তবাবু বললেন : সত্যি কিনা তা দেবীর পায়ে রাণা প্রতাপের তরোয়াল দেখেই জানতে পারবেন।

গল্পের মাঝে মাঝে দত্তবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বসেছিলেন। বোধহয় বিরক্ত হয়েছেন উঠে বসতে হয়েছে বলে। কিন্তু দত্তবাবু তাঁকে উপেক্ষা করেই কথা বলছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : আপনারা কোথায় যাবেন বললেন?

বললুম : কচ্ছে।

কচ্ছ নামের কোন স্টেশনের নাম তো শুনি নি! সে আবার কোথায়?

বললুম : কচ্ছ তো স্টেশনের নাম নয়, এ একটা রাজ্য—ইংরেজ আমলে দেশীয় রাজ্য ছিল। এর রাজধানী হল ভুজ, শহর গান্ধীধাম, কান্দ্‌লা পোর্ট—

তাই বলুন। এতক্ষণ ইতিহাস ভূগোলের কথা বলছিলেন কিনা—

বলে দত্তবাবু এমন ভাব দেখালেন যেন এ সব জায়গা তাঁর দেখা আছে। তার পরেই বললেনঃ কিন্তু কী দেখবেন সেখানে! তার চেয়ে নেমে পড়ুন আমাদের সঙ্গে। খুব আনন্দ করে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার অনিচ্ছা দেখতে পেলুম। এ নিশ্চয়ই নতুন জায়গা দেখার অনীহা নয়, এ বোধহয় তার সামনে উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার ব্যবহার। স্বাতির সঙ্গে এখনও তিনি একটি কথাও বলেন নি। স্বাতিও তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে। আমি তাই কোন দ্বিধা না করে তৎপর ভাবে বললুমঃ আমরা যে ভুজের টিকিট কেটেছি!

টিকিট কেটেছেন!

টিকিট না কাটলে ট্রেনে উঠব কী করে!

হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু—

কিন্তু কী?

ভদ্রলোক প্রবল বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ পয়সা খরচ করে আপনারা দেশ দেখে বেড়ান?

হেসে বললুমঃ বিনে পয়সায় দেশ দেখব কী করে!

আপনি বুঝি অনেক টাকা রোজগার করেন?

বলে আমার দিকে তাকাতেই আমি হেসে উত্তর দিলুমঃ কলেজে কাজ করে কী পাই বলুন! স্বাতিও কাজ করে বলে কোন রকমে চলে যায়।

দত্তবাবু স্বাতির দিকে চেয়ে দু চোখ বিস্ফারিত করে বললেনঃ আপনি চাকরি করেন?

স্বাতি হেসে বললঃ এ যুগে দুজনে রোজগার না করলে কি চলে!

রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম ?

তাও করি। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি কারও বোঝা হয়ে থাকব !

কথাটা স্বাতি যেন দত্তবাবুর স্ত্রীকে শুনিয়েই বলল। তার পরে সেই ভদ্রমহিলাকেও একবার দেখে নিল আড়চোখে।

ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। মিনিট খানেক দাঁড়াবার পরেই আবার চলতে শুরু করল। এর পরেই বোধহয় ফল্‌না স্টেশনে দাঁড়াবে। দত্তবাবুর স্ত্রী এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন: আপনারা ওদিকে যাচ্ছেন কেন?

প্রশ্নটা স্বাতির দিকে চেয়ে করেছিলেন, তাই উত্তরটা স্বাতি দিল। বলল: বেড়াতে।

শুধু বেড়াতে? আর কোন উদ্দেশ্য নেই?

আছে।

কিন্তু কী উদ্দেশ্য তা বলল না।

দত্তবাবু আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন: কোন আত্মীয়স্বজন বুঝি আছেন?

আমি বললুম: না। স্বাতির শখেই যাচ্ছি। ভারতবর্ষের মরুভূমির উপরে আমাকে একখানা বই লিখতে হবে।

আপনি বই লেখেন?

বলে দত্তবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

হেসে বললুম: আমি পেটের দায়ে লিখতে শুরু করেছিলুম। এখন লিখছি স্বাতির শখে। সে আমাকে অসাধারণ দেখতে চায়।

দত্তবাবু স্বাতির দিকে চাইতেই সে বলল: মানুষের জীবন তো শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটানোর জন্যে নয়। পৃথিবীর মানুষকে কিছু দিয়ে যেতে হবে—যে যা পারে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলে ওকে কিছু আবিষ্কার করতে বলতাম। তা নয় বলে বাঙলা সাহিত্যের মান বাড়াতে বলছি। তার জন্যে ওকে যদি চাকরি ছাড়তে হয় তো আমি সংসার চালাবার সম্পূর্ণ ভার নেব।

আমি হেসে বললুম: লেখাতেও আমাকে সারা দিন সাহায্য করে। ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমি লেখক হতে পারতুম না।

দত্তবাবুর স্ত্রী বললেন: আপনার নিজের শখ সাধ?

স্বাতি হেসে বলল: এতেই তো আমার শখ মিটছে।

আর কোন শখ নেই?

এর উত্তর দিলুম আমি: আমার বইএর জন্যে ছবি তুলে দিচ্ছে, গান বাজনা শোনাচ্ছে উৎসাহ দেবার জন্যে—

আপনি গান বাজনা জানেন?

স্বাতি বলল: ওস্তাদের কাছে সেতার শিখেছি, এখনও শিখি।

বললুম: শিক্ষার শেষ নেই বলেই এখনও শিখছে, তা না হলে ওই-ই এখন অনেককে শেখাতে পারে।

ভদ্রমহিলা বললেন: ঘরের কাজও করেন?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল: সব কাজ।

আব আমি যোগ করলুম: দার্জিলিঙে এক দুর্ঘটনায় আমাব বুকের হাড় ভেঙেছিল। স্বাতি দিল্লী থেকে এসে আমায় সারিয়ে তুলেছে। আবার সংসারও দেখেছে।

দত্তবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: আশ্চর্য!

স্বাতি বলল: আশ্চর্য কিছুই নয়। অসুস্থ অবস্থাতেই ও একখানা বই লিখে ফেলেছিল।

ট্রেন আবার একটা স্টেশনে এসে থামছিল। দত্তবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন: একটু চা খান আপনারা।

কিন্তু স্বাতি বলল: আপনারা খান।

আপনারা?

অসময়ে আমরা কিছু খাই নে।

ফল্‌না স্টেশনে ট্রেন মিনিট চারেক দাঁড়াল। দত্তবাবু বেয়ারা বেয়ারা বলে অনেক হাঁক ডাক করলেন। কিন্তু ভাঁড়ের চা খেলেন

না। ফিরে এসে বললেনঃ আমার বউ ভাঁড়ের চা খেতে পারে না, গা বমি-বমি করে।

বললুম ঃ আবু রোডে ডাইনিং কার থেকে চা পাবেন।

ভদ্রলোক বললেন ঃ আবু রোডেই তো আমরা নামব!

স্বাতি বলল ঃ ফেরার পথে এই স্টেশনেও একবার নামবেন।

এই স্টেশনে!

হ্যাঁ, এই ফল্না স্টেশনে। এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যাবেন রণকপুরে। সেখানে দ্বিতীয় দিলওয়ারা দেখবেন, দেখবেন কুম্ভলগড়। তার পর চলে যাবেন উদয়পুরে। পথে চারভুজা কাঁকরোলি নাথদ্বারা একলিঙ্গজী—এই সব বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখে নেবেন।

দত্তবাবু তাঁর চোখ কপালে তুলে বললেনঃ আপনি বলছেন কী?

স্বাতি বললঃ শুধু অম্বাজীর মন্দির দেখে ফিরে গেলে আপনাদের আফসোস করতে হবে।

দত্তবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কত মাইলের পথ?

বলে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই স্বাতি বললঃ আমি বলছি। ফল্না থেকে রণকপুর কুড়ি মাইল দূরে, আর রণকপুর থেকে উদয়পুর একশো মাইল।

তার পরে বুঝিয়ে বলল ঃ ফল্না থেকে উদয়পুরের পথে সদ্‌রি নামে একটি জায়গা আছে। সেখান থেকে রণকপুর ছ মাইল দূরে। রণকপুরের মন্দির দেখে আবার আপনাকে সদ্‌রি ফিরে আসতে হবে, সদ্‌রি থেকে উদয়পুর। প্রথমে চারভুজাজী, তার পর কাঁকরোলি, সেখান থেকে নাথদ্বারা, তার পর একলিঙ্গজী। এ সমস্তই পথের উপরে পড়বে। আপনারা সব দেখতে দেখতেই উদয়পুরে পৌঁছে যাবেন।

দত্তবাবু বললেন: ট্যাক্সি ভাড়া বোধহয় অনেক লেগে যাবে!

স্বাতি তৎপর ভাবে বলল: বাসে গেলে কষ্ট হবে আপনাদের। বারে বারে নামা ওঠা। বাস বদল। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে—আবার সময়ও লাগবে অনেক। ট্যাক্সিতে গেলে নির্ঝঞ্ঝাট। একটু তাড়াতাড়ি করলে এক দিনেই সব দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কী?

উদয়পুর থেকে ফিরব কী করে?

বলে দত্তবাবু আমাব দিকে তাকালেন। উত্তর স্বাতি দিল। বলল: ট্রেনে। মারবাড়ে ফিরে এসে দিল্লীর ট্রেন ধরুন। কিংবা চিতোরগড় থেকে খাণ্ডোয়ার ট্রেন।

দত্তবাবু দু চোখ বিস্ফাবিত করে বললেন: আপনি তো অনেক কিছু জানেন দেখছি!

স্বাতি বলল: ওর জন্যেই সব জানতে হয়। ওকে সব রকম দায়িত্ব থেকে মুক্তি না দিলে ভালো লেখা লিখবে কী করে! লেখা তো চাকরি নয় যে মন মেজাজের ধার ধারতে হয় না। লেখার জন্ম মনের গভীরে, প্রেরণার হাওয়া লেগে তা বেরিয়ে আসে।

দত্তবাবু মাথা চুলকে বললেন: খুব শক্ত কথা।

স্বাতি বলল: শক্ত মোটেই নয়। মানুষের জন্ম কিছু সৃষ্টির জন্যে, মৌমাছির মতো শুধু মধু আহরণের জন্যে নয়। আর সৃষ্টি মানে সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়।

দত্তবাবু চমকে উঠে বললেন: আমাদের কথা আপনি জানলেন কী করে?

এবারে স্বাতির চমকাবার পালা। কিন্তু কৌশলে সে নিজেকে সামলে নিল। বলল: এ শুধু আপনার আমার কথা নয়, আমি সকলের কথা বলছি।

দত্তবাবু ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন: নানা

জায়গায় গিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। এবারে তাই অম্বাজী যাচ্ছি।

স্বাতি শুনতে পেয়েছিল। বলল: দৈহিক পরিশ্রম করুন। তাহলে আর কোথাও যেতে হবে না। যারা খেটে খায়, তারা কি কোথাও মানত করতে যায়! কষ্টের সংসারেই তাদের সব তীর্থ।

দত্তবাবুর স্ত্রীও বোধহয় সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। এইবারে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। বোধহয় লজ্জা পেয়েছেন তাঁর শরীরের অপ্রয়োজনীয় মেদের জন্যে। আর স্বাতি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে খুশি হয়ে উঠল।

আবু রোডে এই দম্পতি নেমে গেলে আমি বললুম: তোমার যে বয়স বাড়ছে তা বুঝতে পারছি।

কেন বল তো?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল সকৌতুকে।

বললুম: যোধপুরে বালুরামকে অনেক জ্ঞান দিয়েছিলে। এবারে এদেরও দেখলুম অনেক জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলে।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল: ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল। অমন অলস মেয়েমানুষ আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে।

তাতে আমাদের কী বল!

কিন্তু এ কথা মেনে না নিয়ে স্বাতি বলল: ভদ্রলোক তো নাগপুরের টিকিট কালেক্টর। তাই না?

বললুম: হ্যাঁ।

তবে কি অমন অলস হওয়া ওঁর সাজে! স্বামীর রোজগার তো সামান্য!

হেসে বললুম: অনেক উপ্‌রি আছে বলেছিলেন।

স্বাতি বলল: সেই জন্যেই তো ওঁদের পয়সায় চা খাবার

প্রবৃত্তি হয় নি! কিন্তু থাক সে কথা। আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

কী কথা ?

এ অঞ্চলের অনেক জায়গা তো আমাদেরও দেখা হয় নি। উদয়পুর দেখে আমরা ট্রেনে চলে এসেছিলাম আবু রোডে। আর আবু রোড থেকে আবু পাহাড় দেখেই দ্বারকার পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম। একলিঙ্গজী নাথদ্বারা কাঁকরোলি চারভুজা রণকপুর—এ সব তো আমাদের দেখা হয় নি। আবু রোডের কাছে অম্বাজী কোটেশ্বর কুম্ভারিয়া—এ সবও দেখা হয় নি আমাদের।

আমি বললুম: এ দেশের সব জায়গা কি আমাদেব দেখা হয়েছে! এই বিরাট দেশেব সব কিছু দেখেছি, কেউ কি এ অহঙ্কার করতে পারে!

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: ফেরাব পথে এ সব দেখে গেলে কেমন হয় ?

শখ থাকলে দেখতেই হবে। একবারে দেখা না হলে বারে বারে আসতে হবে। এও তো এক রকমের নেশা।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না।

২৮

আমরা পালনপুরে পৌছলুম বিকেল পাঁচটার কিছু পরে। আর রাত সাড়ে বারোটায় আসবে ভুজের ট্রেন। এই সময়টা আমাদের স্টেশনেই কাটাতে হবে। ট্রেন থেকে নেমে আমরা ওয়েটিং রুমে চলে এলুম। তার পরে স্টেশনে আমিষ ও নিরামিষ দু রকমেরই রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে দেখে খুশি হয়ে উঠলুম। স্বাতি বলল: চা খেয়ে তুমি বাইরেটা দেখে এসো। মালপত্র আমি পাহারা দেব।

বাইরেটা দেখে আসা মানে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করা। নিতান্ত অজ্ঞ অবস্থায় আমরা দেশ দেখতে বেরোই। দু-একটি তীর্থস্থান ও বড় শহরের নাম ছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না। ভাবি, সে সব জায়গায় পৌছে খোঁজখবর নিয়ে দর্শনীয় সব কিছুই দেখে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা বারে বারে না বেরোলে বোঝা যায় না। প্রতিবারেই নতুন নতুন জায়গার নাম শোনা যায়।

চা খেতে খেতে স্বাতি বলল: কী ভাবছ বল তো?

বললুম: নিজেদের অজ্ঞতার জন্যে লজ্জা হচ্ছে।

কী রকম?

এই তো কিছু দিন আগে আমরা আবু পাহাড় দেখে দ্বারকায় চলে গেলুম। অথচ অন্য দিকে যে অম্বাজী কোটেশ্বর কুম্ভারিয়া আছে, সে কথা জানতেও পারি নি। তার চেয়েও দুঃখের কথা যে রণকপুরের মন্দিরের কথা জানা থাকলে আমরা উদয়পুর থেকে ট্রেনে আবু রোডে আসতুম না। একলিঙ্গজী, নাথদ্বারা কাঁকরোলি চারভুজাজী ও রণকপুরের মন্দির দেখে ফল্‌নায় এসে ট্রেন ধরতে পারতুম।

স্বাতি বলল : বাবাও খুশি হতেন খুব। কিন্তু মা রাজী হতেন না।

কেন ?

এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আবু পাহাড়েই তো সেবারে আমাদের প্রধান কাজ ছিল!

সত্যিই তো, রাণা এলে আমাদের জীবনটাই অন্য রকম হত।

স্বাতি বলল : সেই আশঙ্কাতেই তো তুমি চোখ বন্ধ করে বসেছিলে! তা না হলে এ সব জায়গার পরিচয় তোমার অজ্ঞাত থাকত না।

বললুম : সাধারণ যাত্রীদের কথা ভাব। বাঙলা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে তো সামান্যই জানা যায়, আমাদের টুরিস্ট লিটারেচারও অসম্পূর্ণ। সব দেখে শুনে মনে হয় যে বিদেশীদের জন্যেই সেসব কিছু লেখা হয়। দেশের লোক কিছু দেখুক বা জানুক, সে উদ্দেশ্য সরকারের নেই।

স্বাতি বলল : এই জন্যেই তো তোমাকে বাইরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে বলছি।

তা বুঝেছি বলেই দুঃখ হচ্ছে। দেশ দেখার ব্যাপারে কত অসহায় আমরা। নিজেদের অজ্ঞতার জন্যে কত সুন্দর জায়গা আর দর্শনীয় স্থান আমাদের অদেখা থেকে যায়।

চা শেষ করে স্বাতিকে ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দিয়ে আমি স্টেশনের বাইরে এলুম।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম যে কিছু দোকানপাট আছে, লোকজনও আছে। দূরের কোন জায়গায় যাবার জন্যে বাসও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে কোন দূরের জায়গায় যাবার আগ্রহই আমার ছিল না। আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম যে ভারত স্বাধীন হবার আগে পালনপুর একটি দেশীয় রাজ্য ছিল

—মুসলমান রাজ্য। তার প্রধান শহর ছিল এই পালনপুর। এ জায়গা এখন ফলের জন্য বিখ্যাত। শহরে কয়েকটি সুগন্ধি দ্রব্যের কারখানাও আছে। আর মাইলখানেক দূরে আছে বলরাম নামে একটি পিকনিকের জায়গা।

পালনপুর একটি জংশন স্টেশন। এখান থেকে ডিমা পর্যন্ত রেললাইন ছিল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ডিমায় একটি মিলিটারী ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল। কিছুদিন আগে এই লাইন গান্ধীধাম পর্যন্ত বাঁড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরব সাগরের তীরে কান্দ্‌লা বন্দর গড়ে উঠবার পরে কান্দ্‌লার সঙ্গে গান্ধীধামও যুক্ত হয়েছে। গান্ধীধাম থেকে কচ্ছের প্রধান শহর ভুজ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে। এ সমস্তই মিটার গেজের ট্রেন।

সম্প্রতি ভিরমগাম থেকে ব্রড গেজ লাইন এসেছে গান্ধীধামে। করাচী বন্দর পাকিস্তানে যাবার পরে এই অঞ্চলে একটি বিকল্প বন্দর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সৌরাষ্ট্রের ওখা বন্দরে সুবিধা হচ্ছিল না। কান্দ্‌লার জন্যেই বড় লাইনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই লাইনে দ্রুত মাল চলাচল সম্ভব।

যে ভদ্রলোক আমাকে এই সব খবর দিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: গান্ধীধাম থেকে আপনারা দ্বারকা বা সোমনাথে যাবেন তো? তাহলে এ পথে আর ফিরবেন না।

কেন?

অত ঘুরে যাবেন কেন? রাত দশটায় গান্ধীধামে সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেসে চাপলে ভোর সাড়ে চারটের সময় ভিরমগামে পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে যে দিকে খুশি যান। তবে—

তবে কী?

ভদ্রলোক বললেন: বঙ্গ উপসাগরের উপর দিয়ে পথ তো। সেবারে লাইন ভেসে গিয়েছিল। তাই সবাইকে এই পথেই ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু পালনপুরে আর নামবার দরকার হবে না।

কেন ?

ভুজ থেকে যে ট্রেন বিকেল চারটেয় গান্ধীধামে আসে, সেই ট্রেন সোজা আমেদাবাদ চলে যাবে। ভোর বেলাতেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।

এই ভদ্রলোকের কাছে আরও কিছু সংবাদ পেলুম। তিনি বললেন : আপনাদের মতো টুরিস্টরা সোজা চলে যান আমেদাবাদে, কিন্তু মাঝখানের কয়েকটা জায়গার কথা জানেনই না।

মাঝখানেও কিছু দেখবার আছে নাকি ?

কেন, সিধপুর ?

বলে এই জায়গাটির পরিচয় আমাকে সংক্ষেপে দিলেন। পালনপুর থেকে উনিশ মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে একটি প্রাচীন শহর। ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের অস্তিত্ব ছিল। ১২৯৭ সালে আলাউদ্দীন খিলজী এই শহর ধ্বংস করেন। তবু এখনও সেখানে অনেক কিছু দেখবার আছে—রুদ্রামন বিন্দু সরোবর ও গুজরাতী শৈলীর আকর্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পাথরগুলি যেমন বড় বড়, কারুকার্যও তেমনি সুন্দর। ছোট ছোট মন্দিরের একটি সারিকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। এই শহরে এখন আধুনিক মন্দির অগণিত। বিহারের গয়া যেমন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য বিখ্যাত, সিধপুরও তেমনি পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্যে তীর্থে পরিণত হয়েছে।

আরও একটি কথা জানতে পারলুম। একদা এই অঞ্চল ছিল বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত। পশ্চিম ভারতের এই অঞ্চলেই শুধু আফিমের চাষ হয়।

তার পর ?

আট মাইল দূরে উন্‌ঝা নামের একটি স্টেশনও আপনাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে।

কেন ?

কদোয়া কন্‌বি নামে একজাতীয় কৃষিজীবীর বাস এখানে। ভারি অদ্ভুত তাদের বিবাহ ব্যবস্থা। এগারো বছর পর পর তাদের বিবাহের লগ্ন আসে। তখন চল্লিশ দিনের বেশি বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। বর খুঁজে না পেলে একটা প্রতীক বরের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। আর বিয়ের পরেই মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে মনে কবা হবে। তাব পবে সত্যিকার বর খুঁজে পেলে তার সঙ্গে হবে দ্বিতীয় বিয়ে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এখনও এই সব ব্যাপাব আছে?

ভদ্রলো'ক বললেন: আরও কোথায় কী আছে, তা আমরা জানি না। যা জানি তাও টুরিস্টদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে না।

যেমন?

ভাদনগরের নাম শুনেছেন?

বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: মেহসানা থেকে আপনারা সোজা দ্বারকার পথ ধবেন। অথচ মেহসানা থেকে যে আরও দুটো ব্রাঞ্চ লাইন বেরিয়েছে তাব খববও রাখেন না। পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তরঙ্গা হিলের দিকে যে লাইন গেছে, তারই ওপবে ভাদনগর মেহসানা থেকে একুশ মাইল দূরে। এখানেই ছিল পুরাকালের আনন্দপুর। ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার এক রাজপুত্র এই জায়গাটি অধিকার করেন। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে কীর্তিস্তম্ভ নামের একটি সুন্দর তোরণ আর হাটকেশ্বব মহাদেবের মন্দির। এই জায়গা এখন নাগর ব্রাহ্মণদের ঘাঁটি। গুজরাত ও কাথিবাড়ে এদের প্রতিপত্তির কথা বোধহয় জানেন না?

বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: গেলেই দেখতে পাবেন। অতীতে খিলোন ব্রাহ্মণ নামে একদল ডাকাতের আশ্রয়স্থল ছিল এই জায়গা।

একটু থেমে বললেন: পাটনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? তন্‌হিলবাড়া পাটন?

বললুম: শুধু নামই জানি।

ভদ্রলোক বললেন: অন্য ব্রাঞ্চ লাইনের উপরে মেহসানা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে এই প্রাচীন শহর। ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল। ১০২৪ সালে সোমনাথ আক্রমণ করতে যাবার পথে গজনীর মামুদ এই নগর অধিকার করেছিলেন। প্রায় একশো বছর পরে এই নগরটি পুনরুদ্ধার করেছিলেন আলাউদ্দিন খিলজীর এক ভাই।

জিজ্ঞাসা করলুম: এখনও কিছু দেখবার আছে নাকি?

ভদ্রলোক বললেন: সবই তো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আজ শুধু একশো আটটি জৈন মন্দির আছে, আর আছে জৈন পাণ্ডুলিপির একটি লাইব্রেরি।

ভদ্রলোক বোধহয় বাসের শব্দ পেয়েছিলেন। তাই বললেন: মাপ করবেন, এইবারে আমাকে পালাতে হবে।

বলে আর দেরি না করে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে মিশে গেলেন।

আমি আরও কিছুক্ষণ এধারে ওধারে ঘুরে ফিরে স্টেশনের ভিতরে ফিরে এলুম। যতটুকু খবর পেয়েছিলুম তা বললুম স্বাতিকে। সব শুনে স্বাতি বলল: সত্যিই, কিছু একটা করা দরকার।

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। তাই দেখে স্বাতি হেসে বলল: ভয় পেও না, আমি ওসব জায়গায় যেতে চাইব না।

তবে?

স্বাতি বলল: এ সব জায়গার কথা সবাই জানতে পারে, এমন কিছু করা দরকার।

তার মানে, এমন একখানা গাইড বই লিখতে হবে যাতে কোন জায়গার কথাই বাদ পড়বে না।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : তা কি সম্ভব নয় ?

অসম্ভব কিছুই নয়, শুধু নিষ্ঠার দরকার।

রাতের আহার সেরে ওয়েটিং রুমেই আমরা খানিকটা বিশ্রামের চেষ্টা করলুম। স্বাতি বলল : এখন আর গল্প নয়, কাল ভোর থেকেই আমরা অনেক গল্প করবার সময় পাব।

আমি বললুম : ভোর থেকে কেন ?

স্বাতি বলল : কচ্ছের রণ দেখবে না ! ভোর বেলায় এই রণ পেরিয়েই .তা আমরা গান্ধীধামে পৌঁছব।

বললুম : কখন পেরোব তা জেনে নেওয়া হয় নি।

তার বোধহয় দরকার হবে না।

কেন ?

স্বাতি বলল : ঘুমোবার সুবিধে পেলে নিশ্চয়ই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। জেগে উঠে যদি কিছু দেখতে পাই তো তা সৌভাগ্য বলে মনে করব।

রাত সাড়ে বারোটার আগেই আমাদের ট্রেন এল। ভিড় বেশি ছিল না। অনায়াসেই উঠে পড়লুম। শোবার জায়গাও পেলুম একটুখানি। খানিকটা উদ্বেগে ক্লান্ত হয়েছিল মন। রাত একটা দশ মিনিটে ট্রেন ছাড়বার পরে ঘুমিয়ে পড়লুম নিশ্চিন্ত মনে। এখন আমরা গুজরাতের উপর দিয়ে চলেছি। ভোর বেলায় জেগে দেখব, এই রাজ্যেরই কচ্ছ এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছি গান্ধীধামের দিকে।

২৮

ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। স্বাতি আমাকে চোখ মেলতে দেখে বলল: এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না তো, আর একটু ঘুমিয়ে নেবে?

বললুম: ঘুম যখন আপনা থেকে ভেঙেছে, তখন আর ঘুমোবার প্রয়োজন নেই।

স্বাতি বলল: ঘুমের নিয়মই এই—দেরিতে শুলেই আগে ঘুম ভাঙে, আর ঘুমের প্রতি নিষ্ঠুর হলেই ঘুম সদয় হয়।

আমরা দুজনে জানলার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। বাহিরে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থাকবার পর স্বাতি বলল: কচ্ছের রণ জিনিসটা কী, তা জানবার আমার অনেক দিনের কৌতূহল। ভূগোল পড়ে তোমার কোন ধারণা হয়েছে কি?

বললুম: ভূগোল পড়ে শুধু এইটুকুই ধারণা হয়েছিল যে কচ্ছে একটি নয়, দুটি রণ আছে—বড় আর ছোট। বড় রণ উত্তরে কচ্ছ উপদ্বীপ ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মাঝখানে, আর ছোট রণ দক্ষিণে গুজরাত রাজ্যে বেষ্টিত। আরও একটি কথা ভূগোলে পড়েছিলুম। লুনি নদী পড়েছে বড় রণে, আর ছোট রণে সরস্বতী।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: তুমি তো বলেছিলে সরস্বতী সোমনাথে সমুদ্রে পড়েছে!

হেসে বললুম: ভারতবর্ষে এত সরস্বতী আছে যে কোন্ সরস্বতী কোথায় জন্ম নিয়ে কোথায় পড়েছে তার হিসেব রাখতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

স্বাতি বলল : নদী যখন রণে পড়েছে, তার মানে রণ হল জলাভূমি। তাই না?

বললুম : একখানা ইংরেজী বইএ পড়েছিলুম যে ১৮১৯ সালের ভূমিকম্পে এই অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। আগে মাটি ছিল, এখন কচ্ছ উপসাগরের জল আসে এই জলাভূমিতে।

তার মানে ভূকম্পনের ফলে জমি নিচু হয়ে গেছে, এই তো!

আর এক জায়গায় আমি অন্য কথা পড়েছি। এক সময়ে এই জলাভূমি কচ্ছ উপসাগরেরই অংশ ছিল। নদীর পলিমাটিতে এর গভীরতা কমে আসছিল, ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রতল উঁচু হয়ে উঠে এই জলাভূমির সৃষ্টি করেছে।

স্বাতি হেসে বলল : তার মানে ঠিক উল্টো মত।

বললুম : সবই অনুমানের ব্যাপার। এ জায়গায় জল ছিল না মাটি ছিল, তা কারও জানা নেই। মাটি থেকে থাকলে নিচু হয়ে গেছে ; আর জল থেকে থাকলে নিচের মাটি উঁচু হয়ে উঠেছে। তার কারণ ভূমিকম্প। অথচ এ সবের চেয়ে একটা সহজ কথা কেউই বলেন নি।

কী কথা?

কচ্ছ উপসাগরের অগভীর অংশ নদীর পলিমাটি আর আরব সাগরের বালিতে ধীরে ধীরে আরও অগভীর হয়েছে। গ্রীষ্মে তাই একটা বিস্তীর্ণ এলাকা এখন শুকিয়ে যায়। আর বর্ষায় নদীর জল ও সমুদ্রের জোয়ারে মিলে যে জলাভূমির সৃষ্টি হয়, তাকেই আমরা রণ বলি।

স্বাতি বলল : এ মত কি তোমার নিজের?

বললুম : মত নয়, এও একটা অনুমানের কথা।

আমাদের ট্রেন অনেকক্ষণ পরে একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। ছোট স্টেশন, খুবই অল্প সময় দাঁড়াল। তার পরে আবার চলতে লাগল। কখন এই ট্রেন রণ পেরোবে জানি না। ট্রেন থেকে কিছু

দেখা যাবে কিনা তাও জানি না। গাড়িতে যে সব যাত্রী দেখতে পাচ্ছি, তারা আমাদের ভাষা বুঝবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু একজনের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলুম।

স্বাতি বেশ কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দুঃখিত হল। বলল: নিজেদেরই চোখ মেলে চলতে হবে।

বললুম: চোখ মেলে চললেও সব কথা জানা যায় না। যেমন, এই রণের পরিমাণ হল ন হাজার বর্গ মাইল। বর্ষায় এই সমগ্র অঞ্চল জলে প্লাবিত হবার পরেও দ্বীপের মতো কয়েকটি টিলা জলের উপরে জেগে থাকে। এরই উপরে কিছু ঝোপ ঝাড় জন্মায়। গ্রীষ্মের সময়ে রণ শুকিয়ে যায়—থাকে শুধু শুকনো কাদা আর বালি। সমুদ্রেব জলে লবণাক্ত হয়ে যায় বলে কোন গাছপালা বাঁচে না। রোদে পুড়ে মাটি চৌচিব হয়ে যায়।

স্বাতি বলল: এও কি তোমার অনুমানের কথা নাকি?

হেসে বললুম: কবি নই তো, তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুমান করতে পারি নে। এ আমার পড়া কথা।

তাহলে আরও কিছু বল।

আর একটা গোলমেলে কথা মনে পড়ছে। ১৮১৯ সালের ভূমিকম্পে নাকি এই অঞ্চলেরই প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা জমি দশ থেকে আঠারো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছিল।

স্বাতি বলল: সে তো একটা পাহাড়ের মতো ব্যাপার।

বললুম: পাহাড় নয়, উঁচু দেওয়াল বলতে পার। কিন্তু সে কোথায় তা বলতে পারব না।

বুনো গাধা আর ফ্লেমিঙ্গো পাখির কথাও বললুম স্বাতিকে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: বুনো গাধা!

বললুম: ধরে পোষ মানাতে পারলেই বোধহয় পোষা গাধা হয়ে যায়। তাইতেই একে সম্পদ বলেছে।

স্বাতি আর কোন প্রশ্ন করল না দেখে হেসে বললুম: ফ্লেমিঙ্গো পাখির কথা জিজ্ঞেস না করে বাঁচিয়েছ।

স্বাতি হেসে বলল: ও পাখির সম্বন্ধে কিছু জানো না বুঝি?

জানলে নিজে থেকেই বলতুম।

তবে এবারে ইতিহাসের কথা বল। তার আগে পুরাণের কথা।

বললুম: যত দূর মনে পড়ে মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে কচ্ছ নামের উল্লেখমাত্র আছে। কিন্তু রামায়ণে বা কোন পুরাণে এ নামের উল্লেখও দেখি নি।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: কচ্ছ শব্দের কি কোন মানে আছে?

মানে একটা পাওয়া যায়। কেন জনেন ছগোতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা। জলের নিকটবর্তী স্থান, নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ, জলময় দেশ। এ ছাড়াও আরও অনেক মানে আছে।

যেমন?

ধুতির কাছাকেও তো কচ্ছ বলে—মুক্তকচ্ছ। তুঁত গাছকেও কচ্ছ বলে, ঝিঁঝি পোকাকেও বলে কচ্ছ। আরও মানে জানতে হলে অভিধান খুলতে হবে।

স্বাতি বলল: তাহলে ইতিহাসের কথাই বল।

বললুম: কচ্ছ দাক্ষিণাত্যের একটি জনপদ বলে অনেকের ধারণা ছিল, আবার অনেকে এ দেশ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বলেই মনে করতেন। হিউএন চাঙ এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন যে কচ্ছ তখন মালব রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে অনেক ধনবান লোকের বাস ছিল। তিনি এই জনপদের নাম কচ্ছ লেখেন নি। লিখেছেন ও-তিয়েন-পো-চি-লো, আর রাজধানীর নাম লিখেছেন কিয়ে-শি-শী-ফা-লো।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এ নাম যে কচ্ছের তা বোঝা গেল কী করে?

হেসে বললুম ঃ পণ্ডিতরা মাথা খাটিয়ে বার করেছেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললুম ঃ হিউএন চাঙের ও-তিয়েন-পো-চি-লো থেকে জুলিয়েঁন সাহেব বললেন অধ্যাভকিলা বা আত্যানভকেলা, আর কানিংহাম সাহেব বললেন ঔদম্বতীর বা ঔদম্বর। লাসেন সাহেব প্রমাণ করলেন যে কচ্ছে তখন ঔদম্বর নামের এক জাতির বাস ছিল বলেই দেশের এই সব নাম হয়েছিল।

স্বাতি বলল ঃ রাজধানীর নামটা ওরকম হল কী করে?

বললুম ঃ সাহেবরা তারও একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। জুলিয়েন সাহেব বললেন, খানীশ্বর থেকে হিউএন চাঙ কিয়ে-শি-শী-ফা-লো নাম করেছিলেন, আর লাসেন সাহেব বললেন কচ্ছেশ্বর থেকে এই নাম হয়েছে। কানিংহাম সাহেব বলেছেন কচ্ছেশ্বর নয়, কোটীশ্বর। দেখা গেল যে কচ্ছের উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূলে আছে কোটীশ্বর তীর্থ। এখানে যে শিবমন্দির আছে, তাতে কোটি শিবলিঙ্গ আছে বলে এই তীর্থের কোটীশ্বর নাম হয়েছিল।

স্বাতি বলল ঃ মনে হচ্ছে, গায়ের জোরে এ সব কচ্ছের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।

আমি বললুম ঃ দেশের বর্ণনা শুনে কিন্তু মনে হবে যে হিউএন চাঙ নাম যাই বলুন, তিনি সত্যিই কচ্ছে এসেছিলেন। এ জায়গাকে তিনি নিম্ন ও আর্দ্র দেশ বলেছেন। জলকর্দমময় লবণাক্ত দেশ বলেই নাম হয়েছে কচ্ছ। দেশের অর্ধেক জলাভূমি ও লবণময় মরুভূমি। এই জনপদ তখন মালব রাজ্যের অধিকারে ছিল।

স্বাতি বলল ঃ মালব তো মধ্যভারতে!

বললুম ঃ গুজরাতের ওপরে মালব অধিকার বিস্তার করেছে, এ কথা আমরা ইতিহাসে পাই। আর কচ্ছ তো গুজরাতেরই অংশ। কাজেই হিউ এন চাঙ যা বলেছেন তা সত্য হওয়াই সম্ভব।

এবারে আমাদের ট্রেন যে স্টেশনে দাঁড়াল, তার নাম দেখলুম

সান্তালপুর। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু সূর্যোদয় হতে এখনও অনেক দেরি আছে মনে হল।

ট্রেন যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আমরা যাত্রীদের ওঠানামা দেখছিলুম। ট্রেন ছাড়বার পরে স্বাতি বলল : তার পর ?

বললুম : তার পর খুব বেশি কথা জানি না। কচ্ছের প্রাচীন রাজবংশ শর্মা বা জাড়েজা নামে পরিচিত। তাঁরা কৃষ্ণের বংশধর বলে দাবী করতেন।

প্রমাণ ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : প্রমাণ আছে। নরকাসুর ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র। তাঁর পুত্র বাণাসুর ছিলেন শোণিতপুরের রাজা, আব এঁবই বংশধর নাকি মিশরে রাজত্ব করতেন।

মিশরে !

হ্যাঁ, ইজিপ্টে। কী ভাবে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন তা জানা নেই। তবে জাম নরপৎ নামে এক রাজপুত্র তাঁর তিন ভাইকে নিয়ে এ দেশে পালিয়ে আসেন।

স্বাতি বলল : পালিয়ে আসেন কেন ?

বললুম : এঁদের বংশাবলীতে তা লেখা নেই। তবে জানা যায় যে সৌরাষ্ট্রে এসে অশ্বপতি বা অশপৎ নামে এক ভাই মুসলমান হয়েছিলেন, আর গজপতি বা গজপৎ সৌরাষ্ট্রেই থেকে যান। নরপতি বা নরপৎ ফিরোজ শাহকে বধ করে কাম্বে অধিকার করেছিলেন। তাঁর পুত্র শর্মাই কচ্ছের শর্মাদের আদি পুরুষ।

স্বাতি বলল : শর্মা তো ব্রাহ্মণদের পদবী !

না না, সে শর্মা নয়। তাই কোথাও কোথাও এদের শম্মা বলা হয়েছে।

তার পর ?

বললুম : কচ্ছে এক সময়ে কাঠি ও আহীরদের প্রাধান্য ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে কাঠিরা শক বা ভিৎ জাতির শাখা। আর আহীর আমরা গোয়ালার জাত বলে জানি। আসলে কাঠিদের আধিপত্য ছিল কাথিয়াবাড়ে, কিন্তু কচ্ছের দক্ষিণ ভাগও তাদের দখলে ছিল। শম্মারা প্রবল হয়ে কাঠিদের দমন করে। এই বংশেরই জাম অবড় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কচ্ছ থেকে কাঠিদের তাড়িয়ে দেয়।

স্বাতি জানলার বাহিরে তাকিয়ে আমার ইতিহাসের গল্প শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল ঃ এইবারে এই দিকে একটু মনোযোগ দাও তো!

আমি চেয়ে দেখলুম যে বাইরে আলো ফুটে উঠেছে এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারি দিক। কখন এক সময়ে আমরা পথের ধারে রণ দেখতে পাব বলে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সহসা মনে হল যে আমরা একটা নদীর পুল পার হচ্ছি। না, নদীর পুলের মতো একটুও নয়। দৈত্যের মতো লোহার খাঁচা নেই, কোন শব্দ হচ্ছে না লোহার উপর দিয়ে ট্রেন যাবার। মনে হচ্ছে, জলের উপর দিয়েই ট্রেন চলে যাচ্ছে। নদীর স্রোত দেখতে পাচ্ছি নে, সমুদ্রের ঢেউও নয়। রেল লাইনের পাশে স্থির জল দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর বিস্তৃত। অন্য ধারেও জল। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে আমরা সেই জলাভূমি পার হচ্ছি। রেলের লাইন পাতা হয়েছে উঁচু বাঁধ দিয়ে। কিন্তু খুব প্রশস্ত নয়, একটা বড় নদীর মতো দীর্ঘ। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা এই জলাভূমি পেরিয়ে শক্ত মাটিতে পৌঁছে গেলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ এই বোধ হয় ছোট রণ।

এত ছোট!

মনে হয় এই জায়গাটা সংকীর্ণ বলেই রেল লাইন পাতা হয়েছে এইখানে। দুধারে প্রশস্ত জলাভূমি আছে।

স্বাতি কিছু হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। বললুম ঃ এখন বড়

লাইনের ট্রেনও রণ পার হচ্ছে। কিন্তু সে অন্য জায়গায়, অনেকটা দক্ষিণের দিকে।

স্বাতি বলল: এই রেল লাইন যখন ছিল না, তখন লোকে যাতায়াত করত কেমন করে?

নিশ্চয়ই সমুদ্র পেরোতে হত। সমুদ্র, কিংবা রণ। ওয়াঙ্কানের থেকে মরবির উপর দিয়ে নবলখি পর্যন্ত রেল লাইন আছে। সৌরাষ্ট্রের রেল লাইন। রেলের ম্যাপে দেখেছি যে এর ওপারেই গান্ধীধাম আর কান্দ্‌লা বন্দর।

আমাদের এই ট্রেন অনেক ছোট ছোট স্টেশনে দাঁড়ায় না। এটা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আর একটা ট্রেন সব স্টেশনেই দাঁড়ায়। সেটা গান্ধীধাম থেকে পালনপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে। আমেদাবাদ পর্যন্ত যায় না। আমরা সকাল সাড়ে নটায় পরে গান্ধীধামে পৌঁছব। তার আগে কোথাও চা পাওয়া যায় কিনা ভাবছিলুম।

ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। স্বাতি প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল: ওটা চায়ের দোকান নয়!

চা!

বলে আমি লাফিয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি নেমে গেলুম নিচে। একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলুম যে সেটা সত্যিই চায়ের স্টল। অনেকেই আমার মতো লাফিয়ে নেমেছে। সেখান থেকে দু ভাঁড় চা সংগ্রহ করে আনতে আমার বেশি সময় লাগল না।

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল স্বাতি। আমার হাত থেকে একটা ভাঁড় নিয়ে বলল: খালি পেটে শুধু চা খেও না। আমার কাছে বিস্কুট আছে।

বলে আমাকে ভেতরে ডেকে আনল।

আমরা এখন কচ্ছে পৌঁছে গেছি। এক দিনে আমাদের সব কিছু দেখে নিতে হবে। কাল আমাদের সময় কম। মিত্রার ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাবে সহজে, কিন্তু চাওলার দিদিকে কি আমরা খুঁজে পাব?

৩০

চা খেয়ে স্বাতি মুখ হাত ধুতে গেল। আর আমি ডুবে গেলুম আমার পুরনো ভাবনায়। মিত্রার ভাই রাণা এখানে পদস্থ অফিসার। তাকে খুঁজে বার করা শক্ত কাজ হবে না। আর আমাদের দেখে সে বোধহয় খুশিই হবে। তার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। তার বোন মিত্রাকে নিয়ে সে এসেছিল স্বাতিদের বাড়িতে। স্বেচ্ছায় আসে নি, এসেছিল তার পিতার আদেশে। আর স্বাতির জন্যেও আসে নি, এসেছিল আমারই জন্যে। এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্কর-বাবুর উত্তরাধিকারী হব, এই সংবাদ পেয়েছিলেন তাদের পিতা ব্যানার্জি সাহেব। তাঁর অগাধ সম্পত্তি। সেই সম্পত্তির লোভে ব্যানার্জি সাহেব আমাকে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁর কন্যা মিত্রার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে। কিন্তু স্বাতিকে দেখে রাণার ভাল লেগে গিয়েছিল। আর স্বাতির মায়েরও ভাল লেগেছিল রাণাকে। রাণা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল স্বাতির সঙ্গে। সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে রাজস্থান ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত। বলেছিল, আবু পাহাড়ে এসে মিলিত হবে। কিন্তু তা পারে নি। আমরা ভেবেছিলুম যে সে তার পিতার অনুমতি পায় নি, আর ভাল ছেলের মতো রাণা তা মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভাল ছেলে হয়ে থাকতে পারে নি। পিতাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে বিয়ে করেছিল তার অফিসের একজন স্টেনোগ্রাফারকে। অজ্ঞাতকুলশীল এই মেয়েকে বিয়ে করে তাকে আলাদা হয়ে যেতে হয়েছিল। তার পরে বদলি নিয়ে দিল্লীর বাইরে চলে গিয়েছিল। কেন রাণা তার পিতার অবাধ্য হল সেই কথাটি জানবার কৌতূহল আমার অনেক দিনের। স্বাতির জন্যে তো সে অবাধ্য হয় নি!

স্বাতি এই সময়েই ফিরে এল। আমার দিকে চেয়ে বলল: একা হলেই তুমি ভাবতে শুরু কর দেখছি।

আমি সচকিত হয়ে বললুম: কে বলল আমি ভাবছি।

তোমার শূন্যদৃষ্টি।

দেখছিলুম।

স্বাতি হেসে বলল: কিন্তু সামনের দিকে তো দেখছিলে না, দেখছিলে পেছনের দিকে—ভবিষ্যৎ নয়, অতীতকে।

এবারে মেনে নিয়ে বললুম: রাণার সঙ্গে দেখা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

কী কথা?

বললুম: তোমার জন্যে সে আবু রোডে আসতে সাহস পায় নি, অথচ একটা স্টেনো মেয়েকে বিয়ে করতে সে একটুও ভয় পেল না!

স্বাতি হেসে বলল: এরই নাম প্রেম।

স্বাতির বেলায় এ প্রেম তার কোথায় ছিল?

শুকিয়ে গিয়েছিল আর এক প্রেমিকের ভয়ে।

তার পরেই বলল: তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসো।

বলে সব সরঞ্জাম আমার হাতে গছিয়ে দিল।

বাথরুম থেকে এসে স্বাতির কাছে জানলুম যে ট্রেন একটা জংশন স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। তার নাম সামাখিয়ালি। স্বাতি বলল: এই জংশন থেকে ট্রেন কোথায় যায় বুঝতে পারছি না। সঙ্গে একটা টাইম টেবল থাকলে ভাল হত।

বললুম: ছোট টাইম টেবলে তো আজকাল কাজ চলে না, বড় টাইম টেবলের ওজন দেখেই ভয় করে।

এই সামাখিয়ালি জংশনের কথা পরে আমরা জেনে নিয়েছিলুম। গান্ধীধাম থেকে ছোট ও বড় লাইনের ট্রেন এই পর্যন্ত এক সঙ্গে আসে। তেত্রিশ মাইলের মতো পথ। তার পর বড় লাইনের

ট্রেন অন্য পথে সৌরাষ্ট্রের ভিরমগম জংশনে চলে যায় পশ্চিমের রণ পেরিয়ে। এ লাইনও নতুন হয়েছে, পথ নাকি মাঝে মাঝেই ভেঙে যায়। সেবারে বন্যার সময়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে শুনলুম।

এ খবর পেয়ে স্বাতি বলল: এ বেশ ভাল হল।

জিজ্ঞাসা করলুম: কেন বল তো?

স্বাতি বলল: আগে অনেক ঘুরপাক খেতে হত। উদয়পুর থেকে ঘুরে আসতে হত আবু রোড। তার পরে হয় কচ্ছে যাও, নয় সৌরাষ্ট্রে। কচ্ছে গেলে অনেকটা পথ ঘুরে এসো সৌরাষ্ট্রে।

এখন কী করবে?

উদয়পুর থেকে সোজা চলে আসব আমেদাবাদে, আবার সৌরাষ্ট্র দেখে গান্ধীধামে চলে আসব ভিরমগম থেকে। ফেরার পথে আবু।

ফল্না থেকে রণকপুর।

আর মারবাড় থেকে যোধপুর জয়সলমের বিকানের হয়ে দিল্লী। এক যাত্রায় পুরো রাজস্থান আর সৌরাষ্ট্র দেখা হয়ে যাবে।

আমরা গান্ধীধামে পৌঁছলুম সকাল সাড়ে নটার পরেই। ট্রেন এখানে আধঘণ্টা দাঁড়ায়। খবর নিয়ে জানলুম যে এখানে রিটায়ারিং রুম আছে। স্বাতি বলল: এসো না, মালপত্র এখানেই জমা করে যাই। রাতে ফিরতে দেরি হলেও আশ্রয়ের অভাব হবে না।

স্বাতির কথা আমি মেনে নিলুম। বললুম: পরামর্শটা ভাল।

বলেই একটা কুলি ডেকে মালপত্র রিটায়ারিং রুমে জমা করে এলুম। ফিরে এসে দেখলুম যে স্বাতি আমার অপেক্ষা করছে ব্রেকফাস্ট নিয়ে। স্টেশনে আমিষ ভোজনালয় আছে। বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে স্বাতি খাবার আনিয়ে নিয়েছে। ক্ষিধেও পেয়েছিল।

তাই পরম উৎসাহে দুজনে খেয়ে নিলুম। বেয়ারা পয়সার সঙ্গে তার ট্রে নিয়ে চলে গেল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: রিটায়ারিং রুম কেমন দেখলে?

সংক্ষেপে বললুম: মন্দ নয়।

মন্দ নয় কেন বলছ?

নতুন স্টেশন বলেই চলনসই মনে হল।

এই ট্রেনই কচ্ছের প্রধান শহর ভুজ পর্যন্ত যাবে। দশটার মিনিট পাঁচেক আগেই আমাদের ট্রেন ছাড়ল।

রেলওয়ে বিজ্ঞপ্তিতে গান্ধীধামও একটি জংশন স্টেশন। কান্দ্‌লা পোর্ট নামে স্টেশন এখান থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে। মাঝখানে একটি ছোট স্টেশন আছে। আর গান্ধীধাম থেকে ভুজেব দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইলেব কিছু বেশি। সবই প্যাসেঞ্জার ট্রেন বলে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টার মতো। মাঝখানে অঞ্জার নামে একটি স্টেশন আছে, সেখান থেকে দুখানা ট্রেন গান্ধীধামের উপর দিয়ে কান্দ্‌লা পোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত করে।

আমার মনে হল যে গান্ধীধামকে জংশন স্টেশন বলা উচিত নয়। এখান থেকে দুদিকে ট্রেন যাতায়াত করে, তৃতীয় দিকে যাবার জন্যে কোন শাখা লাইন নেই। শাখা লাইন না থাকলে তাকে কি জংশন স্টেশন বলে!

স্বাতি হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল: তোমার মরুভারতের কাহিনীতে কচ্ছেব কথা সামিল করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? কচ্ছ তো মরুভূমি নয়!

এ রকমের একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। তার পরেই সামলে নিয়ে বললুম: কে বললে মরুভূমি নয়!

মরুভূমি!

বললুম: মরুভূমিই বলতে পার। গুজরাতের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি আর

লোকসংখ্যা সাড়ে আট লাখের মতো। তার মানে এক বর্গ কিলোমিটারে আঠারো উনিশ জনের বাস।

তাহলে মরুভূমি হল কেমন করে ?

বললুম ঃ বিকানেরের সঙ্গে তুলনা করলেই মেনে নেবে। সেখানে এক বর্গ কিলোমিটারে একুশ জনের বাস।

স্বাতি বলল ঃ এ হিসেব তুমি কোথায় পেলে ?

সরকারী বইএ। তবে আমার মনে হয় যে কচ্ছের রণকেও এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে।

তা তো উচিত নয় !

সঠিক খবর যখন জানি নে, তখন উচিত অনুচিতের কথা বলতে পারব না। বর্ষার জল শুকিয়ে গেলে এই রণ তো স্থলভূমিতে পরিণত হয়। নরম কাদা শুকিয়ে এমন শক্ত হয় যে তাব উপর দিয়ে যথেচ্ছ চলা ফেরা করা যায়। জমি লবণাক্ত বলে কোন চাষ আবাদ হয় না ঠিকই, কিন্তু যে উঁচু টিলাগুলি জলে ডুবে যায় না তার উপরে গাছ-পালা দেখা যায়। এই অঞ্চল তো তখন মরুভূমির মতো। বুনো গাধার দল রাতে চরতে আসে তীরের কাছে, আর দিনের আলোয় মরুভূমিতে লুকোয়।

মে মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বইতে শুরু করলে এর রূপ বদলায়। পশ্চিম থেকে আসে কচ্ছ উপসাগরের জল। আর বর্ষায় পূর্ব দিক থেকে আসে রাজস্থানের নদীর জল। এই রণ তখন বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। এক সাহেবের বইএ পড়েছিলুম যে অতীতে এই রণে বিরাট সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সত্যি !

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম ঃ সে ইতিহাস তো আমার জানা নেই। তবে এখানকার ভূমিকম্পের ভয়াবহতার কথা পড়েছি আর এক সাহেবের বইএ। লেখকের নাম মনে নেই, বইএর নাম 'আর্থকোয়েক'।

তার পরেই বললুম : একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি। সেটা হল সিন্ধু নদের মোহনার কাছেই এই কচ্ছ। সিন্ধু প্রদেশের অনেক নদী কচ্ছেব উত্তরে বড় রণে পড়েছে। দেশ বিভাগের সময়ে সিন্ধু পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে।

কচ্ছে সব চেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল ১৮১৯ সালের ১৬ই জুন। সাহেব তাঁর বইএ এই ভূমিকম্পের ক্ষয় ক্ষতির হিসেব দিয়েছেন। রাজপ্রাসাদ ও সাত হাজার ঘর বাড়ি ভূমিসাৎ হয়েছিল, আর সেই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে একশো দশজন প্রাণ হারিয়েছিল। রাজ্যের সমস্ত দুর্গ এই ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল।

বললুম : তার পরে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই 'আর্থকোয়েকের' লেখক লিখেছেন যে উত্তর কচ্ছে রণ এলাকার পশ্চিমাংশে ঘটেছিল সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। ভূমিকম্পের পরেই একটা বিরাট অঞ্চল উদ্বেল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়ে যায়। সিন্দ্রি নামের একটি দুর্গ ছিল পনর ফুট উঁচুতে। সেটিও জলমগ্ন হয়ে যায়। তার পরে এই বন্যার জল নেমে গেলে দেখা যায় যে কুড়ি ফুট উঁচু একটি বাঁধ দেখা দিয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে এটি কয়েক মাইল দীর্ঘ। আরও পরে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে এই এলাকার জমি প্রায় তিরিশ ফুট নিচে নেমে গেছে।

স্বাতি বলল : কচ্ছে কি এই রকমের ভূমিকম্প আরও হয়েছে?

বললুম : সাহেবের বইএ এই প্রশ্নের উত্তরও আছে। ১৮৪৪ ও তার পরের বছরেও ভূমিকম্প হয়। অতীতেও হয়েছে, আবার ভবিষ্যতেও হবে।

তার মানে ভূমিকম্প এখানে বেশি হয়!

বললুম : বছর দশেক আগেও একবার ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই সময়েই খবরের কাগজে কচ্ছের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছিলুম।

স্বাতি বলল: কচ্ছ তো এখন গুজরাতের একটি জেলা। আগে যে দেশীয় রাজ্য ছিল তার বিষয়ে কিছু জানো?

বললুম: জানি সামান্যই। আমরা এখন সৌরাষ্ট্র বলে যা জানি, তার ভৌগোলিক নাম কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ। কাঠি নামের এক জাতির বাস বলেই এই নাম হয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার আগে এখানে দুশো বাইশটি দেশীয় রাজ্য ছিল। আর পর্তুগীজ অধিকৃত দ্বীপ দিউ। ১৯৪৮ সালে এই সব রাজ্য নিয়ে যে ইউনিয়ন হয় তার নাম সৌরাষ্ট্র। সৌরাষ্ট্র অবশ্য এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম। কচ্ছ উপসাগরে কচ্ছকে একটি দ্বীপ বলা যায়। তার চারিধার ঘিরে আছে রণ আর সমুদ্র। এইটিই ছিল সব চেয়ে বড় রাজ্য। ন হাজার বর্গ মাইল রণ বাদ দিয়ে এর আয়তন ছিল সাড়ে সাত হাজার বর্গ মাইলেরও বেশি। রাজা ছিলেন জাড়েজা রাজপুত বংশের মহারাও। স্বাধীন ভারতে মহারাও মদন সিংজী রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। কোথাও পড়েছিলুম যে কচ্ছে শম্মা রাজপুতেরা জাতে হিন্দু হলেও মুসলমানদের অনেক রীতিনীতি মেনে থাকে। অনেকে তাই মনে করেন যে এক সময়ে এরা হয়তো মুসলমান ছিল। পরে হিন্দু হয়েছে।

স্বাতি বলল: ইতিহাসে কি এ রকম নজির আছে?

বললুম: বোধহয় নেই।

স্বাতি বলল: ভারতের হিন্দুরাই তো মুসলমান আমলে দলে দলে মুসলমান হয়েছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার নজিরও আছে। শুধু মুসলমান নয়, খ্রীষ্টানও হয়েছে ভারতের হিন্দু। কিন্তু অন্য কোন ধর্মের মানুষ হিন্দু হয়েছে, এ রকম কথা কখনও শুনি নি।

বললুম: সে আমাদেরই দোষ। আমাদের রক্ষণশীল ধর্ম তা প্রশ্রয় দেয় নি।

আমাদের ট্রেন থেমে থেমে চলছিল। গান্ধীধাম থেকে

ছাড়বার মিনিট দশেক পরেই দাঁড়িয়েছিল গোপালপুর নামে একটা স্টেশনে। খুব অল্প সময়ের জন্য দাঁড়িয়েছিল। তার পরে আদিপুর নামে একটা স্টেশনে। অনেক যাত্রী এখানে ওঠা-নামা করেছিল। এবারে যে স্টেশনে দাঁড়াল তার নাম অঞ্জার। এই স্টেশনে একটি চায়ের দোকানও আছে। অন্য ধার থেকে আর একখানি ট্রেন এসে এখানে অপেক্ষা করছিল। এই ট্রেন ভুজ থেকে ছেড়েছে নটার আগে।

পরে জেনেছিলুম যে গান্ধীধাম দেখতে এলে এ সব জায়গাও দেখতে হয়। দক্ষিণে সাড়ে সাত মাইল দূরে যেমন কান্দ্‌লা পোর্ট, তেমনি উত্তরে মাইল দশেক দূরে এই অঞ্জার। গত ভূমিকম্পে প্রভূত ক্ষতি হবার পরে নব অঞ্জার গড়ে উঠেছে। আর আদিপুর হল গান্ধীধামেরই অন্তর্গত। রেলওয়ে স্টেশন থেকে সড়ক পথে তার দূরত্ব পাঁচ মাইলের কিছু বেশি। আদিপুর গান্ধীধামের আবাসিক এলাকা। নিয়মিত বাস যাতা-য়াত করে। ট্রেনেও যাতায়াত করা যায়।

আমাদের ট্রেনই আগে ছাড়ল। যে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল, তা পরে ছাড়বে। অঞ্জার থেকে ভুজ পঁচিশ মাইল পথ, মাঝে চারটে স্টেশন। সড়ক পথেও ভুজে যাওয়া যায়। ভুজে এরোড্রোম আছে অনেক দিন থেকে। বম্বে থেকে ও সৌরাষ্ট্রের সমস্ত এরোড্রোম থেকেই ভুজে আসা যায়। আগে ভুজে নেমে সড়ক পথে গান্ধীধামে আসতে হত। এখন সেখানেও এরোড্রোম হয়েছে।

এই রেলপথ কত দিনের পুরনো জানি নে। এক সময়ে কচ্ছের দক্ষিণ উপকূলে দুটি বন্দর ছিল মাণ্ডবী ও টুনা। এই দুই বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়ত। যাত্রী আসত, মালপত্র চলা-চল করত। কান্দ্‌লা প্রতিষ্ঠার পরে এই দুই বন্দরের কাজ হয় কিনা জানি না। মাণ্ডবীর দক্ষিণে সৌরাষ্ট্রের বন্দর ওখা।

দূরত্ব সামান্য। ওখা আমাদের কাছে প্রিয় হয়েছে বেট দ্বারকার জন্যে। ওখা থেকে বেট দ্বারকায় যেতে হয় নৌকোয় চেপে।

আমাদের ট্রেন এখন ভুজের দিকে চলেছে। থেমে থেমে যাচ্ছে। একজন সহযাত্রীর অভাব বোধ করছি। আশেপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছি তারা আমাদের ভাষা যে বুঝবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভুজে আমাদের সময় সীমিত। সেই সময়ের মধ্যে দর্শনীয় জায়গাগুলো আমাদের দেখে নিতে হবে। কিন্তু দর্শনীয় জায়গার নাম আমরা কার কাছে জানব? কোন গাইড নেই, গাইড বইও নেই, তবু আমাদের হার মানলে চলবে না।

৩৯

বেলা সাড়ে বারোটায় আমরা ভুজ স্টেশনে এসে নামলুম। স্টেশনটি খুব ছোট নয়। বড় বলাও যায় না। প্ল্যাটফর্মে কোন রিফ্রেশমেণ্ট রুম নেই। আছে একটি চায়ের স্টল। আমাদের সঙ্গে মালপত্র ছিল না বলে স্বাতি প্রথমেই এই খবরটি সংগ্রহ করল। তার পরে বলল : চল বেরিয়ে পড়ি।

আমি বললুম : এই দুপুর রোদে বেড়াতে কি ভাল লাগবে ?

স্টেশনের বাহিরে কয়েকখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে চেয়ে স্বাতি উত্তর দিল : বিকেলে তো ফিরতে হবে। আর—

আর কী ?

কিছু খেতে হলেও শহরে যেতে হবে।

আর দেখবার জায়গাগুলোর নাম কার কাছে জেনে নেওয়া হবে

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি সহাস্যে একটা টাঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। একজন বুড়ো টাঙ্গাওয়ালাকে বলল : তোমার টাঙ্গায় উঠলে তুমি আমাদের কোন্ কোন্ জায়গা দেখাবে ?

প্রশ্নটা সে হিন্দীতে করল, উত্তরও পেল হিন্দীতে। সে আমাদের পরিচিত হিন্দী না হলেও তার কথা আমরা বুঝতে পারলুম। সে বলল : শহরে অনেক দেখবার জায়গা—ছুটো বড় তালাও আছে দেশল সর আর হামি সর। হিচ বাজার আর আজাদ চৌক। মন্দিরও অনেক আছে—স্বামী নারায়ণ সত্য নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান দ্বারকানাথ সীতারাম আর আটকেশ্বর শিব। রাজপুত রাজা মদন সিংজীর মহলও দেখাব।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: ব্যস ব্যস, যথেষ্ট। আর ভাল খেতে পাওয়া যাবে কোথায়?

বাজারে খুব ভাল জায়গা আছে।

টাঙ্গাওয়ালার কথায় আমি খুব ভরসা পেলুম না। দর্শনীয় স্থানের তালিকা শুনে মনে হল যে কোন জায়গাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। আর তার কাছে যা ভাল খাবারের জায়গা, আমাদের কাছে হয়তো তা খুবই নিকৃষ্ট বলে মনে হবে। কিন্তু স্বাতি সোৎসাহে বলল: সময় মতো আমাদের খাইয়ে দেবে, আর যা দেখাবার তাও দেখাবে। আমরা বিকেলের ট্রেনে ফিবে যাব। ভাড়া নিয়ে তোমার সঙ্গে দরাদরি করব না, যা চাইবে তাই পাবে।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: পরিশ্রম দেখে মজুরি দেবেন।

উঁহু, সেটা কাজের কথা নয়।

বলে একটা রফা করে টাঙ্গায় উঠে পড়ল, এক পাশে বসে আমাকে বলল: এসো।

আমি উঠে তার পাশে বসলাম।

টাঙ্গাওয়ালা করুণ ভাবে তাকাল আমার মুখের দিকে। তার শীর্ণ দেহের দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারলুম যে সামনে তার পাশে বসলেই সে বেশি খুশি হত। সামনে কিছু ভার পড়লে ঘোড়ার সুবিধা হয়। কিন্তু এ রকম একটা বেয়াড়া অনুরোধ করবার সাহস সে পেল না। তাই ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। তেজী ঘোড়া হলে টগবগ করে ছুটত। এ ঘোড়া কোন রকমে টাঙ্গাটা লাইন থেকে বার করে এনে শহরের দিকে অগ্রসর হল।

টাঙ্গাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে বলল: পিছনে একটু হেলান দিয়ে বসুন বাবু!

আমার সঙ্গে সঙ্গে স্বাতিও তাই করল। শরীরের ভার যতটুকু

সামনের দিকে দেওয়া যায় ততটুকুতেই তার উপকার। আমরা এটা বুঝতে পেরেছি মনে করেই টাঙ্গাওয়ালা খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করল: শহর দেখতে এসেছেন বুঝি?

বললুম: হ্যাঁ।

কোথা থেকে এসেছেন?

কলকাতা থেকে।

আমার উত্তর শুনে লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। মুখ থেকে যে শব্দটা বেরোল তার মানে আমি বুঝতে পারলুম না। তবে মনে হল যে সে ভাবছে, এত দূর থেকে ভুজ দেখতে কেউ আসে!

মফস্বল শহরের মতো স্বল্পপরিসরের পথ। খানিকটা এগিয়ে যেতেই দূরের পাহাড়ের দিকে চোখ পড়ল। নিচু পাহাড়। মনে হল যে গোটা শহরটা বুঝি এই পাহাড়ে ঘেরা।

টাঙ্গাওয়ালা পিছন ফিরে দেখছিল। বোধহয় আমাদের আশ্চর্য জীব বলে তার মনে হয়েছে। এখন ঐ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়েছে দেখে বলল: এই পাহাড়ের নাম হল ভুজিয়া ডোঙ্গর। ভুজঙ্গনাগের মন্দির আছে পাহাড়ের উপরে।

তার পরে যে গল্প শোনাল তার অনেক কিছুই বুঝতে পারলুম না। ভাষা হিন্দী নয়, গুজরাতীও নয়। এ কচ্ছের নিজস্ব ভাষা। এ ভাষাকে গুজরাতী-কচ্ছী বলা যেতে পারে বলে পরে শুনেছিলুম।

টাঙ্গাওয়ালার গল্প শেষ হবার পরে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: কিছুই বোঝা গেল না।

অনেকটা পথ গিয়ে আমরা একটা সরোবরের ধারে পৌঁছলুম। ফলে ফুলে সজ্জিত কোন উদ্যান নেই তার তীরে, পুলকিত হবার মতো কোন মন্দিরও নেই। তাই বললুম: এগিয়ে চল।

এবারে সে আমাদের যেখানে নিয়ে এল সে জায়গার নাম

আজাদ চৌকো। খোলামেলা বিরাট একটি প্রাঙ্গণ। টাঙ্গাওয়ালার বর্ণনায় বুঝতে পারলুম যে নেতারা এইখানে ভাষণ দিয়ে থাকেন।

বাজারে পৌঁছে স্বাতি তার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বলল: খাবার সময় তো হয়েছে, এইবারে খেয়ে নিলেই ভাল।

একটা খুবই সাধারণ জায়গায় আমরা খেয়ে নিলুম। গুজরাতী ধরনের খাবার—ডাল ভাত রুটি তরকারী, সঙ্গে একটু খাঁটি ঘি। এই রকমের নিরামিষ আহার শুধু গুজরাতে নয়, রাজস্থান ও নানা তীর্থস্থানের গুজরাতী লজে পাওয়া যায়। হিমালয় ভ্রমণের সময়ে আমার মনে হয়েছে যে ভ্রমণে গুজরাতীদের স্থান বাঙালীদের পরেই। অন্য রাজ্যের অধিবাসীরা এখনও এমন ভ্রমণ-বিলাসী হয়ে ওঠে নি।

এর পরে আমরা রাজবাড়ি দেখলুম। বিরাট কিছু নয়, ধনী লোকের শৌখিন বাড়ির মতো। ভিতরে ঢুকে মনে হল যে এখন এটি কোন সরকারী দপ্তরে পরিণত হয়েছে। লোকজনের আনাগোনা দেখে আমরা বেরিয়ে এলুম।

শহরের কোন মন্দির দেখে আমরা অভিভূত হলুম না। বরং একটি সরোবর দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। বেশ শীতল জায়গাটি, রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে বসে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করে। হাতে সময় ছিল, কিন্তু স্বাতি বলল: না, এখানে নয়।

কেন?

এখানে বসলে বিশ্রাম করাই হবে, কিছু জানা যাবে না।

তাহলে আমরা কি এখন স্টেশনে ফিরব?

স্বাতি বলল: কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে—

বাধা দিয়ে বললুম: বুঝেছি।

এখান থেকে আমরা স্টেশনেই ফিরে এলুম। কিন্তু একেবারে নিরাশ হতে হল। স্টেশনে এখন কেউ নেই। যে ট্রেনে আমরা এসেছিলুম, সে ট্রেন বেলা একটা পঁচিশ মিনিটে ছেড়ে গেছে। আমাদের

ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যে সাতটা পনর মিনিটে। কান্দ্‌লা পোর্ট থেকে যে ট্রেনখানা সাড়ে পাঁচটায় আসবে, সেখানাই সোয়া সাতটায় ফিরবে। আমরা গান্ধীধামে পৌঁছব রাত পৌনে দশটায়। স্টেশন এখন ফাঁকা। কাজেই ওয়েটিং হলে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্বাতি একখানা বেঞ্চিতে বসে বলল: এ ভালই হল। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এইবারে একটু চোখ বুজে জিরিয়ে নেওয়া যাবে।

আমি তার পাশে বসে বললুম: কচ্ছ দেখা সম্পূর্ণ হল তো!

স্বাতি বলল: কিছুই তো দেখবার নেই।

বললুম: গান্ধীধাম আর কান্দ্‌লাই সব।

মানে?

মহারাওএর রাজত্ব যেদিন গেছে, ভুজের গৌরব শেষ হয়েছে সেই দিনই। এখন এটি একটি জেলার প্রধান শহর। সমুদ্র নেই, নদী নেই, রণও নেই কাছে। আছে শুধু পাহাড়, সেও তো অনেক দূরে মনে হচ্ছে। এক সময়ে হয়তো প্রাচীরে ঘেরা ছিল, দুর্গের মতো রক্ষা করত এই শহরটাকে।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: কোন টুরিস্ট লিটারেচারে আমি কচ্ছের কথা পাই নি।

গুজরাতের উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের একখানা পুস্তিকা আমি দেখেছিলুম। তাতে সৌরাষ্ট্রের অনেক জায়গার কথা আছে, কিন্তু কচ্ছের কোন জায়গার কথা নেই। হঠাৎ আমার একটি তীর্থের নাম মনে পড়ে গেল—নারায়ণ সরোবর। বললুম: নারায়ণ সরোবরের কথা তোমাকে বোধহয় বলি নি!

স্বাতি বলল: এখানকারই কোন সরোবর?

বললুম: আমাদের কোনে পুরাণে নাকি পাঁচটি পবিত্র সরোবরের নাম আছে।

তিব্বতে মানস সরোবরের নাম জানি।

আর কচ্ছে নারায়ণ সরোবর। ভুজ থেকে একশো মাইল দূরে সমুদ্রের কাছে। নিকটে একটি নদীর উৎস ছিল। সেই নদী উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হত। তার পর ভূমিকম্পে সিন্ধুর খাত পরিবর্তিত হয়ে গেলে এই সরোবরের মাহাত্ম্য কমে যায়। সেই সুন্দর হ্রদ এখন একটি পুকুরে পরিণত হয়েছে।

স্বাতি বোধহয় আরও কিছু জানতে চাইল। তাই বললুম: পুরাকালে নানা স্থান থেকে অগণিত যাত্রী আসত এখানে। শোনা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের পঁচিশ বছর আগে আলেকজাণ্ডার এখানে এসেছিলেন। অত্যন্ত রমণীয় তীর্থ বলে এই জায়গার খ্যাতি ছিল। অনেক কিংবদন্তীও নাকি আছে।

পুরাণে বা মহাভারতে এ নাম পাও নি?

একটু চিন্তা করে বললুম: ভাগবতে বোধহয় পড়েছি—

নারায়ণ সরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্ব পূর্বজাঃ।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: এখন কি এই তীর্থের কিছুই অবশিষ্ট নেই?

বললুম: শুনেছি ষোড়শ শতাব্দীতে একবার এই সরোবরের সংস্কার হয়েছিল, তার পরে ১৭৪০ সালে আর একবার। এখানকার এক প্রাচীন মন্দিরের ছবিও দেখেছি। রাজস্থান ও গুজরাতের শৈব মন্দিরের মতো দেখতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি চতুষ্কোণ কক্ষ, তার উপরে ছোট গম্বুজ, মাঝখানে একটি বড় কিন্তু নিচু গম্বুজ-বিশিষ্ট মণ্ডপ, পিছনে গর্ভগৃহের উঁচু শিখর। মাঝখানের মণ্ডপের দুপাশেও দুটি ছোট গম্বুজ দেওয়া কক্ষ আছে। কিন্তু কোনটি আলাদা নয়।

শুধু একটি মন্দির?

বললুম: মন্দির বোধহয় আরও আছে। কিন্তু ছবি দেখেছি একটি মন্দিরের। এখনও পশ্চিমের সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে, তখন অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

এখনও সেখানে যাত্রী যায়?

ধর্মশালা যখন আছে তখন যাত্রী নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু একটি কথা জানতে পারি নি। কোটেশ্বর নামে কচ্ছে যে ঐতিহাসিক স্থানের কথা পড়েছি, তা এখানেই ছিল, না এরই নিকটে অন্য কোন স্থানে, তা এখনকার মানচিত্র দেখে হদিস করতে পারি নি।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : না গেলে এসব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

গেলেই কি পারা যাবে?

চেষ্টা করলে বিফল হবে কেন?

বললুম : কচ্ছের আর একটি তীর্থস্থানের নাম ভদ্রেশ্বর। তার সম্বন্ধেও কিছু জানি না।

স্বাতি বলল : এ দিকের আর একটি তীর্থস্থানের নাম আমার মনে পড়ছে।

বললুম : বল।

হিঙ্গলাজ। কিন্তু সে জায়গা ঠিক কোথায় সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।

বললুম : কোন মানচিত্রে এ নাম দেখি নি, কোন গাইড বইএও এ নাম পাই নি। তবে একান্ন পীঠের নামের তালিকায় দেখেছি যে এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল। শক্তির নাম কোট্টরী বা কোট্টরীশা আর ভীমলোচন হলেন ভৈরব।

কিন্তু এই তীর্থ কোথায়?

তন্ত্রচূড়ামণি ও বৃহন্নীলতন্ত্রে এ জায়গার নাম হিঙ্গুলা আর হিঙ্গলা নাম শিবচরিতে। বিশ্বকোষ ঘেঁটে জেনেছিলাম যে সিন্ধু নদের মোহনা থেকে আশি মাইল পশ্চিমে ও আরব সাগর থেকে বারো মাইল উত্তরে এক পর্বতমালার প্রান্তে এই তীর্থ। পুরাকালে একটি নগর ছিল এইখানে, আর কালীর মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে। স্থানীয় লোকেরা কালীকে মহামায়ী বা নানী বলে।

স্বাতি বলল : এ তীর্থ এখন আর দেখার উপায় নেই, তাই না?

বললুম ঃ মানস সরোবর ও কৈলাসের মতো হিঙ্গলাজও আর আমাদের দেশে নেই। সেখানে যেতে হলে পাসপোর্ট আর ভিসা সংগ্রহে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

অনেক কিছুই আমরা হারিয়ে ফেলছি।

বলে স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিকেলে আমরা স্টেশনের স্টলে চা খেলুম। আর সামান্য যা পাওয়া যায় তাই। গান্ধীধামে পৌঁছে কিছু খেতে পাওয়া যাবে কিনা জানি নে বলেই অনিচ্ছাতেও কিছু খেতে হল।

সাড়ে পাঁচটার ট্রেন সময় মতোই এল। খালি ট্রেনে আমরা আগেভাগেই উঠে বসলুম।

কেন জানি না মন আমাদের বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কোন সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করে নতুন কিছু জানবার বাসনা আর ছিল না। এক সময় স্বাতি বলল ঃ এবারের ভ্রমণ আমাদের শেষ হয়ে গেল, তাই না!

এখান থেকে আমরা গান্ধীধামে যাচ্ছি, এক দিন সেখানে কাটিয়ে ফেরার গাড়ি ধরব। আর কোথাও আমরা এবারে নামব না। সোজা কলকাতা। দুজনেই ছুটি বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছি টেলিগ্রামে। চাকরিতে আমি আর আগের মতো নির্লিপ্ত নই। এখন দায়িত্ব অনেক, কর্তব্য আরও বেশি। তাই স্বাতির কথা আমি নিঃশব্দে মেনে নিলুম।

৩২

রাত দশটার আগেই আমরা গান্ধীধামে পৌঁছে গেলুম। রিফ্রেশমেণ্ট রুম তখনও খোলা ছিল। সামান্য কিছু আহার করে আমরা রিটায়ারিং রুমে চলে এলুম। গত রাতে ঘুমের সময় পেয়েছিলুম অল্প, আজ সারা দিনেও আমরা বিশ্রামের সময় পাই নি। তাই ঘুমের জন্যে আমাদের কোন সাধনা করতে হল না।

সকাল বেলায় যখন ঘুম ভাঙল তখন আর কোন ক্লান্তি নেই। মুখ হাত ধুয়ে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমেই চা খেয়ে নিলুম রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। স্বাতি বলল : আজই আমরা ফিরব তো!

কিন্তু কোন্ পথে ফিরব সেটাই ভাবনার কথা।

স্বাতি বলল : ফেরার পথ কি অনেক আছে?

বললুম : এই তো কদিন আগেই আমরা আলোচনা করলুম। পালনপুরে ফিরে আমরা দিল্লীর ট্রেন ধরতে পারি, আবার সোজা আমেদাবাদে পৌঁছে কিংবা ভিরমগমে গিয়ে বম্বে হয়েও ফেরা যেতে পারে। আর—

আর?

তোমার সেই পথ—উদয়পুর হয়ে ফেরা।

স্বাতি বলল : পথে আর আমরা সময় নষ্ট করব না।

তার কথায় আমি হাসলুম। আর স্বাতি আমার হাসি দেখে রেগে গিয়ে বলল : ঠিকই তো। দুজনেরই নতুন চাকরি। সময় মতো কাজে যোগ দিতে হবে তো! আর এই তো আমাদের শেষ বেড়ানো নয়!

আমিও বললুম : ঠিকই তো।

এনকোয়ারি অফিসে খবর নিয়ে জানলুম যে এখান থেকে ফেরার দুটো পথ আছে, আর ট্রেন আছে তিনটে। বড় লাইনের ট্রেন সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত দশটায়। সে ট্রেন ভিরমগামে যায় শুনেই স্বাতি বলল: না, ও দিকে আমরা যাব না।

আর দুটো ছোট লাইনের ট্রেন। একটা রাত পৌনে একটায় ছেড়ে পালনপুরে পৌঁছয় পৌনে দশটায়, আর দ্বিতীয় ট্রেন বিকেল সাড়ে চারটেয় ছেড়ে আমেদাবাদে পৌঁছয় ভোর পৌনে ছটায়। পালনপুরে নামতে হবে রাত একটায়।

স্বাতি বলল: সেখানে না নামলে?

আশি মাইলের মতো উজিয়ে গিয়ে আমেদাবাদ থেকে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে।

তাতে কি সময় বেশি লাগবে?

উত্তর পাওয়া গেল যে তা নয়। যে ট্রেনের জন্যে পালনপুরে অপেক্ষা করতে হবে, সেই ট্রেনই ধরা যাবে আমেদাবাদে।

স্বাতি বলল: তবে আমরা আমেদাবাদেই যাব।

বলে ফেরার ব্যবস্থা করে ফেলল।

তার পরে আমরা গান্ধীধাম দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। পথে এসে বললুম: প্রথমে কোথায় যাবে?

স্বাতি বলল: শহর দেখা শেষ না করে কারও খোঁজে যাব না।

আমি বললুম: সেই ভাল। ফেরা যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন নিজেদের কাজ আগে সেরে নেওয়াই উচিত।

বলে বাসে চেপে কান্দ্‌লা পোর্টের দিকে যাত্রা করলুম। সেখান থেকে গান্ধীধাম শহরে যাব। যা কিছু দেখবার আছে তা দেখে নিয়ে রাণার খোঁজ করব, তার পরে চাওলার দিদির খোঁজ।

প্রশস্ত পথ ধরে আমরা দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চললুম। কচ্ছের মানচিত্রে টুনা ও মাণ্ডবী বন্দরের নাম ছিল, তার সঙ্গে কান্দ্‌লা নাম নতুন যুক্ত হয়েছে। ভারত বিভক্ত হবার সময়ে পশ্চিম

ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর করাচী পড়েছিল পাকিস্তানের ভাগে। তারই বিকল্প হিসেবে কান্দলার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। এখনও করাচীর মতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি, তবু এই বন্দর পশ্চিম ভারতের প্রয়োজন মেটাচ্ছে বহুলাংশে।

এক সময়ে আমরা বন্দর এলাকায় পৌঁছে গেলুম। যেখানে আমরা নামলুম সেখান থেকে নতুন ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে চলে গেলুম সমুদ্রের দিকে। বন্দরে কোন বড় জাহাজ দেখতে পেলুম না, তার বদলে সমুদ্রেরই সুন্দর রূপ দেখতে পেলুম এক জায়গায়। স্বাতি তার ক্যামেরা সঙ্গে নিতে ভোলে নি। বলল: এখান থেকে সমুদ্রের একটা ছবি তুলে নিই।

বললুম: কাল তুমি ভুজে কোন ছবি নাও নি!

স্বাতি বলল: ছবি নেবার মতো কোন দৃশ্য দেখতে পাই নি।

ছবি নিতে স্বাতির বেশি সময় লাগল না। বলল: জলের উপরে সূর্যের আলো ভারি সুন্দর দেখাবে।

তার পরে আমরা ফেরার বাসে এসে উঠলুম।

আরব সাগরের জল থেকে নুন তৈরি হয় কচ্ছের নানা জায়গায়। এও একটা শিল্প। ভেবেছিলুম, এই নুন তৈরির পদ্ধতি কোথাও দেখে নেব। কিন্তু গান্ধীধামে যাবার তাড়া ছিল বলে তা সম্ভব হল না। সেই পুরনো পথেই আমরা গান্ধীধামে ফিরে এলুম।

বাসে এক সহযাত্রীর কাছে অনেক খবর পেলুম। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে পাঞ্জাবী আর বাঙালীদের মতো সিন্ধীরাও উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছিল আরও খারাপ। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হয়েছিল বলে উদ্বাস্তুরা সিন্ধীদের মতো একেবারে দেশছাড়া হয় নি। গোটা সিন্ধু প্রদেশটাই পড়েছিল পাকিস্তানের ভাগে। তাই হিন্দু সিন্ধীদের চলে আসতে হয়েছিল নতুন রাজ্যে। কচ্ছ তাদের প্রতিবেশী রাজ্য ছিল বলে এই দিকটাই তারা পছন্দ করেছিল।

কচ্ছের মহারাও এই বিরাট এলাকা যে তাদের জন্যে দান করেছিলেন সে কথা আজকাল সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু ভাই প্রতাপ দয়ালদাসের নাম ভোলে নি। সিন্ধু রিসেট্‌ল্‌মেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করে তিনি সিন্ধী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করেছিলেন। ভারত বিভাগের সময়ে এই জায়গা যে ঊষর পতিত জমি বলে পড়ে ছিল, এখন কেউ তা বিশ্বাস করবে না। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই উদ্বাস্তু সিন্ধীদের জন্যে এখানে একটি বাসভূমি গড়ে তোলবার পরিকল্পনা চলছিল। দেশ স্বাধীন হবার কিছু পরেই গান্ধীজী নিহত হলেন। তাঁর অস্থি আনা হল এখানে। আচার্য কৃপালনি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করে সেই অস্থি কান্দ্‌লা ক্রিকে বিসর্জন দিলেন। নতুন শহরের নামকরণ হল গান্ধীধাম।

আমেদাবাদের নিকটে আরও সাম্প্রতিক কালে গান্ধীনগর গড়ে উঠেছে। গুজরাত রাজ্যের রাজধানী এখন গান্ধীনগরে।

ভদ্রলোক বললেন: এই গান্ধীধাম গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত বছর। জে. কে. চৌধুরী নামে একজন তরুণ স্থপতি এই শহরের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল আর অ্যামেরিকানরা গড়েছিল এই শহর। এক হাজার একর জমির উপরে এই শহরের দুটি প্রধান ভাগ আছে—ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সর্দারগঞ্জ আর আদিপুর বসবাসের জন্য।

ট্রেনে ভুজ যাবার সময়ে এই আদিপুর আমরা দেখেছি। কিন্তু সে কথা বল্‌বার আগেই ভদ্রলোক বললেন: দশ বছরেই সর্দারগঞ্জে আড়াই শোর বেশি দোকান চালু হয়ে যায়। বাজারের পথঘাটগুলো একশো কুড়ি থেকে দুশো কুড়ি ফুট চওড়া। বৃষ্টিপাতের অভাবে এখানে কোন গাছপালা ছিল না। কিন্তু দশ বছরেই পথের ধারে ছাব্বিশ হাজার গাছ বেড়ে উঠে শহরের চেহারাই বদলে দিয়েছিল।

আমি প্রশ্ন করলুম: এখন এখানে কী দেখবার আছে?

ভদ্রলোক বললেন : বাজারে আর দেখবেন কী, সোজা আদিপুরে গিয়ে গান্ধীজীর সমাধি দেখুন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে প্রার্থনা সভা হয়। তার পরে চলে যাবেন নির্বাস্তেশ্বর শিবের মন্দিরে। একেবারে নতুন ধরনের মন্দির, এ রকম শিবের মূর্তিও আপনারা কোথাও দেখেন নি।

স্বাতি মৃদু স্বরে বলল : নির্বাস্তেশ্বর শিব !

বললুম : মনে হয় নির্বাস্তুর ঈশ্বর থেকে নির্বাস্তেশ্বর। আমরা নির্বাস্তু বলি না, বলি উদ্বাস্তু।

ভদ্রলোক আমাদের বাঙলা কথা বুঝতে পারেন নি। বললেন : সর্দারগঞ্জ আর আদিপুরের দূরত্ব খুব কম নয়। মাইল চারেকের মতো হবে।

স্বাতি বলল : আর কিছু দেখবার নেই ?

ভদ্রলোক বললেন : নটমন্দির নামে একটা ওপেন-এয়ার থিয়েটার আছে। মানে একটা মাঠের এক ধারে একটা পাকা স্টেজ। দর্শকরা খোলা আকাশের নিচে বসে থিয়েটার দেখে। কিন্তু এখন সেখানে কী দেখবেন !

আমি বললুম : আর কিছু ?

গান্ধীধাম মাতৃমণ্ডপ আপনারা দেখবেন কি ?

বলে তিনি স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললেন : মহিলাদের ব্যাপার।

স্বাতি মাথা নেড়ে বলল : না।

ভদ্রলোক বললেন : সিনেমা হাউস আছে, সন্ধ্যাবেলায় সিনেমা দেখতে পারেন। শিলায়া লেকের ধারে বেড়িয়ে আসতে পারবেন।

সে জায়গা কত দূরে তা জানতে চাইবার আগেই বাস রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এসে গেল। আর ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরাও নেমে পড়লুম এবং খোঁজখবর নিয়ে আদিপুরের বাসে উঠে বসলুম। দর্শনীয় স্থানের তালিকা আমাদের সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আমরা শুধু নির্বাণেশ্বর শিবের মন্দির দেখব, আর খুঁজে বার করব মিত্রা ও চাওলার ভাইবোনকে। তাদের সংবাদ নিয়ে গান্ধীধাম ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাব। মরুভারত ভ্রমণ আমাদের আজই সমাপ্ত হবে।

আদিপুরে পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। একজন সহযাত্রী আমাদের মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু মন্দিরে পৌঁছে বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গেলুম। এ রকমের মন্দির আমরা ভারতবর্ষের কোনখানে দেখি নি। এ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মন্দির। অথচ এ যে দেবতার মন্দির তা বুঝতে কোন সময় লাগে না।

আমার মতোই বিস্মিত হয়েছিল স্বাতি। তাই তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললুম: আশ্চর্য হচ্ছ কেন! নতুন ভারত যে গড়ে উঠছে এ তারই সূচনা।

স্বাতি বলল: কেরালাতেও আমরা একটা নতুন ধরনের মন্দির দেখেছিলাম। তাই না?

বৃত্তের আকারের একটি কারুকার্যহীন মন্দিরের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললুম: কোচিনে ডাচ প্যালেসের পাশে?

ঠিক বলেছ।

কিন্তু তাকে একটা ধান চালের গোলা বলে আমার মনে হয়েছিল। মন্দির না বলে লাইব্রেরি বা ক্লাবঘর বললেও মেনে নিতুম।

মন্দিরের ভিতরে না ঢুকে দূরে দাঁড়িয়ে আমরা এর স্থাপত্য-রীতি লক্ষ্য করলুম। সব চেয়ে যেটা আশ্চর্যের মনে হল তা ভিতের অভাব। সমতল ভূমির উপর থেকেই মন্দিরটি যেন গজিয়েছে, মন্দিরে ঢোকবার জন্য কোন সিঁড়ি ভাঙতে হয় না।

প্রবেশ পথে একটি কি দুটি ধাপ আছে নিচু নিচু। দু ধারে দুটি চৌকো থামের উপরে সমতল ছাদ। তার পরেই মন্দিরের দরজা। কিন্তু এই দরজা দিয়ে ঢুকে গর্ভগৃহে পৌঁছনো যাবে না। তার আগে নাটমন্দিরের মতো বৃহৎ আকারের একটি হল ঘর। এক ধারের মাটি থেকে উঠে অন্য ধারে নেমে গেছে। কোন্‌টা ভিত, কোন্‌টা দেওয়াল, আর ছাদ কোন্‌টা, তা বোঝবার উপায় নেই। পাশ থেকে পাশাপাশি চারটি জানলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর পরেই মন্দিরের উঁচু শিখর যেন মাটি থেকেই ফুঁড়ে বেরিয়েছে। চার কোণা নয়, গোলও নয়। অথচ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম হয়ে উপরে উঠেছে। সব শেষে একটি ত্রিশূল, তার গা থেকে একটি লাল নিশান বাতাসে উড়ছে। এই মন্দিরের গায়ে কোনখানে কোন কারুকার্য নেই, শুধু সাদা দাগ কেটে ইঁটের গাঁথুনি যেন স্পষ্ট করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল। তাই দেখে বললুম: মন্দিরের ভিতরে যাবে না?

তুমি কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে?

হেসে বললুম: চল, দুজনেই দেখে আসি।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: দেখে আসি নয়, বল দেবতাকে প্রণাম করে আসি।

বললুম: এ আমাদের অভ্যাসের দোষ। বলি মন্দির দেখতে এসেছি, দেবতার দর্শন পেতে এসেছি এ কথা বলি না।

বলা উচিত।

অভুক্ত এসে পূজো দেওয়াও উচিত। কিন্তু সে কথা কি আমরা সব সময়ে মানি! বিপদে পড়ে মানত না করলে দেবতার মর্যাদা দিতে আমরা ভুলে গেছি।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গর্ভগৃহে একটা বেদীর উপরে আমরা নির্বাস্তেশ্বর শিবের দর্শন পেলুম। শিবলিঙ্গ নয়, শিবের দণ্ডায়মান

মূর্তি। বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ মূর্তি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত নটরাজের মূর্তি নয়। গলায় লাল ও সাদা ফুলের মালা, দেহের উর্ধ্বাংশের অনেকখানি তাতে ঢাকা পড়েছে।

আমরা প্রণাম করলুম অনেকটা তফাতে দাঁড়িয়ে। তার পরে বেরিয়ে এলুম। কোন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা দেখলুম না, কোন ভক্ত যাত্রীও না। বাহিরের পত্রবহুল বিরাট বৃক্ষের নিচে দুজন মহিলাকে দেখলুম বিশ্রাম নিতে।

আশেপাশে আরও কয়েকটি বড় গাছ ছিল। একদা নাকি বৃক্ষহীন মরুভূমির মতো ছিল এই স্থান। এখন আর সে কথা বিশ্বাস হয় না। মরুভূমিকে সুজলা সুফলা করেছে সিন্ধুর উদ্বাস্তু মানুষেরা।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমরা এক ভদ্রলোকের দেখা পেলুম। আমাদের ঠিকানা দুটো বার করতে বললুম স্বাতিকে। তার পরে সেই কাগজ ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে জায়গার হদিস চাইলুম।

রাণার নাম দেখে ভদ্রলোক বললেন: ইনি তো সরকারী অফিসার, কোথায় থাকেন তা জানি না।

জিজ্ঞাসা করলুম: অফিসটা কোথায়?

বোধহয় গান্ধীনগরে।

সে তো আমেদাবাদের কাছে। আমরা শুনেছি এখন কচ্ছে কাজ করছেন।

তাহলে ভুজে খোঁজ করতে পারেন।

স্বাতি বলল: গান্ধীধামে নয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তার পর খানিকক্ষণ ভেবে বললেন: গান্ধীধামে একটা ফ্রি ট্রেডিং জোন আছে। সেখানে খোঁজ করতে পারেন।

তার পরের ঠিকানাটা আদিপুরের। নাম দেখেই বললেন: আপনারা কি মালতী ঘেলানির খোঁজ করছেন?

নারায়ণ ঘেলানির স্ত্রীর নাম কি মালতী ?

বোধহয় তাই হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

বলে এগিয়ে চললেন।

ভদ্রলোক আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার করছেন ভেবে খানিকটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি খানিকটা এগোবার পরে দূরের একখানা ছোট বাড়ি দেখিয়ে বললেন : ঐ বাড়িতে খোঁজ করুন। মনে হয় মালতীব স্বামীব নামই নাবায়ণ ঘেলানি।

বলে নমস্কার কবে বিদায় নিলেন।

৩৩

একটুখানি ঘুরে আমরা সেই বাড়ির সামনে এলুম। বাহিরে কোন বেল ছিল না, তাই কড়া নাড়লুম। কিছুক্ষণ পরেই এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। ময়লা কাপড়, বোধহয় সংসারের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। একটু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: কাকে চাই?

আমি যথাসম্ভব মোলায়েম ভাবে বললুম: এটা কি নারায়ণ ঘেলানির বাড়ি?

ভদ্রমহিলা সচকিত হয়ে বললেন: কোথা থেকে আসছেন?

বললুম: দিল্লী থেকে।

চাওলার কথা বলতেই ভদ্রমহিলা মুহূর্তে বদলে গেলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন: লালুর কাছ থেকে!

চাওলার পুরো নাম আমি জানতুম না। মনে হল এল. সি. চাওলা হয় তো লালচাঁদ চাওলা হবে। মাথা নেড়ে বললুম: হ্যাঁ।

সেই মুহূর্তেই তাঁর দৃষ্টি বিষণ্ণতায় ভরে গেল। অত্যন্ত চাপা ও মৃদু স্বরে বললেন: আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বললুম: নিশ্চয়ই রাখব।

আমার স্বামীকে জানতে দেবেন না যে লালুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এ কথাও বুঝতে দেবেন না।

তবে কী বলব?

ভদ্রমহিলা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন: ওঁর কবি হবার শখ ছিল। সিন্ধী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন শুনে খুশি হবেন।

স্বাতি বলল : আমরাও সিন্ধী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে খুশি হব।

ভদ্রমহিলা বললেন : সংসারের কাজ সেরে আমি কাজে বেরোব। পথে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে।

ঘরের ভিতর থেকে পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন এল, আর ভদ্রমহিলাও একটা জবাব দিয়ে তৎপর ভাবে ফিরে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম বাহিরে।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই তিনি ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন একটা ঘরে। বললেন : এঁর নাম শুনেই আপনারা এসেছেন।

ভদ্রলোক একখানা আবাম চেয়াবে শুয়ে ছিলেন। পাশে একটা ক্রাচ রাখা আছে দেখে বুঝতে পারলুম যে চলা ফেরার জন্যে ঐ ক্রাচের সাহায্য নিতে হয়। সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন : কে আপনাদের আমার নাম বলেছে ?

হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : আমবা কলকাতা থেকে কচ্ছে বেড়াতে এসেছি। শিবের মন্দির দেখে একজন ভদ্রলোকের কাছে সিন্ধী সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলুম। তিনি এই বাড়িটা দেখিয়ে আপনার নাম বললেন।

কী নাম ভদ্রলোকের ?

তা তো জানতে চাই নি।

কিন্তু আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন কেন ?

না, তাও চাই নি। তিনি নিজেই আপনার নাম বললেন।

খুবই সন্দিগ্ধ ভাবে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর ভদ্রমহিলাও তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু ততক্ষণে আমি অনেক সহজ হয়ে গেছি। বললুম : জানেন, সিন্ধী সাহিত্য সম্বন্ধে আমি একখানা বই অনেক দিন আগে

পড়েছিলুম—ডক্টর এইচ. এম. গুরবর্কসানির লেখা 'দি হিদারটু পাব্লিশ্ড্ লিটারেচার ইন দি সিন্ধী ল্যাঙ্গুয়েজ'।

পড়েছেন এই বই ?

বলে ভদ্রলোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন : আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

আর ভদ্রমহিলা এবারে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে চলে গেলেন। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নারায়ণ ঘেলানি বললেন : ঐ বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২১ সালে আমাদের জন্মের আগে। তার আগে নাকি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ধী ভাষার অস্তিত্বই স্বীকার করত না।

মানে ?

কলেজে এ ভাষা পড়ানো হত না।

বললুম : আশ্চর্য !

আশ্চর্য আর কী ! তখন তো ইংরেজের রাজত্ব ছিল। স্বাধীন ভারতেও কি সিন্ধী ভাষা কোন স্বীকৃতি পেয়েছে !

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক।

আলোচনা একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করবার জন্য আমি বললুম : লালচাঁদ জ তিয়ানির নাম আমি শুনেছি।

তিনি একজন বড় লেখক। ১৯১৪ সালে জগতিয়ানি আর জেঠমল পরশরাম সিন্ধী সাহিত সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। অনেকে বলেন যে আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের জন্ম হয়েছে ১৯২১ সালে, কিন্তু আমি বলি ১৯১৪ সালে। সেই বছরেই দেশের সমস্ত তরুণ লেখক এসে জগতিয়ানির সিন্ধী সাহিত সোসাইটিতে জড়ো হয়েছিলেন ; আর কথাসাহিত্যে হয়েছিল নতুন প্রাণের সঞ্চার।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তার আগে কি শুধু কাব্য সাহিত্যই ছিল ?

নারায়ণ ঘেলানি বললেন : সব সাহিত্যেই তো তাই। আর ধর্ম

নিয়েই প্রথম দিকের কবিতা। বাঙলায় যেমন বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে কবিতা, সিন্ধী সাহিত্যে তেমনি সুফীবাদের প্রভাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ আবদুল লতিফ হলেন শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। তাঁর চেয়েও প্রাচীন কবি আছেন—পঞ্চদশ শতাব্দীর কাজী কাজাল, এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মাচল, সামি, বেদিল প্রভৃতি।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : সিন্ধী ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

ভাষা সম্বন্ধে !

বলে ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। তার পরে বললেন : সিন্ধী মোটেই আধুনিক ভাষা নয়। পশ্চিমা পাঞ্জাবীর সঙ্গে এ ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। লেখার ব্যাপারে ফার্সী লিপিই প্রচলিত ছিল। তবে গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই লিপির কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এখন অবশ্য ফার্সী আরবী ছেড়ে দেবনাগরী লিপিই গ্রহণ করা হয়েছে।

বললুম : হিন্দীর সঙ্গে পার্থক্য কিছু দেখতে পান ?

ভদ্রলোক বললেন : আপনার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছি বটে, কিন্তু হিন্দীতে তেমন দখল নেই। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে হিন্দীতে বর্ণমালার তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে যে প্রভেদ আছে, সিন্ধীতে তা নেই। অর্থাৎ ঘ ঝ ঢ ধ ভ আমরা গ জ ড দ ও ব-এর মতোই উচ্চারণ করি।

তার পরেই ভদ্রলোক হাঁক দিলেন : মাল্‌তী, তুমি কোথায় গেলে ?

স্বামীর ডাক শুনেই মালতী বেরিয়ে এলেন। আর তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন : অতিথি এসেছে, একটু চা খাওয়াও এঁদের।

মালতী বললেন : এখন তো খানা বানাচ্ছি, যদি বল তো ওঁদেরও খাইয়ে দিই।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন : তা হলে তো ভালই হয়। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

ওঁরা বাঙালী, নিরামিষ খানা কি ওঁদের ভাল লাগবে!

স্বাতি বলে উঠল: না না, আমাদের জন্যে আপনারা কোন কষ্ট করবেন না।

মালতী বলল: কষ্ট আর কী! দুখানা রুটি বেশি সেঁকতে হবে এই যা!

বলেই ভিতরে চলে গেলেন।

নারায়ণ ঘেলানি প্রফুল্ল মনে বললেন: মাল্‌তীর মেজাজ ভাল থাকলে সব ভাল। তা না হলেই বিপদ।

তার পরেই বললেন: হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন!

বললুম: কবিদের কথা।

ঠিক। পুরনো কবিদের ছেড়ে এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু করি, কী বলেন!

বললুম: সেই ভাল।

ভদ্রলোক বললেন: কালিচ বেগ মির্জা ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক। কবিতা লিখেছেন, নাটকেও তাঁর খ্যাতি ছিল, আর সংস্কৃত ও উর্দু থেকে অনুবাদ ছাড়া মৌলিক উপন্যাস লিখেছিলেন দুখানা—জিনত ও দিল আরাম। সুফীবাদের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন এবং রূপ ও প্রেমকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর পরেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত। কিসনচাঁদ 'বেওয়াস' লিখলেন 'গরীবোঁ-ঝি-ঝুপ্‌রি', মানে গরিবের কুঁড়ে এবং 'লার্ক', মানে চোখের জল। দরিদ্র জনগণের সুখ দুঃখই তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে উঠল। তাঁরই সমধর্মী হায়দরবক্স 'জাতই' লিখলেন 'দরিয়া শাহ'—সিন্ধু নদকে নিয়ে একটি কাব্য। লেখরাজ 'আজিজ' সনেট থেকে মহাকাব্য কিছুই বাদ দেন নি। অনেকের মতে তাঁর লেখা 'শাহরাণী শামা' মানে কবির প্রদীপ আর 'পছতাউ-ঝা-লার্ক' মানে অনুশোচনার অশ্রু আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম। পুণ্ডরাজ 'দুখায়াল' চাষীদের কবি। আকবর আলী

'আইজ' আমাদের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি, আর হরি 'দিলগীর' ছোটদের জন্য কবিতা লিখে নাম করেছেন।

ঠিক এই সময়ে মালতী এসে তাঁর স্বামীকে বললেন: বেশি দেরি করো না। তোমাদের খাইয়ে আমাকে বেরোতে হবে।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভিতরে চলে গেলেন।

নারায়ণ ঘেলানি আমাকে বললেন: দেখলেন তো, এ সংসারে আমার কোন কথা চলবে না।

আমি বললুম: এবারে আপনি কথাসাহিত্যের কথা কিছু বলুন।

ভদ্রলোক বললেন: শৈশবে আমরা আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুবাদ পড়েছি। আর পড়েছি মীর্জা সাহেবের মৌলিক উপন্যাস দুটি ও কৌবোমল চন্দনমলের 'লীলাবতী'। আপনি যে জগতিয়ানির কথা বললেন তাঁর 'চথ-ঝো-চাঁদ' বা পূর্ণ চন্দ্র এক আশ্চর্য সৃষ্টি বলে আমাদের মনে হয়েছিল। সে যুগের আরও দু-একখানা বই আমরা পড়েছিলাম।

বলে খানিকক্ষণ ভেবে বললেন: দেওয়ান প্রীতম দাসের 'আজিব ভেট' আর ভেরুমল মেহরচাঁদের 'মোহিনী বাঈ'।

স্বাতি বলল: সিন্ধী ভাষায় মহিলা লেখক নেই?

আছেন বৈকি। গুলি সদারঙ্গণী প্রথম মহিলা লেখক হলেও তাঁর বই 'ইতহাদ' বা মিলন ছেলেমেয়েরা এখনও পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' অনুবাদ করেছেন তিনি।

ভদ্রলোক আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের নাম করলেন।—রাম পালজোয়ানির 'লতিফা' ও 'কয়েদী', নারায়ণ ভামবানির 'গরীবোঁ-ঝো-ভার্সো' মানে গরিবের উত্তরাধিকার ও 'বিধোয়া' মানে বিধবা, সেবক ভোজরাজের 'দাদা শ্যাম' ও 'আশীর্বাদ', আশানন্দ 'মামতোরা'র 'শাহ ইর' মানে কবি এবং গোবিন্দ 'মালহী'র 'জীবন সাথী' ও 'জিন্দেগী-ঝে-রাহ্-তে' মানে জীবনের পথে।

ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে আছেন জগতিয়ানি, 'মামতোরা', নির্মলদাস ফতেচাঁদ, জেঠমল, মীর্জা নাদির বেগ, অমরলাল হিঙ্গরানি ও আনসারি।

বম্বে সিন্ধী সাহিত মণ্ডলের সদস্য কয়েকজন আধুনিক লেখকের নামও বললেন—গোবিন্দ পাঞ্জাবী, সুন্দরী উত্তমচাঁদ, আনন্দ গোলানি, কিরাত বাবানি, তারা মীরচান্দানি, দাস তালিব ও মোতি প্রকাশ।

এই সব লেখকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন আলোচনা নারায়ণ ঘেলানি করলেন না। বললেন: মীর্জা কালিচ বেগের নাটকের কথা আগেই বলেছি, কিন্তু তিনি সেক্সপীয়রের নাটকের ভাবানুবাদ করেছিলেন। আর পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন লীলারাম সিং। কে. এস. দরিয়ানি ইবসেনের 'পিলার্স অব সোসাইটি' অবলম্বনে লিখেছেন 'মুলকা-ঝা-মুদাবর' এবং মেটার-লিঙ্কের মাল্লা ভাল্লার অনুকরণে 'দেসন সাডকে', মৌলিক নাটকও লিখেছেন 'জমানা-ঝি-লহর' বা সময়ের স্রোত ও 'ভুখা-ঝো-শিকার' বা ক্ষুধার শিকার। জগতিয়ানির নাটক 'উমর মারভি'ও উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়াও নাটক লিখেছেন লেখরাজ আজিজ, এম. ইউ. মালকানি, মহম্মদ ইসলাম উরসানি ও আহমদ চাগলা। 'মামতোরা' ও মালকানি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন।

মালতী ঘেলানি যে এর মধ্যেই স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন, তা ভাবতেও পারি নি। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন: তোমাদের খাবার দিচ্ছি।

বলে একখানা চৌকো টেবিল এনে আমাদের সামনে পাতলেন।

এখন আর তাঁকে প্রৌঢ় বলে মনে হচ্ছে না। মুখের কোথাও বয়সের ছাপ নেই। ঝকঝকে রঙের একখানা শাড়ি পরেছেন। গায়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে এই শাড়ি চমৎকার মানিয়েছে।

আমাদের খাবার এল দুখানা প্লেটে। এক প্লেটে আলুর

তরকারি আর এক প্লেটে তন্দুরের রুটি, আর রুটির উপর ছোট একটা প্লেটে আচার। মালতী নিজেও দুখানা প্লেট নিয়ে স্বামীর কাছে বসলেন।

খেতে খেতেও সাহিত্যের কথা বললেন নারায়ণ ঘেলানি: উপন্যাসের মতো গদ্য সাহিত্য তেমন পল্লবিত হয়ে ওঠে নি। গোড়ার দিকে পরমানন্দ মেওয়ারাম 'জোতে' বা আলো নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বার করে বছর চল্লিশেক তার সম্পাদনা করেন। দেওয়ান ওয়াধুমল লিখেছেন 'পানগাটি ইন্‌কিলাব' বা সামাজিক বিপ্লবের উপরে একখানা বই। দুই ঔপন্যাসিক পান-জোয়ানি ও ভামবানি মিলিত ভাবে প্রকাশ করেছেন 'আদাবি গুণচোর' বা সাহিত্য সংকলন।

মালতী তাঁর স্বামীকে বললেন: তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নারায়ণ বললেন: তোমার তাড়া থাকতে পারে, আমার নেই, এঁদেরও নেই।

মালতীর চোখের দিকে চেয়ে আমি বললুম: তাড়া আমাদেরও আছে।

নারায়ণ কোন প্রতিবাদ না করে খেতে খেতেই বললেন: ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে কয়েকখানা বই আছে। আর প্রাচীন কয়েকজন কবি ও সাধুসন্তদের নিয়ে খানকয়েক জীবনী গ্রন্থ।

মোটা মোটা রুটি, কিন্তু বেশ মোলায়েম। আলুর তরকারি আর আচার দিয়ে আমরা সেই রুটি খেয়ে নিলুম। মালতী নিজেদের প্লেটের সঙ্গে আমাদের প্লেটও ভিতরে নিয়ে গেলেন। খাবার জল দিলেন, মুখ ধুতে বললেন ভিতরে গিয়ে। তার পরে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়েই বললেন: চলুন এইবারে।

কিন্তু নারায়ণ ঘেলানি চটে উঠলেন, বললেন: ওঁরা আমার কাছে এসেছেন, ওঁদের তুমি তাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

তার পরেই সুর নরম করে বললেন: আমার খাতাগুলো দিয়ে যাও তো!

আমি আশ্চর্য হলুম মালতীর ভাবান্তর দেখে। বললেন: কবিতা শোনাবে? তা শোনাও।

বলে এক গোছা খাতা তার স্বামীর কাছে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। আমি দেখলুম যে স্বাতি তাঁর পিছনে দরজার বাইরে চলে গেল। মনে হল যে মালতী ইসারায় তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঘরে বসে আমি শুনতে লাগলুম নারায়ণ ঘোষালের নিজের লেখা কবিতা। তিনি তাঁর কবিতা পড়ে মানে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন আমাকে।

তুমি ঘর ভালবাসো,
তাই তুমি ঘর চাও,
তুমি বন্ধন ভালবাসো,
তাই তুমি বন্ধন চাও,
আসলে তুমি ভয় পাও মুক্তিকে,
স্বাধীনতাকে,
তাই তোমার ঘরের জন্যে লোভ।
আর বন্ধনের জন্যে আকুতি।
এই উন্মুক্ত পৃথিবীটাই তো তোমার ঘর
কিন্তু এর কোন দরজা-জানলা নেই বলে
একে তুমি ঘর ভাবতে পার না।
আর তোমার নিজের জীবনই তো আসল বন্ধন,
তাই মুক্ত হয়েও তুমি নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পার না।
মুক্তির জন্যে
স্বাধীনতার জন্যে
তুমি চিৎকার কর,

কিন্তু আসলে পরাধীনতা ভালবাসো বলেই
তুমি যে স্বাধীন তা জানতে পার না।
তোমার মুক্তি নেই,
তোমার নিজের জীবনই
তোমাকে পরাধীন করে রেখেছে।

স্বাতি যে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, আমি তা দেখতে পাই নি। নারায়ণ ঘেলানি তাঁর খাতার পাতা ওল্টাবার আগেই বলে উঠল: এইবারে উঠে পড়।

ভদ্রলোক তার কথা শুনে ফিরে তাকালেন।

স্বাতি সবিনয়ে বলল: আমাদের আর এক জায়গায় যেতে হবে, আর একজনের কাছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: হ্যাঁ, আমাদের পরিচিত একজন এখানে আছেন বলে শুনেছি।

কী নাম তাঁর ?

বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

রাণার নামটা বলেই আমি দেখলুম যে স্বাতি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করছে। আর পরক্ষণেই ঘেলানির কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম: বুঝেছি।

আমি আর দেরি করলুম না। দু হাত জুড়ে নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম পথে। স্বাতি মৃদু স্বরে বলল: খুব ভুল করলে।

কেন ?

এর জন্যে মালতীদিকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: এখানকার নারীশালায় মালতীদি চাকরি করেন। আমরা বিকেলের ট্রেনে চলে যাচ্ছি বলে স্টেশনে দেখা করতে আসবেন। সেখানেই সব কথা বলবেন।

তার পরেই বলল: তোমাকে ডেকে বার করলাম বলে তুমি

হয়তো রাগ করলে। মালতীদিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে ডেকে বার না করলে তুমি ছুটি পেতে না।

আমি নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলুম।

এক সময়ে স্বাতি বলল: রাণাবাবুর খোঁজ করার আর দরকা নেই।

কেন?

তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে!

স্বাতি বলল: তোমার মনে আছে, অফিসের একটা স্টেনে মেয়ের কলঙ্ক নিজের ঘাড়ে নিয়ে রাণাবাবু তাকে বিয়ে করেছিলেন!

আমি সংক্ষেপে বললুম: হুঁ।

সেই মেয়েটা আবার তাঁকে ঠকিয়েছে। রাণাবাবুর অফিসেরই একটা সিন্ধী ছেলেকে নিয়ে এখানেই ঘর করছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম। কোন কথা আমার মুখে জোগাল না।

১৪

একটা বাসে উঠে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। তার পরে রিটায়ারিং রুমে। পথে স্বাতি কোন কথা বলে নি, আমিও বলার মতো কোন কথা ভেবে পাই নি।

হঠাৎ স্বাতি বলল : তুমি কি একটু ঘুমিয়ে নেবে ?

এখন! এখন কি আর ঘুমোবার সময় আছে! না দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস আছে আমাদের!

স্বাতি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : এখনও আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।

আমি বললুম : সময় কাটাবার জন্যে আজ কেন আমাদের দুর্ভাবনা হচ্ছে!

বিছানার এক পাশে বসে স্বাতি তার বেদনার্ত মনটা আমার দিকে মেলে দিল। বলল : বাণাবাবুর জন্যে ভারি কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হবারই কথা।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তুমি সব কথা জানো না, তাই বুঝবে না কেন আমার এমন কষ্ট হচ্ছে।

আমি কোন প্রশ্ন করলুম না। যতটুকু সে বলতে চায় ততটুকুই বলুক, তার বেশি আমি শুনতে চাই না।

স্বাতি বলল : একদিন সব কথাই তোমাকে বলব। কিন্তু এখন কিছু বলতে পারছি না।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে স্বাতির চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। সত্যিই এখন সে কোন কথা বলতে পারবে না। সে এখন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

সামনের টেবল থেকে খবরের কাগজখানা আমি তুলে নিলুম।

প্রথম পাতার উপর দিকে একটুখানি ফাঁকা জায়গা আছে। সেই জায়গায় ছোট ছোট করে আমি লিখতে লাগলুম—

তুমি ঘর ভালবাসো,
তাই তুমি ঘর চাও।

মনে করে করে নারায়ণ ঘেলানির কবিতাটা আমি লিখে ফেলছিলুম। কতটা সময় কেটে গিয়েছিল জানি না, হঠাৎ স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী লিখছ?

বললুম : নারায়ণ ঘেলানির কবিতাটা লিখে রাখছি।

কেন?

লিখে না রাখলে মনে থাকবে না।

তুমি তো কিছুই লিখে রাখো না!

দেখা কথা লিখে রাখবার দরকার হয় না, পড়া কথাও নয়। কিন্তু শোনা কথা—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : শোনা কথাও তো তুমি ভোলো না! এই যে সিন্ধী সাহিত্যের কথা তুমি শুনলে, তা কি তুমি ভুলে যাবে!

আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : কবিতাটা তোমার ভাল লেগেছে, কিংবা সময় কাটাচ্ছ এই কাজ করে।

বললুম : মনে হচ্ছে, নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন নারায়ণ ঘেলানি।

স্বাতি হেসে বলল : ঘেলানি নয়, বোধহয় গেলানি বলতে হবে। ওদের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ তো তৃতীয় বর্ণের মতো।

স্বাতির হাসি দেখে বুঝতে পারলুম যে ও এখন সহজ হয়ে গেছে। এখন আমাকে আর কবিতা লিখে সময় কাটাতে হবে না। তাই কাগজখানা মুড়ে রেখে বললুম : কবিকে তোমার কেমন লাগল?

স্বাতি বলল : মানুষটাকে চিনতে পারলাম না।

কেন ?

মালতীদি তো পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলেন তাঁকে! কিন্তু বিয়ের পরিণাম কেন সুখের হল না ?

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললুম: মনে হয় প্রথম জীবনেই পা-টা নষ্ট হয়েছে কোন দুর্ঘটনায়।

কিন্তু তার জন্যে তো কবিতা লেখা বন্ধ হয় নি! অথচ পাড়ার লোকেও তাঁকে চেনে না। চেনে মালতীদিকে।

স্বাতির কথা আমি মেনে নিলুম। এক গোছা খাতা দেখলুম কবিতার, কিন্তু একখানা ছাপা বই কিংবা কোন সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা দেখলুম না। কবিতা লিখে নিজের কাছেই জমিয়ে রেখেছেন।

স্বাতি বলল: নিজেকে প্রকাশের চেষ্টা কি কোনদিন করেন নি ?

বললুম: সে চেষ্টা করে থাকলেও কোন ফল যে পান নি তা মানতেই হবে।

স্বাতি বলল: মনে হয় আনন্দ পান বলেই লেখেন, আর লিখেই তাঁর শখ মেটে।

কিন্তু মানুষকে শোনাবার ইচ্ছা থেকেই যে আত্মপ্রকাশের বাসনা ধরা পড়ছে!

এঁদের নিয়ে অনেক রকমের আলোচনা করলুম আমরা। কিন্তু একটা প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পেলুম না। নারায়ণ ঘোশালি চাওলাকে সহ্য করতে পারেন না, তার নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। কিন্তু এই বিরাগ কেন তা জানা যায় নি। চাওলাও আমাদের কিছু বলে নি। সে নিজে এ কথা জানে কিনা তাও আমরা জানি নে।

স্বাতি বলল: চাওলার মতো মানুষকে এঁরা কেমন করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তা ভেবে পাই নে।

বললুম: চাওলাই বা মেনে নিয়েছে কেন তা বুঝি নে।

স্বাতি বলল: মালতীদির কাছেই এ কথা জানা যাবে।

কিন্তু তিনি কি বলবেন ?

না বললে ফিরে গিয়ে চাওলাকে আমরা কী বলব !

কথায় কথায় দুপুর যে গড়িয়ে গিয়েছিল আমরা তা বুঝতে পারি নি। স্বাতি হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল : চারটে বাজতে তো আর দেরি নেই। মালতীদির জন্যে অপেক্ষা করলে চা খাওয়া আমাদের হবে না।

মালতী ঘেলানির জন্যে অপেক্ষা না করেই আমরা চা খেয়ে নিলুম। তার পরে ভুজ থেকে আমেদাবাদের ট্রেন আসছে জেনে মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে চলে এলুম। ট্রেন এল। আমরা উঠে পড়লুম ট্রেনে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমি আবার নেমে এলুম প্ল্যাটফর্মে।

ট্রেন ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত আগে ছুটতে ছুটতে এলেন মালতী ঘেলানি। জানলা দিয়ে দুটো কাগজের প্যাকেট স্বাতির হাতে তুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন : বড্ড দেরি হয়ে গেল।

আমি বললুম : তবু যে আসতে পেরেছেন এই আমাদের ভাগ্য।

কিন্তু স্বাতি বলল : এ সব আনতে গেলেন কেন ?

মালতী হাসবার চেষ্টা করে বললেন : আমি যে পাঞ্জাবী মেয়ে। সে কথা ভুলতে পারি নে। বাড়িতে তো কিছু খাওয়াতে পারি নি, তাই কিছু কিনে আনলাম, তোমরা গাড়িতে খেয়ো।

ট্রেন ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলুম : ফিরে গিয়ে চাওলাকে কী বলব ?

ভদ্রমহিলা খপ্ করে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন, বললেন : আমাদের কথা কিছু বলবেন না, লালু খুব কষ্ট পাবে মনে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সে কি !

সত্যিই, লালু আমাকে খুব ভালবাসে, আমার দুঃখ ও সইতে পারবে না।

স্বাতি নেমে আসতে চাইছিল। তাকে বাধা দিয়ে বললুম: আর সময় নেই।

তার পরে মালতীর দিকে ফিরে বললুম: কিন্তু তাকে আমরা কী বলব?

বলবেন, তুমি মিথ্যে সন্দেহ করেছিলে যে লোকটা আমাকে ভালবাসে না। আমাদের বিয়েয় বাধা দিয়ে সে খুব ভুল করেছিল। সেদিন ওর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে না হলে লালুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছেদ হত না।

টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল মালতী ঘেলানির চোখ থেকে। চোখ মুছে বললেন: লালু ঠিকই বলেছিল যে আমাদের বাবার পয়সা আছে জেনেই ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

তার পর?

তার পর আমাকে ফেলে কোথায় গিয়েছিল, কী করেছিল জানি নে। কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে।

পা-টা—

মালতী স্তব্ধ হয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। তার পরে বললেন: অন্ধকারের কথা আলোয় এনে কী লাভ হবে ভাই!

ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল, বাঁশি বাজল গার্ডের। মালতী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন: এইবারে উঠে পড়ুন।

আমি ট্রেনে উঠে দরজার হাতল ধরে দাঁড়ালুম। ট্রেন ছাড়ল। মালতী কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন: লালুকে আমার অনেক আদর দেবেন, বলবেন—

কিন্তু কী বলতে হবে স্টেশনের কোলাহলে তা শুনতে পেলুম না।

গাড়িতে স্বাতির কাছে এসে দেখলুম যে তার মুখখানাও থম থম করছে বেদনায়। বর্ষার ঘন কালো মেঘের মতো সজল

তার দৃষ্টি। আমি তার সামনে বসতেই বলল: মানুষের দুঃখ আমরা সত্যিই বুঝি না।

সত্যিকার দুঃখের কথা যে কেউ বলে না!

ট্রেন এখন বেশ জোরে চলছে। আমরা ফিরে যাচ্ছি। অন্য-মনস্ক ভাবে বাহিরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে আমার মনে হল যে নারায়ণ ঘেলানির দুঃখও আমরা জানতে পারি নি। তাঁর কবিতার কথা আমরা মনে পড়তে লাগল—

তোমার নিজেব জীবনটাই তো আসল বন্ধন।
তাই মুক্ত হয়েও তুমি নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পার না।
মুক্তির জন্যে
স্বাধীনতার জন্যে
তুমি চিৎকার কর।
কিন্তু আসলে পরাধীনতা ভালবাসো বলেই
তুমি যে স্বাধীন তা জানতে পার না।
তোমার মুক্তি নেই।
তোমার নিজের জীবনই
তোমাকে পরাধীন করে রেখেছে।

মরুভারত পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্যে লেখা হয়েছে বম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এব অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনেব কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এ গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার

অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াডা ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্নকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটের সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক,

সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী, ভোপাল, বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপান্বিত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব…

এর পরে হিমালয় পর্ব। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভূটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদ্রীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

.তারপর ?

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের পর যেমন খিলপর্ব হরিবংশ, তেমনি রম্যাণি বীক্ষ্যর উনবিংশ পর্ব মরুভারত। ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপর আরব সাগরের তীরে মরু রাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। মরুভারত পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক